প্রথম ভাষা (বাংলা) শিক্ষা ও বাংলা প্রাইমারের মনোভাষাবৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন

(শিশুর জন্ম থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালের বিচারে)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এর কলা অনুষদে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক- অরুন্ধতী দাস

রেজিস্ট্রেশন নং- A00BE1100617

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ- ২৭/১১/২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২২

Certificate

Certified that the thesis entitled **প্রথম ভাষা (বাংলা) শিক্ষা ও বাংলা প্রাইমারের মনোভাষাবৈজ্ঞানিকমূল্যায়ন (শিশুর জন্ম থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালের বিচারে)** submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts (Department of Bengali) at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Rajyeswar Sinha, Associate Professor, Department of Bengali, Jadavpur University.

Neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Dated:

Arundhati Das

Registration No. : A00BE1100617

Date of Registration: 27.11.2017

Countersigned

Dr. Rajyeswar Sinha

(Supervisor)

Associate Professor

Department of Bengali

Jadavpur University

Kolkata- 700032

প্রাক্‌কথন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ার সময় যখন বিশেষ পত্র বেছে নেওয়ার সুযোগ এল, তখন খানিক কৌতূহল, খানিক ভালো লাগা, আর কিছুটা আগ্রহমিশ্রিত অনুসন্ধিৎসা থেকেই নির্বাচন করেছিলাম ভাষাতত্ত্ব। ক্রমশ বুঝতে পারা যাচ্ছিল, ভাষাতত্ত্বের চর্চা কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষা-ইতিহাসকে মাথায় রেখে করা গুরুত্বপূর্ণ বটেই, কিন্তু তারও গোড়ায় বিশ্বভাষার সর্বজনীন সূত্র, কাঠামো এবং বিন্যাসটিকেও আয়ত্ত করা প্রয়োজন। আর ভাষাতত্ত্বে বিশ্বভাষার সর্বজনীন ব্যাকরণের আধুনিকতম এই প্রকরণের কথা প্রথম বলে যিনি গোটা পৃথিবীর ভাষাতত্ত্বের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই নোয়াম চমস্কি যেদিন সিলেবাসে ঢুকে পড়লেন, সেদিন স্পষ্টই বোঝা গেল, ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের নিরিখে বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়াও বৈশ্বিক ভাষাতত্ত্বের নিরিখে বাংলা ভাষাকে যাচিয়ে নেওয়াও অত্যন্ত প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটের কথা মাথায় রেখে বাংলা ভাষার কাঠামোগত বিশ্লেষণের ধারাটি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় করে তুলেছেন ভাষাবিদ্ পবিত্র সরকার। ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক— তিনটি ধারাতেই ‘স্ট্রাকচারালিস্ট গ্রামার’ বা ‘আকরণবাদী ব্যাকরণ’ বাংলা ভাষার প্রেক্ষাপটে কেমন হতে পারে, তার একটা বিশদ তথ্যভাণ্ডার রয়ে গেছে তাঁর এতদিনের লেখা ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে, প্রবন্ধে, আলোচনায়, বক্তৃতায়। তাঁরই ছাত্র, আমার শিক্ষক ড. উদয়কুমার চক্রবর্তীও বাংলায় চমস্কিকথিত ‘ট্রান্সফর্মেশনাল জেনারেটিভ গ্রামার’-এর প্রয়োগ চিহ্নিত করেছেন তাঁর মৌলিক গবেষণায়, বাংলায় সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ কেমন হতে পারে, তার রূপরেখাটি তাঁরই দেখানো। ফলে, বাংলায় কাঠামোভিত্তিক ভাষাতত্ত্বের পাঠ কেমন হতে পারে, তার একটি দিশা ইতিমধ্যেই বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে রয়েছে। এই কাঠামো ধরে বিশ্লেষণের বিষয়টি মাথায় রেখেই বৈশ্বিক ভাষাতত্ত্বের কাঠামোয় বাংলা ভাষার একটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনার অপ্রতুলতা আমার নজরে এসেছিল। মানুষ কীভাবে ভাষা শেখে, তা নিয়ে আলোচনা শতাব্দীপ্রাচীন বললেও ভুল হয়, বস্তুত এই জিজ্ঞাসা সহস্রাব্দাধিক পুরোনো। মিশরের রাজা সামেতিউস কিংবা মুঘল সম্রাট আকবরের বেয়াড়া পরীক্ষানিরীক্ষার কাহিনিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আবার বাইবেলের ব্যাবেল টাওয়ারের গল্পও ভাষা বিষয়ক অনুসন্ধিৎসারই পূর্বকথা। কিন্তু এই তত্ত্বের পরিসর ছেড়ে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান আর মনোভাষাবিজ্ঞানের সূত্র ধরে গড়ে উঠছিল মানুষের ভাষা শেখার পদ্ধতিটির একটি স্পষ্ট রূপরেখা। ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার ভাষীদের ভাষাশিক্ষার নিরিখে মানুষের ভাষা অর্জনের এই সূত্রগুলিকে যাচাই করে দেখেছেন বিবিধ ভাষাবিদ্। তবে, বাংলাভাষী শিশুর প্রথম ভাষা অর্জনের পদ্ধতিকে এই সূত্রে ফেলে কখনও দেখা হয়নি যে, বাংলা ভাষা অর্জনের কার্যপ্রণালীটি কেমন হতে পারে। আমার এই গবেষণায় আমি সেই দিকটিকেই দেখতে চেয়েছি। শিশুর ভাষার বুলি শেখার কিছুদিনের মধ্যেই তার ভাষা অর্জনকে বাহ্যিকভাবে সাহায্য করতে তার হাতে ধরানো হয় ভাষাশিক্ষার প্রাইমার। শিশুর ভাষাশিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিটি নির্দেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ সূত্রটি ধরেই আমি দেখে নিতে চেয়েছি, প্রচলিত বাংলা প্রাইমারগুলি শিশুর ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা।

একটি বিশেষ উল্লেখ হিসেবে বলে নিতে চাই, এই গবেষণাকর্মটির অক্ষরবিন্যাসের সময় যাবতীয় শব্দের বানানের ক্ষেত্রে আকাদেমি বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে এবং যেক্ষেত্রে একাধিক বানানকে মান্য বলে আকাদেমি বানানবিধি স্বীকৃতি দিয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে আধুনিকতম বানানটিকেই রাখা হয়েছে। আকাদেমি বিধি মেনেই এই গবেষণাকর্মে 'ব্যাবহারিক', 'কোশ', 'ছুড়ে' ইত্যাদি বানান রাখা হল।

পাঁচ বছরের এই গবেষণার কাজের শেষের দুই বছর ভয়াবহ কোভিড মহামারীর মধ্যে কেটেছে। নিশ্ছিদ্র নিরুপদ্রব অবসর গবেষণার সময়কে বিন্দুমাত্র ব্যাহত না করলেও গ্রন্থাগার ব্যবহার, নমুনা সংগ্রহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দফতরি কাজকর্মগুলির ক্ষেত্রে বারবার ভয়ানক বাধা হয়ে এসেছে। অসমীচীন দীর্ঘসূত্রিতা বেশ কয়েকবার ছাপ ফেলেছে আমার কাজে। তার চিহ্ন যদি খুঁজে পাওয়া যায় আমার মুদ্রিত গবেষণার পাতায়, সে দায় একান্ত আমারই। তবু, কেজো গবেষণাপত্রের গোড়ায় এই একমাত্র ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তির সুযোগটিতে, নিরন্তর সংশোধনের ঘোষণাটুকু অন্তত রেখে গেলাম।

অরুন্ধতী দাস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রথম পাঠ আমাকে দিয়েছিলেন আমার শিক্ষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ ল্যাংগুয়েজেস অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিকস'-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ড. মহীদাস ভট্টাচার্য। ভাষাতত্ত্বের আপাতবাহ্য জটিল আবরণের কাঠিন্য আনকোরা ছাত্রবেলাতেও যে আমাকে বীতস্পৃহ করে দেয়নি, তা স্যারের অপরিসীম যত্ন, ভালোবাসা আর নিষ্ঠার ফল। উচ্চশিক্ষায় স্বশিক্ষাই দস্তুর, শিক্ষক সেখানে দিকদিশাটুকু নির্দেশ করে দেবেন মাত্র। কিন্তু স্যার অপ্রতুল সময়ের তোয়াক্কা করেননি, প্রচুর দায়িত্বের চাপের সঙ্গে উপরি শ্রম সংক্ষেপ করার বিন্দুমাত্র চালাকিও তাঁর ছিল না। ফলে সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর মতো যত্ন করে ধরে ধরে তিনি পাঠ দিয়েছিলেন আমাদের, আগাগোড়া তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল আমাদের অনুশীলন আর অনুধাবনের প্রতি। আজ আমার এই গবেষণার একেবারে গোড়াতেই আমি তাঁকে স্বীকৃতি জানাতে চাই। ভাষাতত্ত্ব আজ যতটুকু যা বুঝি, সব তাঁরই গড়ে দেওয়া জমির ফসল।

গবেষণার মাঝপর্বে এই বিষয়টি নিয়ে একদিন দীর্ঘ আলোচনা হয় ভাষাবিদ্ পবিত্র সরকারের সঙ্গে। পরে গবেষণা সন্দর্ভের সারসংক্ষেপটি মন দিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে এই সংক্রান্ত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক তিনি এতে যুক্ত করার পরামর্শ দেন। বস্তুত, মনোভাষাবিজ্ঞানের এই প্রথম ভাষা অর্জন সংক্রান্ত দিকটি বাংলা ভাষার ক্ষেত্রটিতে ফেলে পূর্বজ গবেষণা না থাকলেও, পবিত্রবাবুর লেখা *ভাষা দেশ কাল* বইটির 'শিশুর প্রথম ভাষা শিক্ষা' প্রবন্ধটিতেই একমাত্র এই বিষয়টির একটি স্পষ্ট আভাস মেলে। একেবারে গোড়ায়, যখন গবেষণা প্রশ্নগুলিকে আমি একটু একটু করে সাজাচ্ছি গবেষণার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে, তখন এই গবেষণার মূল সুরটি বাঁধা হয়েছিল ওই প্রবন্ধটির সূত্রেই। তাঁকে জানাই আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা।

ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি থেকে ভাষাতত্ত্বের অত্যন্ত মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য কিছু বই আমি পেয়েছি। সদস্যপদ পাওয়ার সূত্রে প্রথমদিকে এই বইগুলি নিয়মিত পেতে অসুবিধা ছিল না একেবারেই। কিন্তু কোভিডকালে প্রায় আড়াই বছরের জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে সশরীরে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এই পর্বে আমার মতো আরও অনেক গবেষকের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের 'ইস্ট অ্যান্ড নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া জোন'-এর ডিরেক্টর শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী। তিনি আলাদা করে খুলে দেন একটি বিশেষ ই-রিসোর্স সহায়তা কেন্দ্র, যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বইয়ের সফট কপি পাওয়াটা অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠে। অতিমারীর সময়টা জুড়ে যেভাবে বিদ্যাচর্চার বৌদ্ধিক পরিবেশটি বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি এবং তাঁর সহকারীরা, তাতে ধন্যবাদের ভাষাও বাতুলতা।

গবেষণার মধ্যপর্যায়ে আমার হাতে আসে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত, ফার্গুসন কর্তৃক সম্পাদিত একটি বই, যেখানে রাশিয়ান তৎকালীন তরুণ ভাষাবিজ্ঞানী তনকোভা ইয়াম্পোলোস্কায়া-র একটি বিশেষ প্রবন্ধ ছিল। প্রবন্ধটি পড়ে আমি বিশেষ সচকিত হই, কারণ সেখানে শিশুর ভাষা হিসেবে একেবারে মুখে-কথা-না-ফোটা

শিশুদের ক্রন্দনবৃত্ত পর্যবেক্ষণ করার কথা বলেছিলেন তিনি। এতদিন পর্যন্ত যে-কটি এই সংক্রান্ত গবেষণা আমার নজরে এসেছিল, তার কোনোটিতেই শিশুর কলধ্বনি পর্যায়ের আগে কোনোরকম ভাষা অর্জনের বহিঃপ্রকাশের কথা বলা ছিল না। যদিও, প্রায় অর্ধশতক আগের প্রবন্ধ, তবু আধুনিকতম অস্ত্র ইন্টারনেটের সহায়তায় তনকোভা ইয়াম্পোলোস্কায়ার সন্ধান মেলে, তাঁকে মেলযোগে এই বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম। প্রায় নিশ্চিত ছিলাম, উত্তর না মেলার সম্ভাবনা বিষয়ে। কিন্তু আমাকে অত্যন্ত চমৎকৃত করে দিয়ে আশি-উর্ধ্ব এই ভাষাবিজ্ঞানী আমাকে ফিরতি বার্তা পাঠান— তাতে শুভেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেন এই বিষয়ে কাজের উপযোগী, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাঁর আর-একটি প্রবন্ধ। তিনি আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছেন, এই যোগাযোগের অদ্ভুত কাহিনি আজও ভাবলে আমার অবিশ্বাস্যই মনে হয়।

ইয়াম্পোলোস্কায়া যে বিশেষ পদ্ধতিতে ক্রন্দনবৃত্ত পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, সেই পথে এগোতে গেলে আমার প্রয়োজনীয় ছিল বেশ কয়েকটি অবস্থায় শিশুদের ক্রন্দনের রেকর্ডিং-এর ধ্বনিতরঙ্গগত বিশ্লেষণ। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ এই সম্পূর্ণ পরিকাঠামোটি সরবরাহ করে আমার গবেষণার একটি অপরিহার্য দিক তুলে ধরতে সাহায্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি সর্বতোভাবে ঋণী, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজেরই গবেষক, আমার বোন, দিব্যাঙ্গনা বিশ্বাসের কাছে। তারই ব্যবস্থাপনা এবং যোগাযোগ এই সুযোগ এনে দিয়েছে আমায়।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, শিলং-এর 'ইংলিশ অ্যান্ড ফরেন ল্যাংগুয়েজেস'-এ রাশিয়ান বিভাগের অধ্যাপক, আমার অগ্রজপ্রতিম ড. সজল দে-এর কাছে। তিনি আমাকে বিশ্বভাষা এসপেরান্তোর পাঠ দিয়েছেন এবং সেই পাঠক্রম রপ্ত করতে করতে আমার কাছে তিনি নিপুণ শৈলীতে উন্মুক্ত করেছেন ভাষার সর্বজনীন কাঠামোর কঙ্কালটি, যা আসলে অন্বয়তাত্ত্বিক নিয়মে পৃথিবীর যে কোনো ভাষার প্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এই পাঠ, প্রথম ভাষা অর্জনের নিরিখে বাংলা ভাষার কাঠামো অনুসন্ধানের সময়েও বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে থেকেছে।

ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি ছাড়াও, আরও যেসব গ্রন্থাগার থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি, সেগুলি হল জাতীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার-এর গ্রন্থাগার এবং জে-স্টোর, অ্যাকাডেমিয়া ডট এডু, সেজ জার্নালস, অক্সফোর্ড ই-বুকস, পিয়ার্সন ই-বুকস, ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি ও প্রোয়েস আইকিউ-এর মতো বৈদ্যুতিন তথ্যসম্ভার।

এই বিষয়টি নিয়ে আমার ভাবনাকে দুই মলাটের মধ্যে ধরে রেখেছেন *অনুষ্টুপ* পত্রিকার সম্পাদক শ্রী অনিল আচার্য এবং *যাদবপুর জার্নাল অফ ল্যাংগুয়েজেস অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিকস*-এর সম্পাদক, 'স্কুল অফ ল্যাংগুয়েজেস অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিকস'-এর অধ্যাপক ড. সমীর কর্মকার। আমার যুক্তিক্রমকে মুদ্রণস্বীকৃতি দিয়ে জনসমক্ষে তুলে আনার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই তাঁদের।

যাঁর কথা না বললে, আমার এই গবেষণাকর্মের মূল উদ্যোগটির কথাই আড়ালে রয়ে যাবে, তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক, ড. রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা। শুধু শিক্ষক হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবে, হিতৈষী হিসেবে, দরদী সহপথিক হিসেবে তাঁর অবদান রয়ে গেছে এই গবেষণাকর্মের নিভৃত অন্তরালে। সন্দেহপ্রবণ এই সময়ে তাঁর মতো শুভাকাঙ্ক্ষী শিক্ষককে পাশে পেলে পৃথিবীর ওপরে বিশ্বাস ফিরে আসে। তাঁকে যোগ্য সংগত দিয়ে গেছেন আমার 'রিসার্চ অ্যাডভাইজরি কমিটি'-র দুই সদস্য, ড. জয়দীপ ঘোষ এবং পূর্বে যাঁর কথা একবার বলেছি, ড. সমীর কর্মকার। তাঁদের সহায়তা আর নিরন্তর দৃষ্টিপাত আমাকে শৈথিল্য থেকে রক্ষা করে গেছে।

আমার বন্ধুবৃত্তের মধ্যে আমারই সহকর্মী, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক শাশ্বতী রায়, ডায়মন্ড হারবার উইমেনস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অভিজিৎ ব্যানার্জি আর কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অভিজিৎ সাধুখাঁর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। কোভিডের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমরা প্রত্যেকে যখন এক-একটি নিঃসম্পর্ক দ্বীপের মতো জনসংস্রব এড়িয়ে বেঁচে আছি, সেই সময় আমাকে একত্রবাসের সঙ্গী করে ডেকে নিয়েছিল এই ক-জন। এদের মধুর সাহচর্য আর উৎসাহ আমাকে ঝিমিয়ে পড়তে তো দেয়ইনি, উপরন্তু একত্রপাঠের ফেলে-আসা স্মৃতি পুনর্জাগরূক করে বিদ্যাভ্যাসের এক অন্যতর স্বাস্থ্যকর পরিপার্শ্ব উপহার দিয়েছিল আমায়। এই গবেষণাকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, তৃতীয় অধ্যায়টি সেই সময়েই লেখা।

আমাকে নিয়মিত নানা সুপরামর্শ আর জরুরি সাহায্য দিতে দিতে গবেষণাপর্বের আগাগোড়া সঙ্গী হয়ে রইল আমার আরও তিন বন্ধু— আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অঙ্কনা বেতাল, হীরালাল ভকত কলেজের অধ্যাপক ইন্দ্রনীল মণ্ডল আর ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক কৌমী দত্ত।

আর যার কথা এই গবেষণাকর্মের কৃতজ্ঞতা স্বীকার পর্বের একেবারে উপসংহার পর্যায়ে এনে ফেললাম, তিনি আমার সঙ্গী, ঋত্বিক মল্লিক। এই গবেষণার কাজটিতে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রটিতে তাঁর দীর্ঘদিনের অবাধ গতায়াতের সূত্রে এই বিষয়টি প্রথম তাঁর ভাবনাতেই উঁকি দিয়েছিল। সুসম্পর্কের মূল্যে সেই অধিকার আমি প্রায় আত্মসাৎ করেছিই বলা চলে, যদিও এতে মিশে আছে তাঁর সপ্রশ্রয় অনুমতি। দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি কাজ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরে। রাজনৈতিক পদপ্রাপ্তির মোহে অন্ধ বর্তমান পরিস্থিতির তোয়াক্কা না করেই প্রায় একার শ্রমে তিনি পরপর তৈরি করে গেছেন বিদ্যালয়পাঠ্য প্রাইমার, শিশুশিক্ষার কারিকুলাম এবং উচ্চশিক্ষার গ্রন্থ ও পাঠক্রম। তাঁর এই অভিজ্ঞতা আমাকে গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়টিতে অত্যন্ত সাহায্য করেছে, কারণ সেই পর্বের বিষয়ই ছিল বাংলা প্রাইমারগুলির পুনর্মূল্যায়ন। এই গবেষণার সামান্যতম স্বীকৃতিও যদি কোথাও মেলে, তাহলে তা তাঁরই জন্য।

সূচিপত্র

প্রাক্কথন...i

কৃতজ্ঞতা স্বীকার...iii

ভূমিকা...১

প্রথম অধ্যায়: প্রথম ভাষা অর্জনের তাত্ত্বিক পরিকাঠামো.......................................৮

১.১. ভাষা শিক্ষা ও ভাষা অর্জনের ব্যবহারবাদী তত্ত্ব

১.১.১. ভূমিকা

১.১.২. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের মূল সূত্র

১.১.৩. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের প্রেক্ষাপট

১.১.৪. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের ব্যাখ্যা

১.১.৫. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি

১.১.৬. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের পর্যালোচনা

১.২. ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক তত্ত্ব

১.২.১. জ্ঞানমূলক তত্ত্বের বিবর্তন, পরিগ্রহণ ও সীমাবদ্ধতা

১.৩. ভাষা শিক্ষা ও ভাষা অর্জনের সহজাতবাদ তত্ত্ব

১.৩.১. সহজাতবাদ তত্ত্বের পরিসর

১.৩.২. সহজাতবাদ তত্ত্বের ভিত্তি ও ব্যাখ্যা

১.৩.৩. সহজাতবাদ তত্ত্বের প্রেক্ষাপট

১.৩.৪. সহজাতবাদ তত্ত্বের মূল সূত্র

১.৪. তত্ত্বগুলির পারস্পরিক তুলনা ও তাৎপর্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: ভাষা অর্জনের শারীরবৃত্তীয় প্রকৌশল: ভাষা, স্নায়ু, মস্তিষ্ক............................ ২৩

২.১. স্নায়ুতন্ত্র

২.১.১ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র

২.১.২. মস্তিষ্ক

২.১.২.১. সেরিব্রাম

২.১.২.২. ব্রেনস্টেম

২.১.২.৩. ডায়ানসেফালন

তৃতীয় অধ্যায়: প্রথম ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়া ও তার সমীক্ষা সংক্রান্ত পদ্ধতি...................... ৪৩

৩.১. শিশুর বচন, তা সম্পর্কিত বোধ ও চিন্তন প্রক্রিয়া

৩.১.১. ভাষা বোঝা, ভাষা উচ্চারণ ও ভাষাজ্ঞান: পারস্পরিক নির্ভরতা

৩.১.২. অর্থ ও অনুষঙ্গের সম্পর্ক

৩.১.৩. মস্তিষ্ক, চিন্তা এবং ভাষার বিকাশ

৩.১.৪. সহজাত বোধ, বুদ্ধি এবং স্কিমা

৩.২. শিশুর বচন ও তার বিকাশ

৩.২.১. কথা বলা: কলধ্বনি থেকে বচন

৩.২.২. প্রাথমিক তিনটি অর্থপূর্ণ বচন স্তর: নামশব্দ ও হলোফ্রাস্টিক,টেলিগ্রাফিক এবং রূপ-সংবর্তন বা মরফিক-ট্রান্সফর্মেশনাল

৩.২.২.১. নামশব্দ ও হলোফ্রাস্টিক স্তর: একশাব্দিক উচ্চারণ

৩.২.২.২. টেলিগ্রাফিক স্তর: দ্বিশাব্দিক ও ত্রিশাব্দিক উচ্চারণ

৩.২.২.৩. রূপ-সংবর্তন বা মরফিক-ট্রান্সফর্মেশনাল স্তর

৩.২.২.৩.১. রূপিম অর্জন স্তর (morpheme acquisition)

৩.২.২.৩.২. সংবর্তন অর্জন স্তর transformation acquisition)

চতুর্থ অধ্যায়: অ্যাফেজিয়া বা বাক্কিকার এবং ভাষা অর্জনে তার প্রভাব ৮১

৪.১. ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় মস্তিষ্কের গুরুত্ব

৪.২. ভাষা ও আবেগের উৎস হিসেবে মস্তিষ্কের প্রাধান্য লাভের ইতিহাস

৪.৩. দেহসংস্থানের ভিত্তিতে অ্যাফেসিয়ার প্রকারভেদ

৪.৪. বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামোয় মস্তিষ্কের পর্যবেক্ষণ ও ভাষা অর্জন সংক্রান্ত গবেষণায় তার গুরুত্ব

পঞ্চম অধ্যায়: ভাষার বিন্যাস ও ভাষা অর্জনের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রেপ্রাসঙ্গিক কয়েকজন ভাষাবিজ্ঞানীর কথা ও তাঁদের গবেষণা..৯৫

৫.১. ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর

৫.২. হেনরি সুইট

৫.৩. প্রাহাবৃত্তের ভাষাবিজ্ঞানী

৫.৩.১. ভিলেম ম্যাথিসিউস

৫.৩.২. রেনে ওয়েলেক

৫.৩.৩. জ্যাঁ মুকারোভস্কি

৫.৩.৪. নিকোলাই সের্গেইভিচ ত্রুবেৎস্কয়

৫.৩.৫. রোমান জেকবসন

৫.৩.৬. আজকের প্রাহা স্কুল

৫.৪. নোয়াম চমস্কি

ষষ্ঠ অধ্যায়: নির্বাচিত আধুনিক বাংলা প্রাইমারের সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন ওমনোভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে তার প্রয়োগসার্থকতা ১৩৩

৬.১. প্রাইমারের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের গোড়ার কথা: মেয়েদের প্রাইমার বনাম ছেলেদের প্রাইমার

৬.২. প্রাইমারের মনোভাষাবৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন:

শিশুসেবধি - বর্ণমালা ১,২,৩ (১৮৪০-১৮৫৫)

বর্ণমালা – স্কুল বুক সোসাইটি, ১ম ও ২য় খণ্ড (১৮৫৩-১৮৫৪)

শিশুশিক্ষা – ১,২,৩ (১৮৪৯-১৮৫০)

বর্ণপরিচয় – ১,২ (১৮৫৮)

হাসিখুশি (১৮৯৭)

সহজ পাঠ (১৯৩০)

কিশলয় (১৯৮১)

আমার বই (২০১৩)

সিদ্ধান্ত..১৫৩

গ্রন্থপঞ্জি..১৬১

শব্দসংক্ষেপ ও মুণ্ডমাল পরিভাষার সারণি..১৭০

চিত্রসূচি

দ্বিতীয় অধ্যায়: ভাষা অর্জনের শারীরবৃত্তীয় প্রকৌশল: ভাষা, স্নায়ু, মস্তিষ্ক

চিত্র ২. ১: মোটরনিউরোন ২৬

চিত্র ২.২: মোটর এন্ড-প্লেট ২৮

চিত্র ২.৩: কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মুখ্য উপাদানসমূহ ৩০

চিত্র ২.৪: উপর থেকে মানবমস্তিষ্কের গঠন ৩১

চিত্র ২.৫: ব্রডম্যানসাইটোআর্কিটেকচারালম্যাপ ৩১

চিত্র ২.৬: মানবমস্তিষ্কেরউল্লম্বঅবচ্ছেদ ৩৪

চিত্র ২.৭: মানবমস্তিষ্কেরপার্শ্বীয় গঠন ৩৪

চিত্র ২.৮: প্রাইমারি মোটর অঞ্চল কর্তৃক দেহের পেশি সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ ৩৬

চিত্র ২.৯: সেনসরি হোমানকুলাস ৩৮

চিত্র ২.১০: (ক) ব্রেনস্টেমের পার্শ্বীয় চিত্র (খ) ব্রেনস্টেমের পশ্চাৎ-পার্শ্বীয় চিত্র ৪০

তৃতীয় অধ্যায়: প্রথম ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়া ও তার সমীক্ষা সংক্রান্ত পদ্ধতি

চিত্র ৩. ১: ক্রন্দনদৈর্ঘ্য ও বিরতির পর্যায় ৫৪

চিত্র ৩.২: খিদেজনিত কান্নার স্পেকটোগ্রাম ৫৫

চিত্র ৩.৩: ব্যথাজনিত কান্নার স্পেকটোগ্রাম ৫৬

চিত্র ৩.৪: অসুস্থতাজনিত কান্নার স্পেকটোগ্রাম ৫৭

চিত্র ৩.৫: বিপদসংকেতসূচক কান্নার স্পেকটোগ্রাম ৫৮

ভূমিকা

শিশুর ভাষাশিক্ষা একটি আশ্চর্যতম ও রহস্যময় প্রক্রিয়া— সারা পৃথিবী জুড়ে এ নিয়ে চলছে গবেষণা ও খোঁজ। কিন্তু শতকরা একশো শতাংশ নির্ভুল কোনো মডেল আজ, এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে প্রস্তাবিত হয়নি। বিষয়টির মূল দুরূহতার জায়গা হল, প্রাপ্তবয়স্কের ভাষাশিক্ষার যুক্তিক্রম দিয়ে শিশুর ভাষাশিক্ষাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, একজন ভাষাসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক যখন কোনো দ্বিতীয় ভাষা (ল্যাংগুয়েজ টু, L2) শেখেন, তখন তাঁর সেই ভাষাশিক্ষার পদ্ধতি হল দ্বিতীয় ভাষা অর্জন বা সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ অ্যাকুইজিশন। কিন্তু প্রথম ভাষার অর্জনপদ্ধতি বা ফার্স্ট ল্যাংগুয়েজ অ্যাকুইজিশনের সঙ্গে এই দ্বিতীয় ভাষা আয়ত্তির পদ্ধতির বেশ কয়েকটি মূলগত তফাত রয়েছে।

এর প্রধান কারণ হল, দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার সময় যে-কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ইতিমধ্যেই ভাষার সাইন সিস্টেমের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ফলে সিগনিফায়েডটি তাঁর কাছে পরিচিত, অপরিচিত হল সিগনিফায়ার। যেমন ধরা যাক, 'জল'। বাংলায় 'জল', হিন্দিতে 'পানি', ইংরেজিতে 'ওয়াটার', ফরাসিতে 'অ'। শুধু বাংলা জানেন, এমন কোনো ভাষীর কাছে 'জল' বিষয়টি পরিচিত, বা বলা যায়, এই সিগনিফায়েডটিকে তিনি চেনেন। কিন্তু উল্লিখিত বাকি তিনটি সিগনিফায়ার তাঁর কাছে অপরিচিত। ফলে হিন্দি, ইংরেজি, বা ফরাসি— তাঁর দ্বিতীয় ভাষা যাই-ই হোক না কেন, প্রথম ভাষার সিগনিফায়ারের সাহায্যে (যেমন, বাংলায় যাকে 'জল' বলে ফরাসিতে তাকে বলে 'অ', এইভাবে) তাঁকে দ্বিতীয় ভাষা শেখানো যেতে পারে। কিন্তু শিশু যেহেতু কোনোরূপ সাইন সিস্টেমের সঙ্গেই পরিচিত নয়, তাই তার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে এই সুবিধা কোনোভাবেই পাওয়া যেতে পারে না। তার ভাষাশিক্ষা অন্য ভাষার সিগনিফায়ারের সাহায্যে হতে পারে না, কারণ সে কোনো সিগনিফায়ারের (এক্ষেত্রে যেমন জল) সঙ্গেই পরিচিত নয়।

মোটামুটিভাবে দেখা গেছে, সাত বছর বয়সের পর কোনো ভাষাহীন শিশুর পক্ষে আর নতুন করে ভাষা শেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না, বা শিখতে শুরু করলেও তার ভাষাব্যবহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয় না। তাই আমরা আমাদের আলোচনা শিশুর সাত বছর বয়সের কালসীমায় সীমাবদ্ধ রাখব। এ ছাড়া, আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বাংলা প্রাইমারগুলিকে শিশুর স্বাভাবিক ভাষাশিক্ষার কথা মাথায় রেখে যাচিয়ে দেখা। যাকে বলা যেতে পারে, মনোভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে বাংলা প্রাইমারগুলির মূল্যায়ন করা।

বাংলা প্রাইমারের ইতিহাস বিচার করলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হয় ১৮১৬ সালে। ১৮১৬ সালেই শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা প্রাইমার—*লিপিধারা*। আর বাঙালি কর্তৃক লেখা বাংলা প্রাইমারের হিসেব ধরলে আর-একটু এগিয়ে এসে আমাদের দাঁড়াতে হয় ১৮৩৫ সালে। সে-বছরেই ঈশ্বরচন্দ্র বসু লেখেন *শব্দসার*। দেশীয় লেখকের লেখা বর্ণশিক্ষার এই প্রথম বইটিকে ধরেও বলা যায়, বিপুল ও প্রভূত পরিমাণ প্রাইমার রচনার রমরমা কিন্তু শুরু হয় ১৮৪০ পরবর্তী কালে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত

বাংলা প্রাইমারের সংখ্যা তার আয়তন ও বৈচিত্র্যে বিশাল আকৃতি নিয়েছে। কিন্তু, আমরা আমাদের সুবিধার্থে, এইগুলির মধ্যে থেকে বেছে নেব শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় প্রাইমারকে। এর তালিকা নিম্নরূপ :

শিশুসেবধি - বর্ণমালা ১,২,৩ (১৮৪০-১৮৫৫)
বর্ণমালা – স্কুল বুক সোসাইটি, ১ম ও ২য় খণ্ড (১৮৫৩-১৮৫৪)
শিশুশিক্ষা – ১,২,৩ (১৮৪৯-১৮৫০)
বর্ণপরিচয় – ১,২ (১৮৫৮)
হাসিখুশি (১৮৯৭)
সহজ পাঠ (১৯৩০)
কিশলয় (১৯৮১)
আমার বই (২০১৩)

পূর্ববর্তী আলোচনা এবং তাদের সীমাবদ্ধতা

জন্ম থেকে মাত্র তিন-সাড়ে তিন বছর বয়সের মধ্যে শিশু কীভাবে মূলত মাতৃভাষা এবং এক বা একাধিক ভাষা মুখে মুখে শিখে নিতে পারে, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এই দুরূহ কাজটি শিশু সম্পন্ন করে মাত্র তিন থেকে সাড়ে তিন বছর বয়সের মধ্যে। আধুনিক জটিল ও বিশদ গবেষণা থেকে ক্রমশ যে চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাতে এটুকু অন্তত বোঝা যায় যে, একজন সক্রিয় ভাষাশিক্ষার্থী হিসেবে একটি শিশু যা কিছু শোনে, তারই মধ্যে প্রতিনিয়ত বিশ্লেষণ ও বিভাজন করতে করতে সে কিন্তু শেষপর্যন্ত একেবারে নিজস্ব একটি পদ্ধতিগত পথেই এগোয়। পরিষ্কার করে বললে, বলা চলে, শিশুর ভাষা নিয়ে পরীক্ষা ও নিরীক্ষার একটি নিজস্ব অনুমাননির্ভর পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিটিকে তুলনা করা যায় পিকচার পাজল খেলার পদ্ধতির সঙ্গে। একটি গোটা ছবিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার পর সেগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে তারপর সাজাতে দিলে যা হয়, শিশুর ভাষা শেখার পদ্ধতিটাও অনেকটা তেমনই। প্রথমে যেমন সম্ভাব্য বিভিন্ন বিন্যাসে ছবির টুকরোগুলোকে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতিতে সাজাতে সাজাতে শেষপর্যন্ত ঠিকঠাক টুকরোগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে গোটা ছবিটি পাওয়া যায়, শিশুর ভাষা শেখার ধরনটিও তেমনই ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতিতেই হয়। সেও নিতান্তই অনুমানের ওপরে ভিত্তি করে ভাষিক উপাদানগুলিকে বিভিন্ন বিন্যাসে সাজায়, না মিললে আবার অন্যরকমভাবে সাজায়। এইভাবে একের পর এক বিন্যাস না মিললে নতুন নতুন বিন্যাস দিয়ে চেষ্টা করতে করতেই শিশু একসময় ভাষিক বিন্যাসের ঠিক রূপটি পেয়ে যায়। আর একবার ঠিক বিন্যাসটি পেয়ে গেলে সেই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করাটা তার কাছে আর আগের মতো কঠিন থাকে না।

ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, একটি নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীতে বা একটি নির্দিষ্ট ভাষা পরিবেশে সব শিশুই একইরকমভাবে নিজস্ব ভাষা শেখার চেষ্টা করে। কিন্তু এই শিখনপ্রক্রিয়ায় যে ঠিক কয়টি পদ্ধতি কাজ করে, তা নির্দিষ্ট করে এখনও পর্যন্ত বলা সম্ভব হয়নি। এটুকু মাত্র দেখা গেছে যে পদ্ধতিগুলি কিন্তু শিশুবিশেষে

আলাদা নয়।

অর্থাৎ, একাধিক শিশুর বিচারেই হোক, বা শিশুর শেখা একাধিক ভাষার বিচারে, সবক্ষেত্রেই এই ভাষাশিক্ষার পদ্ধতি পরস্পর সদৃশ। এই পর্যায়ে শিশুর মস্তিষ্ক প্রায় এনসাইক্লোপিডিক কায়দায় তথ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়। আশ্চর্যের বিষয়, যে সময়কাল জুড়ে শিশু শিখে ফেলছে ধ্বনির উচ্চারণ, কয়েক হাজার শব্দ মনে রাখছে এমনভাবে, যাতে সে সেগুলিকে প্রয়োগ করে উঠতে পারে, অর্থাৎ, উপাদান ও উপাদান প্রয়োগের নিয়ম সে যে বিস্ময়কর স্মরণশক্তির পরিচয় দিয়ে শিখে ফেলছে, সেই সময়কালের কোনো স্মৃতিই কিন্তু পরবর্তীকালে শিশুর থাকে না। নোয়াম চমস্কির মতে, বহু শিশুর ক্ষেত্রেই হয়তো এটাই তাদের সারাজীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানসিক উপার্জন।

কিন্তু বাংলা ভাষাকে প্রথম ভাষার জায়গায় রেখে, এই জটিল প্রক্রিয়াটি কীভাবে একটি বাঙালি শিশুর ক্ষেত্রে সম্ভব হয় এবং এই প্রক্রিয়াটি চলাকালীন শিশুর মৌখিক প্রকাশের মধ্যে বাংলা ভাষার যে ক্রমজায়মান রূপ নির্দিষ্ট যুক্তিপরম্পরা মেনে বিন্যস্ত ও বিকশিত হয়, তা এখনও আমাদের কাছে কোনো গবেষণা বা মৌলিক চর্চার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বিশেষত, বাংলা প্রাইমার নিয়ে এযাবৎকালে বহুবিধ আলোচনা হলেও, বাংলা প্রাইমারগুলি সত্যিই একটি শিশুর প্রথম ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সংগতি রাখতে পারে কি না, মনোভাষাবিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে এভাবে বাংলা প্রাইমারগুলিকে বিচার করে দেখাও একান্ত প্রয়োজনীয়। বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে যে বিপুল অদলবদল বারবার হয়েছে, এই পরিমার্জনার কারণটি খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, শিক্ষাবিদেরা বিভিন্ন সময়ে ভাষাশিক্ষার বিভিন্ন মডেলকে সামনে রেখে সাজিয়েছেন রকমারি প্রাইমার। পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কিছু প্রাইমার বাতিল হয়েছে, কিছু প্রাইমার পরিমার্জিত হয়েছে, আবার কিছু প্রাইমার তৈরি হয়েছে নতুন ধাঁচে, নতুন নিরীক্ষাকে মাথায় রেখে। ভাষাশিক্ষার বিভিন্ন মডেল ও তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চাওয়া এই প্রাইমারগুলি আদৌ যথাযথ সংগতি বিধান করতে পারল বা পারছে কি না, সেটিও এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এই গবেষণা প্রশ্নগুলিকে নির্দিষ্ট আকারে পেশ করলে, সেগুলি দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

- শিশুর ছয় সপ্তাহ থেকে ছয় মাস বয়সের মধ্যে, অর্থাৎ, কু-ধ্বনি থেকে কলধ্বনি পর্যায়ে কী কী ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে, কলধ্বনি পর্যায় থেকে প্রথম শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকছে কি না, প্রথম শব্দ-দ্বিতীয় শব্দ-তৃতীয় শব্দ— এভাবে ধারাবাহিকতার মধ্যে কোন্ কোন্ ধ্বনি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কোন্ কোন্ ধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিচ্ছে— অর্থাৎ জন্মের পর থেকে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করার পথে ধ্বনি আত্তীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ধ্বনিগত পথরেখাটি কীরকম?

- শব্দার্থ আয়ত্ত করার ধরনটিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখতে চেয়েছি যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর শিশু কয়টি এবং কোন্ ধরনের শব্দ আয়ত্ত করে। অর্থাৎ, এক বছর বয়সে তার লেক্সিকন সাইজ কীরকম,

দেড় বছরে কীরকম, এভাবে তার শব্দ আত্তীকরণের হদিশ পাওয়া যেতে পারে কিনা, তা আমাদের অন্বিষ্ট। ১৮ মাসের পর প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একটি করে শব্দ সে আয়ত্ত করে। তখন প্রতি সপ্তাহেই আমরা দেখেছি শিশুর সামগ্রিক শব্দভাণ্ডারের পরিমাণ।

- প্রথমে এক শব্দের বাক্য, তারপর দু শব্দ থেকে শুরু করে সরল বাক্য, ক্রমে জটিল বাক্য নির্মাণের স্তরগুলি আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, দেখেছি বাক্যের মধ্যে 'স্ট্রাকচার ডিপেন্ডেন্স' কখন থেকে কীভাবে দেখা দেয় এবং বাংলা ভাষায় বাক্য গঠনের নানা সূত্র কীভাবে এসে যায় তাদের ভাষা দক্ষতার মধ্যে।

- এসবের পাশাপাশি আমরা দেখেছি বাহ্যিক স্টিমুলির সঙ্গে ভাষা শেখার প্যাটার্নের পরিবর্তনের রূপরেখাটিও। সংশ্লিষ্ট পরিবারের ধরন ভাষা শেখার উপরে প্রভাব বিস্তার করে কি না, শিশুর ভাষার মধ্যে কোনো অসংগতি ধরিয়ে দিলেও সেটা তারা শুধরে নেয় কি না, কিংবা বড়োরা যখন ছোটোদের-মতো-কথা (চাইল্ড ডিরেক্ট স্পিচ) বলা শুরু করেন, তখন আদপেই তা কোনো সাহায্য করে কি না, তা দেখে বিশ্লেষণ করাও এই গবেষণাকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর সঙ্গে আছে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার সূচনা যদি তা একেবারে প্রাথমিক স্তরেই ঘটে।

- শিশুর ভাষা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে মূলত লক্ষণীয় হল, শিশুর মুখে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার বিশেষ রূপটি। অর্থাৎ, ভাষাশিক্ষার কোন্ কোন্ পর্যায়ে বাংলা ভাষার কোন্ কোন্ বিশেষ রূপ ও শব্দাবলি শিশুদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তা আমরা দেখেছি।

- শিশুর ভাষাশিক্ষার আদলকে মাথায় রেখে বাংলা প্রাইমার ও প্রারম্ভিক ব্যাকরণ বইগুলিকে মূল্যায়ন করে আমরা দেখেছি যে, সত্যিই সেগুলি শিশুর স্বাভাবিক ভাষাশিক্ষার সহায়ক, নাকি তার নিজস্ব ভাষা অর্জনের পদ্ধতির থেকে পাঠ্য বইগুলিতে ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা ও আরোপিত?

গবেষণা-পদ্ধতি

এইরকম নানা প্রশ্ন আছে মাতৃভাষাশিক্ষার বিষয়টিকে ঘিরে এবং এই বিষয়টি, এ পর্যন্ত দেখা হবে শিশুর উচ্চারণের ওপরে ভিত্তি করে। সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সেই সব শব্দাবলির প্রকৃতিগত পরিবর্তনের একটি বিন্যাস আমরা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। সেক্ষেত্রে আমাদের কার্যপদ্ধতি হল, বিভিন্ন বয়স এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান থেকে উঠে আসা শিশুদের মধ্যে সমীক্ষা চালানো এবং তার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। আমাদের এই পর্যায়ের আলোচনা সদ্যোজাত থেকে ছয় বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে যা পাওয়া গেছে, তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা ভাষা শেখার ধরনটিকে তুলে ধরাই গবেষণার এ পর্যায়ের উদ্দেশ্য।

সমগ্র আলোচনাটিকে দুটি বড়ো অংশে ভাগ করা হয়েছে—

১. শিশুর প্রাথমিক ভাষাশিক্ষা থেকে শুরু করে কোনো বিদ্যালয়ে ভরতি হওয়া পর্যন্ত শিশুর মুখে ভাষার ক্রমবিবর্তন

২. বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কিন্ডারগার্টেন প্রথা অনুসারে মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা শিক্ষা ও বাংলা প্রাইমারের মূল্যায়ন

১. শিশুর প্রাথমিক ভাষাশিক্ষা থেকে শুরু করে কোনো বিদ্যালয়ে ভরতি হওয়া পর্যন্ত শিশুর মুখে ভাষার ক্রমবিবর্তন:

ভাষাশিক্ষার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের এই আলোচনাকে দুটি অংশে আমরা ভাগ করে নিয়েছি। প্রথম অংশের আলোচনার প্রথমেই ব্যবহারবাদীদের (বিহেভিয়ারিস্টস) সঙ্গে নোয়াম চমস্কির বক্তব্যের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চমস্কির মতে, মানবশিশু জন্মগতভাবেই ভাষা অর্জনের ক্ষমতা লাভ করে, অর্থাৎ, সে ভাষাশিক্ষার জন্য 'প্রি-প্রোগ্রামড' বা 'জেনেটিকালি প্রোগ্রামড'। যাকে তিনি নাম দিচ্ছেন, 'ইনেট হিউম্যান ফ্যাকাল্টি অফ ল্যাংগুয়েজ' । তাঁর প্রাথমিক (১৯৬৫) মত ছিল, শিশুর মস্তিষ্কেই রয়েছে 'ল্যাংগুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস' (LAD)। অর্থাৎ, পূর্ব থেকেই সে মানবভাষার কয়েকটি সার্বিক সাধারণ লক্ষণ (লিঙ্গুইস্টিক ইউনিভার্সালস) সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সুতরাং ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে তার পূর্বপ্রোথিত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে একটি সার্বভাষিক ব্যাকরণ (ইউনিভার্সাল গ্রামার)। পরে সে যখন যে বিশেষ ভাষা শেখে, তখন সেই ভাষার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম (ল্যাংগুয়েজ স্পেসিফিক রুলস), যা ভাষাবিশেষে পৃথক, এবং শব্দ, শব্দখণ্ড ইত্যাদি কিছু ভাষিক উপাদান শেখাই হয়ে ওঠে শিশুর ভাষাশিক্ষার মূল ভিত্তি। কিন্তু, স্কিনার, ব্লুমফিল্ড প্রমুখ ব্যবহারবাদীদের মতে, ভাষাশিক্ষা ও কথা বলা উভয়ই আসলে স্টিমুলাস-রেসপন্সের ফল। অর্থাৎ, শিশুর ভাষাশিক্ষা হয় আসলে সে যা শোনে, তারই অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

কিন্তু চমস্কি তাঁর তত্ত্বে এই অনুকরণবাদকে সর্বতোভাবে খারিজ করলেন। তাঁর যুক্তি, নকলনবিশিই যদি শিশুর ভাষাশিক্ষার একমাত্র প্রক্রিয়া হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে জন্মাবধি কখনও না শোনা লক্ষাধিক বাক্যাবলির অর্থ উদ্ধার কোনোদিনই কোনো মানুষের পক্ষে করে ওঠা সম্ভব হত না, এমনকি, সে নিজে নিজে নতুনতর বাক্যপ্রয়োগেও সক্ষম হতে পারত না।

এর দ্বিতীয় অংশে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, শিশুর বয়স অনুযায়ী প্রথম ভাষা শিক্ষার পর্যায়গুলি। এ অংশে আমরা লক্ষ করব কীভাবে শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রমশ কিছু অর্থহীন শব্দ অর্থাৎ কলধ্বনি থেকে ক্রমে ক্রমে একশাব্দিক এক্সপ্রেশন, দ্বিশাব্দিক এক্সপ্রেশন, প্রশ্নসূচক বাক্য গঠন ও শেষপর্যন্ত একেবারে পরিণত ভাষাসৃষ্টির দক্ষতায় গিয়ে পৌঁছোয়।

বিভিন্ন গবেষকরা অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে যে সমীক্ষা চালিয়েছেন এবং বাঙালি শিশুর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যা দেখা গেছে তা হল, জন্মের ছয় সপ্তাহ বা দেড় মাস বয়স থেকে কু-ধ্বনি (কুইং) শুরু হয়ে যায় এবং ছয় মাসের মধ্যেই এসে যায় কলধ্বনির (ব্যাবলিং) স্তর। এর মাসখানেকের মধ্যেই কথার ক্ষেত্রে সুর (ইনটোনেশন) এসে যুক্ত হয়। এক বছরের মধ্যেই এক-একটি গোটা শব্দ, দেড় বছরের মধ্যে তিন-চারটে শব্দ দিয়ে পদনির্মাণের প্রয়াস, দু-বছরের মধ্যে পদনির্মাণ যথাযথ হয়ে দেখা যায় প্রশ্নসূচক ও নিষেধবাক্য গঠনের প্রবণতা।

এই স্তরগুলি যে-কোনো সুস্থ, স্বাভাবিক পরিবেশে থাকা শিশুর ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে এই স্তরগুলিকে আমরা দেখতে চেয়েছি চারটি দিক থেকে: ধ্বনি, শব্দার্থ, বাক্যনির্মাণ এবং ব্যাবহারিক দিক থেকে। এক্ষেত্রে তাকে শিখতে হয় মূলত দুটি বিষয়— কিছু ভাষিক উপাদান এবং এবং সেই উপাদানগুলি ব্যবহারের কিছু নিয়মাবলি। ভাষিক উপাদানগুলির মধ্যে থাকে ধ্বনি, শব্দ এবং শব্দখণ্ড বা রূপ। অন্যদিকে, নিয়মাবলির মধ্যে তাকে আয়ত্ত করতে হয়—

ক. ধ্বনিগত নিয়ম, যেমন বাংলায় ‘এবার’-এর ‘এ’-এর উচ্চারণ হবে এ-এর মতো, কিন্তু ‘এক’-এর ‘এ’-এর উচ্চারণ হবে ‘অ্যা’-এর মতো।

খ. পদগঠন ও শব্দ তৈরির নিয়ম, যেমন বাংলায় ‘দুঃখ’ শব্দটির সঙ্গে ‘ময়’ যোগ করে ‘দুঃখময়’ হতে পারে, কিন্তু ‘মহিমা’-এর সঙ্গে ‘ময়’ যুক্ত করে ‘মহিমাময়’ করে ফেলা যায় না, শব্দটি হবে ‘মহিমময়’।

গ. বাক্যনির্মাণগত নিয়ম, যেমন বাংলায় সাধারণত কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে বাক্যের বাকি উপাদানগুলি বসে।

ঘ. অর্থগত নিয়ম, যেমন ‘ডাল’ বলতে কোথায় খাদ্য বোঝাবে আর কোথায় গাছের কাণ্ড বোঝাবে— তাও শিশুকে বুঝতে শিখতে হয়।

২. বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কিন্ডারগার্টেন প্রথা অনুসারে মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা শিক্ষা ও বাংলা প্রাইমারের মূল্যায়ন:

বিভিন্ন প্রাথমিক বা কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠানে যে প্রাইমারগুলি ব্যবহৃত হয়, তার মূল লক্ষ্য কিন্তু ভাষা বলতে শেখানো বা মুখের বুলি ফোটানো নয়। কারণ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে আসার আগেই শিশু প্রথম ভাষা বলতে পারে এবং সেই প্রথম ভাষার সম্পূর্ণ ব্যাকরণটি তার মস্তিষ্কে আত্তীকৃত বা ইন্টারনালাইজড হয়েছে। অর্থাৎ, সে ভাষা শুনতে, বুঝতে ও পড়তে পারে। প্রাইমার শুধু শিশুকে ভাষা ব্যবহারের একটি বিশেষ পথে শিশুকে চালিত করে। তা হল, ভাষা পড়া ও ভাষা লেখার পথ। একে আমরা বলতে পারি ল্যাংগুয়েজ আর্ট। কোন্ প্রাইমার কীভাবে শিক্ষণের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করবে, তা বহুলাংশেই নির্ভর করে বিবেচনা এবং অতি অবশ্যই, শিশুর ভাষাশিক্ষার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপরে।

এ প্রসঙ্গে আমরা প্রচলিত ও বিখ্যাত বাংলা প্রাইমারগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে বাংলা ভাষার প্রাথমিক স্তরের রূপটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি এবং এক্ষেত্রে আমাদের অন্বিষ্ট বিষয় ছিল, কীভাবে শিশুর মুখের ভাষা এবং প্রাইমারের সাহিত্যভাষা পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম এবং কীভাবে এরা একে অপরের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে, তা খুঁজে দেখা। বিশেষ করে স্কুলস্তরে প্রথম ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শ প্রাইমার সরাসরি অনুসরণ করার চেষ্টা করে শিশুর মস্তিষ্কের ভাষা আয়ত্তি ও বিকাশের রূপরেখাটিকে। তাই, প্রাইমার প্রণোদিত শিক্ষার সঙ্গে শিশুর স্বাভাবিক ও মৌখিক ভাষাশিক্ষার সংগতিবিধান একান্ত জরুরি। বাংলায় এযাবৎকালে প্রচলিত প্রাইমারগুলিকে ধরে তার মূল্যায়নও এই গবেষণার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম ভাষা অর্জনের তাত্ত্বিক পরিকাঠামো

প্রথম ভাষা অর্জনের তাত্ত্বিক পরিকাঠামো

মানুষ কীভাবে ভাষা অর্জন করে, বলতে শেখে এবং শেখায়, সেই বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানের পরিসরে আলোচনার ইতিহাস বেশ পুরোনো। এই আলোচনার সূত্রেই বেশ কয়েকটি তত্ত্বের কথা উঠে এসেছে বারবার। বহু তত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানের পরীক্ষানিরীক্ষার সূত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর দ্বারা বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাবিত হয়েছে, কালের নিয়মে বেশ কিছু তত্ত্ব আজ পরিত্যক্ত, পরীক্ষিতভাবেই সেগুলি অসফল। কিন্তু, এর পরেও এমন বেশ কিছু তত্ত্ব রয়ে গিয়েছে, যার সর্বাঙ্গীণ যৌক্তিকতা হয়তো প্রমাণিত হয়নি, কিন্তু পরবর্তী তত্ত্বের সাফল্য সূচিত হয়েছে পূর্ববর্তী এই তত্ত্বগুলির অনুসন্ধানেরই নিরিখে। তাই, ভাষা অর্জনের মূল প্রক্রিয়াটিকে একটি যুক্তিবদ্ধ কাঠামোয় দাঁড় করাতে গেলে, এর মধ্যে মুখ্য তত্ত্বগুলি প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা প্রয়োজন। ভাষা অর্জন, ভাষা শিখন ও ভাষা শিক্ষণ— এই তিনটি মানদণ্ডের বিচারে, এই অধ্যায়ে তিনটি তত্ত্বের প্রসঙ্গ অবতারণা করা হল।

- ব্যবহারবাদ (Behaviourist Theory)
- জ্ঞানমূলক তত্ত্ব (Rationalist Theory or Cognitive Theory)
- সহজাতবাদ (Mentalist Theory or Innatism)

এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও দীর্ঘদিনব্যাপী সমর্থিত তত্ত্বটি অবশ্যই ব্যবহারবাদ। জ্ঞানমূলক তত্ত্বের পূর্বসূত্র হিসেবেও ব্যবহারবাদ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত, জ্ঞানমূলক তত্ত্বের সঙ্গে ব্যবহারবাদী তত্ত্বের সম্পর্কটি আদৌ বিরোধিতার নয়। বরং বলা যেতে পারে, দুটি তত্ত্বের মুখ্য ভিত্তি আলাদা আলাদা। জ্ঞানমূলক তত্ত্ব এবং ব্যবহারবাদী তত্ত্ব—দুটির ক্ষেত্রেই ভাষা শিক্ষার যান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিকে মূল নির্ধারক হিসেবে ধরা হয়েছে। ব্যবহারবাদী তত্ত্বের ক্ষেত্রে আচরণকেই যেখানে ভাষা অর্জনের একমাত্র নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তার থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে জ্ঞানমূলক তত্ত্ব দাবি করে, শুধু আচরণই নয়, মানবমন এবং জ্ঞানও ভাষা অর্জনের বিস্তৃত নির্ধারক। এই অধ্যায়ে তাই ব্যবহারবাদী তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে সবিস্তারে এবং তারই বিস্তৃত পর্যালোচনা হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে জ্ঞানমূলক তত্ত্বকে।

১.১. ভাষা শিক্ষা ও ভাষা অর্জনের ব্যবহারবাদী তত্ত্ব

১.১.১. ভূমিকা

ব্যবহারবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ শুধু প্রথম ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রেই করা সম্ভব। প্রথম ভাষা ব্যতিরেকে দ্বিতীয়, তৃতীয়, অন্যান্য অথবা বিদেশি ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রেও কখনোই এই তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়।

১.১.২. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের মূল সূত্র

ব্যবহারবাদী তত্ত্বের মূল কথা হল, শিশুরা দেখে আর শুনে শেখে। আর সেই অভ্যাসের ফলই তাদের ভাষার অর্জন এবং ক্রমবিকাশের পথে সহায়ক। তাদের সামনে পূর্ণবয়স্ক মানুষের ভাষা ব্যবহার এক্ষেত্রে অনেকটাই 'রোল মডেল'-এর মতো কাজ করে। চোখের সামনে সেই পরিণত ভাষা ব্যবহারের নিদর্শনগুলিই সেই সময়ে হয়ে ওঠে তাদের ভাষা শেখার প্রাথমিক উপাদান। গোড়ায়, তারা শুধুই অনুকরণ করে। সেই অনুকৃত ভাষা ব্যবহার পূর্ণবয়স্কদের কাছে কীভাবে গৃহীত হচ্ছে, তার 'ফিডব্যাক'-ও শিশুদের সাহায্য করে অনুকরণটিকে মূলের আরও কাছাকাছি নিয়ে যেতে। প্রাপ্তবয়স্ক ভাষাব্যবহারকারীর স্বীকৃতিই তাদেরকে প্রণোদিত করে অনুকরণ থেকে অভ্যাসের পথে এবং এইভাবেই, মূলত অনুকরণ, স্বীকৃতি ও অভ্যাসের হাত ধরে শিশুর ভাষা ব্যবহারের পথটি প্রশস্ত হয়। ব্যবহারবাদ সমর্থনকারী তাত্ত্বিকদের মূল বক্তব্য, '... Infants learn oral language from other human role models through a process involving imitation, rewards, and practice. Human role models in an infant's environment provide the stimuli and rewards..."[১]

এখানে, 'স্টিমুলি' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। একে বাংলায় 'উত্তেজনা' বলা যেতে পারে। ব্যবহারবাদীরা আসলে শিশুর ভাষা ব্যবহারের বিষয়টিকে দেখেছিলেন একটি বিশেষ উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার প্রবণতা হিসেবেই। তাঁদের মতে, শিশুরা যখন তাদের চারপাশে শোনা বড়োদের মুখের ভাষা নকল করতে গিয়ে বিভিন্ন বাক্‌ভঙ্গি বা 'স্পিচ প্যাটার্ন' অনুকরণ করতে শুরু করে, তখন সাধারণত শিশুর এই বাক্‌প্রচেষ্টা তার আশেপাশে যথেষ্ট সাড়া জাগায়। তার প্রথম বুলি ফোটা থেকে শুরু করে আধো উচ্চারণ, বড়োদের কাছে শিশুর ভাষাব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই চমকপ্রদ এবং সেই বিস্ময় তাঁরা ঢেকেও রাখেন না। একটি শিশু তার প্রথম ভাষা ব্যাবহারের প্রতিটি প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই বড়োদের প্রশংসা কুড়োতে থাকে, পায় স্নেহ, আদর। এই ছোট্ট ছোট্ট স্বীকৃতিই তখন তার কাছে পুরস্কারস্বরূপ হয়ে ওঠে। স্বীকৃতি পাওয়া, চমক জাগানো আর আদরের লোভ তার কাছে 'পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট'-এর মতো কাজ করতে থাকে।

১.১.৩. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের প্রেক্ষাপট

ব্যবহারবাদ মূলত মনস্তত্ত্ববিদ্যার একটি তত্ত্ব। এই তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন জন ব্রোয়াদুস ওয়াটসন (১৮৭৮-১৯৫৮)। ওয়াটসন এই তত্ত্বটিকে মূলত মাতৃভাষা শিক্ষার (Native Language Learning) সূত্র হিসেবেই প্রণয়ন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রথাগত ব্যাকরণের একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভাষা অর্জনের আধুনিক কাঠামো অনুসন্ধান। পরবর্তীকালে লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড (১৮৮৭—১৯৪৯), ওরভাল হোবার্ট মোরার (১৯০৭—১৯৮২), বুরহাস ফ্রেডেরিক স্কিনার (১৯০৪—১৯৯০) এবং আর্থার স্টাটস (১৯২৪) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যবহারবাদ আজও সমর্থিত হয়ে আসছে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে আমেরিকায়

মনস্তত্ত্ববিদ্যার একটি আধুনিক প্রস্থান হিসেবে ব্যবহারবাদ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে, মানুষের ভাষিক ব্যবহার সংক্রান্ত তত্ত্বের এই নতুন ধ্যানধারণা সেসময় বেশ সাড়া জাগিয়েছিল বুদ্ধিজীবী মহলে। তবে, ব্যবহারবাদ মূলত জনপ্রিয়তা পায় ১৯৫০-এর দশকে, স্কিনার-এর হাত ধরে।

১.১.৪. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের ব্যাখ্যা

ব্যবহারবাদী তত্ত্বের মূল সূত্র কিন্তু নিহিত রয়েছে স্টিমুলাস-রেসপন্সের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যেই। ব্যবহারবাদ মনে করে, এই স্টিমুলাস এবং রেসপন্স এমন হতে হবে, যা দেখা যায় এবং পরিমাপ করা যায়। স্টিমুলাস হল বাহ্যিক কোনো উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বস্তু, বা বিষয়। আসলে, সংবেদনশীলতা জীবের ধর্ম এবং সংবেদনা হল জীবনের অন্যতম লক্ষণ। সংবেদনা আসলে জীবের এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যার কারণে জীব পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তনে সাড়া দেয়। পরিবেশের এই যেসব পরিবর্তন জীবদেহ শনাক্ত করতে পারে এবং যা জীবকে সেই উত্তেজনায় সাড়া প্রদান করতে সাহায্য করে, তাকেই উদ্দীপক বা স্টিমুলাস বলে। আর এই উত্তেজনার প্রভাবে জীবদেহ যেভাবে সাড়া দেয়, সেই সাড়া দেওয়ার পদ্ধতিটিই রেসপন্স। এই পরিমাপযোগ্য স্টিমুলাস ও রেসপন্স-এর পারস্পরিক সংযোগ এবং সম্পর্কই ব্যবহারবাদের ভিত্তি। ব্যবহারবাদীদের মধ্যে এডওয়ার্ড থর্নডাইক প্রথম বলেন, শিখন (লার্নিং) হল এমন একটি পদ্ধতি যা আদতে মানুষের নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যবহার এবং সেই ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের সমন্বয়। উইলগা রিভার্স এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—"... the behaviorist theory of stimulus-response learning, particularly as developed in the operant conditioning model of Skinner, considers all learning to be the establishment of habits as a result of reinforcement and reward."[২]

রিভার্সের বক্তব্য থেকে বোঝাই যায়, মানুষের শেখার পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াটিকে ব্যবহারবাদে চিহ্নিত করা হচ্ছে স্টিমুলাস-রেসপন্স লার্নিং পদ্ধতির নিরিখে। এখানে রিভার্স সেই সূত্রেই স্কিনারের অপারেন্ট কন্ডিশনিং মডেলের কথা টেনে আনলেন, যেখানে স্কিনার বলছেন, যাবতীয় শিখন প্রক্রিয়াই আসলে কয়েকটি অভ্যাসের সমষ্টি, যে অভ্যাসগুলি তৈরি হয়ে ওঠে সেই অভ্যাসের পুনর্ব্যবহার এবং স্বীকৃতি প্রদানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে।

রিভার্স যখনই তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছেন পাভলভের পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণটির ওপরে, তখন আমাদের একথাও মাথায় রাখতে হবে যে, পাভলভের পরীক্ষাটির মূল সিদ্ধান্ত ছিল, স্টিমুলাস এবং রেসপন্স সবসময় একসঙ্গে ক্রিয়াশীল। ভাষা শেখার ক্ষেত্রে স্টিমুলাস এবং রেসপন্স কীভাবে একসঙ্গে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে, তা বোঝাতে গিয়ে ব্যবহারবাদীরা বলেছিলেন, শিশুদের প্রথম ভাষা অর্জনের একটি বিশেষ রীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। তারা বড়োদের মুখের বাক্‌ধ্বনি, বা আশেপাশে তৈরি হওয়া ধ্বনিসমষ্টিকে যেভাবে শোনে, সেভাবেই বলার চেষ্টা করে। এই বলার পদ্ধতিটি স্বাভাবিকভাবেই নকল করা বা অনুসরণের প্রচেষ্টা থেকে সঞ্জাত। এই অনুকৃত ধ্বনিসমূহকে ব্যবহারবাদীরা চিহ্নিত করেছেন 'ব্যাবলিং' বা 'কলধ্বনি' হিসেবে। মজার

কথা হল, এই কলধ্বনির প্রচেষ্টায় শিশুটির আশেপাশে থাকা বড়োরা ঠিক যেভাবে সাড়া দেন, যেভাবে তার এই ভুলে-ভরা, আধো আধো উচ্চারণকেও বোঝার চেষ্টা করেন, কিংবা বুঝতে পারলে সেই অনুযায়ী স্বীকৃতি দেন, সেই পথ ধরেই নির্ধারিত হয় শিশুটির পরবর্তী বাক্‌প্রচেষ্টা।

অর্থাৎ, শিশুটি বড়োদের বলা শব্দ বা ধ্বনিগুচ্ছ যখন অনুকরণ করে, বড়োরা যদি তার অস্ত্যর্থক প্রতিক্রিয়া দেন, শিশুটিকে পুরস্কৃত করেন, বা এমন কোনো আচরণ করেন, যাতে শিশুটি উৎসাহ পায়, তখন তা শিশুটির 'রিওয়ার্ড' বা অনুকূল প্রতিক্রিয়ার কাজ করে। আর এই 'রিওয়ার্ড'-এর প্রণোদনাতেই শিশুটি পরবর্তী উচ্চারণের প্রচেষ্টার দিকে এগিয়ে যায়। এভাবেই সে আবারও আরও একটি শব্দ বা দলগুচ্ছ, বা ধ্বনিগুচ্ছকে আরও একবার অনুকরণ করে।

ক্রমশ এই অনুকরণ থেকেই সে ধ্বনি এবং ধ্বনিগুচ্ছ আত্তীকরণ করতে শুরু করে। যত বড়ো হয়, ক্রমশ শব্দ বা ধ্বনিগুচ্ছর সীমা অতিক্রম করে সে বাক্য তৈরির পদ্ধতি শিখতে শুরু করে। বাক্যাংশ জুড়ে জুড়ে বাক্য বলতে থাকে, অবশ্য বাক্যের অর্থ অনুধাবনের বিষয়টিও ততদিনে জড়িয়ে যায় তার ভাষা অর্জনের বৌদ্ধিক ক্ষমতার সঙ্গে। এই অনুধাবন অনেকটাই আসে সাধারণীকরণ (জেনারালাইজেশন) আর সাদৃশ্যের (অ্যানালজি) সূত্র ধরে।

যেমন ধরা যাক, 'খাওয়া' শব্দের পুরাঘটিত অতীত কালের ক্রিয়াপদের রূপটি হবে 'খেয়েছিল', 'করা' থেকে হবে 'করেছিল', কিন্তু 'যাওয়া' থেকে কখনোই 'যেয়েছিল' হবে না, হবে 'গিয়েছিল'। ভাষা অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়ে কিন্তু শিশুটি সাধারণীকরণ আর সাদৃশ্যের সূত্র ধরে একে 'যেয়েছিল'-ই বলবে। ভাষার গঠনের মধ্যে এই বিবিধ সাদৃশ্য লক্ষ করার ক্ষমতা এবং সাধারণীকরণ থেকে তৈরি হওয়া পর্যবেক্ষণ যখন তার ভাষিক প্রয়োগের ওপরে প্রভাব ফেলতে থাকে, তখন তার সেই পারিপার্শ্বিক ভাষাব্যবহারের প্যাটার্নকে অনুসরণ করে নিজে স্বতন্ত্র বাক্‌প্রয়াস করার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে এই ভুল করার শর্তগুলি। এই ভুলগুলির শনাক্তকরণ ও সংশোধনই তাকে পৌঁছে দেয় ভাষাব্যবহারের পরবর্তী ধাপে। ক্রমশ পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যেই তাদের এই আধো কথা বা কলধ্বনি ক্রমশ পরিণত সামাজিক ভাষাব্যবহারের রূপ পরিগ্রহণ করতে শুরু করে।

তবে, শুধু 'রিওয়ার্ড' বা পুরস্কার নয়, শিক্ষার্থীর ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রের তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশে থাকা ভাষীসম্প্রদায়ের অন্তর্গত অভিভাবকদের আরও একটি দায়িত্ব রয়েছে। তাকে ব্যবহারবাদীরা চিহ্নিত করলেন 'রি-ইনফোর্সমেন্ট' হিসেবে। শিশু তার নিত্যনতুন শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে, প্রতিনিয়ত আরও আরও ভাষিক উপাদান আত্মস্থ করতে করতে তাকে কয়েকবার তার আগের আয়ত্ত করা বিষয়গুলি মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাকে দিয়ে তার পূর্বের অধীত ভাষা-উপাদানগুলিকে চর্চা করানো, ভুল হলে

আরও একবার খেই ধরিয়ে দিয়ে, বা মনে করিয়ে দিয়ে তাকে একটি নির্দিষ্ট ভাষিক অভ্যেসের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলাটাই শিক্ষার্থীর চারপাশের পরিবেশের ভূমিকা।

একটু একটু করে তার চারপাশে পরিণত ভাষীদের বাক্‌ব্যবহারের রীতিগুলিকে সে প্রচ্ছন্নভাবে আত্তীকরণ করতে থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের উচ্চারণ বড়োদের থেকে বৈশিষ্ট্যগতভাবে পৃথক করাই মুশকিল হয়ে পড়ে, যদিও কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা বা স্বরতন্ত্রীর বিশেষত্ব তখনও স্বাভাবিকভাবেই শিশুসুলভই থাকে। এভাবেই, ব্যবহারবাদীরা মানবশিশুর ভাষা শিখনের প্রক্রিয়াটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্টিমুলাস-রেসপন্স মনস্তত্ত্বের কার্যপ্রণালী দিয়ে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে, শিশুর আচরণের কোনো পরিবর্তনকে তখনই তার কার্যকর ভাষা অর্জনের মধ্যে অঙ্গীভূত করা হবে, যখন ভাষা হয়ে উঠবে কোনো একটি বাহ্যিক স্টিমুলাসের সার্থক রেসপন্স। শিশুর এই প্রাথমিক ভাষাশিক্ষার প্রক্রিয়াটি 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' অর্থাৎ 'ভুল ও সংশোধন' পদ্ধতির অনুসরণে সম্পন্ন হয়। শিশু যে ভাষাসম্প্রদায়ের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠছে, তার নিজস্ব উচ্চারণগুলি আপাতভাবে সেই ভাষাসম্প্রদায়ের সাধারণ ভাষিক উচ্চারণের যত কাছাকাছি পৌঁছোতে পারবে, তার চারপাশের ভাষীরা ক্রমশ তত স্পষ্টভাবে তার কথা বুঝতে পারবেন, ভাষার মাধ্যমে শিশু তাঁদের সঙ্গে যে যোগাযোগ স্থাপন করতে চায়, তাঁরাও যোগাযোগের প্রচেষ্টায় আরও সাড়া দেবেন। এই প্রতিক্রিয়া পাওয়াটাই শিশুর কাছে পুরস্কার পাওয়ার সমতুল্য। আর তার ভাষাগত উচ্চারণে যদি খামতি থেকে যায়, সেই উচ্চারণ যদি তার চারপাশের ভাষীদের ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, সেক্ষেত্রে হয় তাঁরা শিশুর সেই যোগাযোগের প্রচেষ্টায় কোনো উচ্চবাচ্য করবেন না, সাড়া দেবেন না, বা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া জানাবেন। এই প্রতিকূল প্রতিক্রিয়াকেই রিভার্স ব্যাখ্যা করেছেন 'lack of reward' বলে। শিশুর নিজস্ব উচ্চারণ ও ভাষা ব্যবহার পরিণত ভাষাব্যবহারকারীর সাপেক্ষে যতটা সংগতিপূর্ণ হবে, তার পরিপার্শ্বের অনুকূল প্রতিক্রিয়া ততই বাড়বে এবং ভুল সংশোধনের মাধ্যমেই সে ক্রমশ ভাষার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পার্থক্যগুলি অনুধাবন করতে শিখবে। অর্থাৎ, ব্যবহারবাদীরা বারবার ভাষা শেখার সঙ্গে ভাষা শেখানোর পদ্ধতিটির ওপরেও জোর দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁদের মতে, শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতাই হল ভাষা শিখতে চাওয়া। বাকিটা অবশ্যই নির্ভর করে তার সামাজিক পরিবেশের ওপরে, যে পরিবেশ থেকে একইসঙ্গে সে ভাষা আয়ত্ত করবে করবে এবং সেই পরিবেশই আবার তার ভুল শুধরে সংশোধনের পথেও সহায়ক হয়ে উঠবে। ব্যবহারবাদীরা আসলে শিশুর ভাষাশিক্ষাকে একটি অভ্যাস গড়ে তোলার (habit formation) পদ্ধতির নিরিখেই বিচার করেছেন। ভাষাশিক্ষণ প্রসঙ্গে বলছেন, 'A highly complex learning task, according to this theory may be learned by being broken down into small habits. These are formed correct or incorrect responses, are rewarded or, punished, respectively.'[৩] অর্থাৎ, মানবশিশুর ভাষাশিক্ষা কোনো বিচ্ছিন্ন একটি প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি অন্যান্য সামাজিক ও শারীরবৃত্তীয় অভ্যাস অর্জনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

১.১.৫. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি

ব্যবহারবাদী তত্ত্বে শিশুর ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে যে পুরস্কার ও সংশোধনের সূত্রটির ওপরে এত বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, ঠিক সেই পথেই এই তত্ত্বটি বারবার সমালোচিত হয়েছে। প্রতিযুক্তিতে বলা হয়েছে, যদি শিশুর ভাষাশিক্ষা বড়োদের অনুকূল প্রতিক্রিয়ার ওপরে এতটাই নির্ভর করে থাকে, তাহলে যেসব অভিভাবক তাঁদের সন্তানের কার্যকলাপের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন না, কিংবা মনোযোগ দিলেও প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া দিতে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে সেই শিশুটি কীভাবে ভাষা অর্জন করতে সক্ষম হয়? তাহলে কি পরোক্ষে ধরে নিতে হবে যে, পরিপার্শ্ব থেকে পুরস্কারস্বরূপ যথেষ্ট অনুকূল প্রতিক্রিয়া না পেলে, কিংবা সংশোধনী হিসেবে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া না পেলে শিশুর ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়া কার্যত থমকে যায়? দ্বিতীয়ত, ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিমূর্ত ধারণাগুলিই বা শিশু কীভাবে বুঝতে শেখে, যেখানে আদতে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো শিখনই সম্ভব নয়? দেখা গেছে, বয়সজনিত পরিণতির একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে প্রায় সব শিশুই একইরকম ভাষিক দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। যদি বিভিন্ন শিশুর ভাষা অর্জন বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, তাহলে, এই যে ভাষা অর্জনের সমতা, যাকে পরবর্তীকালের ভাষাবিজ্ঞানীরা 'uniformity of language acquisition in humans' বলে চিহ্নিত করছেন, তাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? সব মিলিয়ে, এই ব্যবহারবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহু প্রশ্নচিহ্ন উঠে এল। বলা বাহুল্য, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের তত্ত্ব অবতারণা করা হয় মূলত দুটি বিষয়কে মাথায় রেখে—মানুষের আচরণের কার্যপ্রণালী এবং শিক্ষার্থীর মানসিক প্রতিক্রিয়া। খুব স্বাভাবিকভাবেই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো একটি তত্ত্বের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে এই দুটি মাত্রাকে সম্পূর্ণত স্পর্শ করা যায় না। ব্যবহারবাদের বিরুদ্ধ মতগুলিকে আমরা সূত্রাকারে নিবদ্ধ করতে পারি এইভাবে—

- ব্যবহারবাদী তত্ত্বে বলা হয়েছে, ভাষা শেখার মূল কৌশল নিহিত রয়েছে অনুকরণ, সংশোধনের মাধ্যমে পুনরায় ফিরে দেখা আর পুরস্কার বা অনুকূল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। শিশুর ভাষা অর্জন বিষয়ে তাঁদের যে পর্যবেক্ষণ, তাতে শিশু ভাষা শেখার স্তরে প্রায় সবই অনুকরণ করে, মৌলিক সৃষ্টিশীলতা সে প্রায় কিছুই দেখায় না। সব শিশুই যে একই পরিমাণ ভাষিক প্রকাশভঙ্গির অনুকরণ করতে শেখে তাও নয়, ব্যক্তিবিশেষে এই শেখার ফারাক রয়েছে। আবার শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্যভেদে তার অনুকরণক্ষমতাও আলাদা আলাদা হয়। ফলে, শিশুর সম্পূর্ণ ভাষাশিক্ষার প্রক্রিয়াকে কখনওই শুধু অনুকরণ তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এমনকি অভিভাবকদের ভূমিকার ক্ষেত্রেও এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। সাধারণত দেখা গেছে, শিশুর বাক্‌প্রয়াসের সময় তার ছোটো ছোটো সরল বাক্যের ক্ষেত্রে হওয়া ভুলগুলো মনোযোগী অভিভাবকরা যতটা ধরিয়ে দেন, শিশুর বলা জটিল বাক্যগুলি সবসময় অত সহজে সব অভিভাবক ধরতে পারেন না, সংশোধনী প্রক্রিয়ায় তাঁদের অংশগ্রহণও এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট কম।

- দ্বিতীয়ত, শিশুর প্রাথমিক ভাষাশিক্ষা যদি শুধুই অনুকরণ এবং তার সংশোধনের শর্তের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তাহলে যে পর্যায়ে সে নিজেই নতুন নতুন বাক্য ভেবে বলতে শেখে, তার নিজস্ব কল্পনার জগতের ওপরে ভিত্তি করে বানিয়ে কথা বলে, সেই প্রক্রিয়াকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? শুধুই ঠিকমতো অনুকরণের অনুশীলন দিয়ে যতটুকু অভ্যাস গড়ে ওঠে, তাই দিয়ে কখনওই শৈশব-পরবর্তী পরিণত পর্যায়ের ভাষিক প্রকাশকে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। মানুষ তার সারাজীবনে নিজস্ব ভাষিক সৃষ্টিশীলতার প্রয়োগ ঘটিয়ে যত বাক্য বলে, তার সবটা অনুকরণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে নিশ্চিতভাবেও অসমর্থ।

- সহজাত ভাষাশিক্ষার প্রক্রিয়াতে কোথাও বাধা তৈরি হলে, মানুষের পরবর্তীকালের ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও সেই ক্ষতির ছাপ থেকে যায়। একটি ভাষাকে কার্যকরভাবে আয়ত্তে আনতে শিক্ষার্থীর এমনিতেই বেশ খানিকটা সময় লাগে। এই আয়ত্তে আনার প্রাথমিক পর্যায়টি শেষ হলে, শিক্ষার্থী নিজেই সৃষ্টিশীলভাবে ভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থী যে পর্যায় থেকে পরনির্ভর না থেকে ভাষার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে, এই সীমারেখাটিকেই 'থ্রেশহোল্ড লেভেল' বলে চিহ্নিত করা হয়। 'থ্রেশহোল্ড লেভেল'-এ এসে উপনীত হওয়ার আগে পর্যন্ত কিন্তু পরিপার্শ্বের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন হয় শিশুর ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই যে পরিপার্শ্বের ভূমিকা একইরকম সক্রিয় হবে, তা স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব নয়। অথচ, গবেষণায় দেখা গেছে, সব শিশুর ক্ষেত্রেই প্রায় এই একই সময়ে 'থ্রেশহোল্ড লেভেল' এসে উপস্থিত হয়। পরিপার্শ্বের ভূমিকার ওপরেই যদি শিশুর ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় এত বেশি নির্ভর করে থাকে, তাহলে তো বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে এই 'থ্রেশহোল্ড' সীমারেখা বিভিন্ন সময়ে আসা উচিত ছিল। এক-একজন শিক্ষার্থী তার পরিবেশ থেকে এক-একরকমভাবে ভাষাশিক্ষার উপাদান সংগ্রহ করে, ফলে তার স্বতন্ত্র সার্থক ভাষাব্যবহারের পর্যায়ে এসে পৌঁছোতেও এক-একরকম সময় প্রয়োজন হওয়ার কথা। অথচ, সব শিশুই যদি একইসঙ্গে এই সীমারেখায় এসে উপস্থিত হয়, তার অর্থ, সব ভাষাশিক্ষার্থীরই একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে ভাষিক পরিণতিপ্রাপ্তির পর্যায় এসে যায়। তার পরে তার আর কোনো বাহ্যিক সহায়তা ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হওয়া সম্ভব নয়। উপরন্তু এই ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, শিক্ষার্থী তার ভাষাপরিণতি প্রাপ্তির পর ভাষাব্যবহারে কতটা দক্ষতা বা সৃজনশীলতা দেখাতে পারবে, তার সঙ্গে তার ভাষাপরিবেশের সম্পর্ক নেহাতই আপতিক। ফলে ব্যবহারবাদী তত্ত্বের মূল সূত্র যে অনুকরণ ও সংশোধনের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, ভাষার ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রমাণ করে দেখানো যায় না।

- এমনকি, যদি শিশুর প্রাথমিক ভাষাশিক্ষার ওপরে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব আছে বলে ধরে নেওয়াও হয়, তবু, তার কোনো মাত্রার কথা ব্যবহারবাদী তত্ত্ব বলতে পারে না। সামাজিক প্রভাব ঠিক

কোন্ মাত্রায় গিয়ে পৌঁছোলে তবে তা শিক্ষার্থীর ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর পরিবর্তন আনতে সক্ষম হতে পারে, তার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ বা পরিমাপযোগ্যতার কথা ব্যবহারবাদে বলা হয়নি।

- ব্যবহারবাদী তত্ত্বে শিক্ষার্থীর ভাষাশিক্ষাকে কোনো সহজাত প্রক্রিয়া হিসেবে দেখাই হয় না। বরং যেভাবে অনুকরণ মডেলের ওপরে জোর দেওয়া হয়, তাতে মনে হতে পারে যে, শিশুর ভাষাশিক্ষা আসলে প্রবৃত্তিজাত নয়, সম্পূর্ণ অভ্যাস ও অনুশীলনজাত। কিন্তু মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর ভাষা ব্যবহারের মূল পার্থক্য এটাই যে, মানুষের ভাষা কেবলই শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন ছাড়াও মানসিক আবেগ প্রকাশের সহায়ক এবং এই বিশেষ বৌদ্ধিক পারঙ্গমতা তার সহজাত অর্জন। ভাষা অর্জনের এই সহজাত ক্ষমতা সম্পর্কে ব্যবহারবাদ একেবারেই নীরব।

- বস্তুত, মানবশিশুর ভাষা অর্জন এমনই জটিল একটি মানসিক অর্জনের প্রক্রিয়া যে, তাকে কখনওই শুধু স্টিমুলাস আর রেসপন্সের তত্ত্ব দিয়ে বোঝানো যায় না। মানুষ যদি কেবল বাহ্যিক উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার প্রয়োজনেই ভাষা ব্যবহার করে থাকে, তাহলে মনোজগতের যে আলোড়ন মানুষকে বারবার সৃজনশীল করে তুলেছে, শিল্প নিয়ে ভাবিয়েছে, সৌন্দর্যের ভাষ্য তৈরি করার মরিয়া তাগিদে মানুষ যতবার ভাষাকে তার প্রকাশভঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করেছে, সেই ভাষা ব্যবহারকে আদৌ কি চিহ্নিত করা যায়? শৈল্পিক প্রণোদনা তো মানবমনের আবেগের সঙ্গী, তাকে তো প্রচলিত অর্থে বাহ্যিক উত্তেজনা বলেও চিহ্নিত করা যায় না!

১.১.৬. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের পর্যালোচনা

নানা আলোচনা থেকে এ বিষয়টি অন্তত স্পষ্ট যে, ব্যবহারবাদীদের কাছে ভাষা শেখা ও তার বিকাশের পদ্ধতিটি আসলে আসলে একটি শর্তসাপেক্ষ বিষয়, যার শর্তগুলি অনুকরণ, অনুশীলন, আগের অনুশীলনের কথা মাথায় রেখে বারবার পুরোনো উপাদানগুলোকে ঝালিয়ে নেওয়া, একটি ভাষিক অভ্যাস গড়ে তোলা ইত্যাদির ওপরে নির্ভর করে তৈরি হয়। বোঝাই যায় যে, থর্নডাইক, গুথরি, হাল, স্কিনার—প্রায় সব ব্যবহারবাদী বিজ্ঞানীই কিন্তু শিখনের 'অ্যাসোসিয়েশনিস্টিক' বা অনুষঙ্গ-নির্ভর তত্ত্বের কথা বলেছেন, যেখানে শিক্ষার্থীর ভাষা শিক্ষা নির্ভর করে তার সামাজিক ইতিহাসের ওপরে। আপাতভাবে, এই ধারণাটির নানা ত্রুটি থাকলেও, এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, শিখন প্রক্রিয়াটি কিন্তু অনেকাংশেই বাহ্য প্রতিক্রিয়ার ওপরে নির্ভর করে। ভাষা বিষয়টাই যেখানে একপ্রকার মৌখিক আচরণের প্রকাশ, সেখানে ভাষা শেখার মধ্যে শিক্ষার্থীর চারপাশের ভাষীসম্প্রদায়ের আচরণগত প্রভাব অবশ্যই থাকবে। এখন চারপাশের প্রভাবকেই ভাষাশিক্ষার একমাত্র নিয়ামক বলে ধরে নিয়ে ব্যবহারবাদ বেশ কিছু ভ্রমাত্মক সরলীকরণের সম্মুখীন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভাষাকে একটি আচরণ হিসেবে দেখতে চাওয়ার ফলে, ব্যবহারবাদীরাই প্রথম মানুষের ভাষিক প্রয়োগকে, খুঁটিনাটি প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের আওতায় নিয়ে এলেন। ভাষাশিক্ষণের প্রক্রিয়ায় এই

পর্যবেক্ষণের ফলে যুগান্তকারী কিছু পরিবর্তন আসে এবং পরবর্তীকালে ভাষা শেখানোর সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হতে থাকে, যা আসলে ব্যবহারবাদীদেরই দান—যেমন, অডিও-লিঙ্গুয়াল টিচিং পদ্ধতি, টোটাল ফিজিকাল রেসপন্স পদ্ধতি, সাইলেন্ট ওয়ে পদ্ধতি ইত্যাদি। ভাষা অর্জনের প্রাথমিক সূত্র হিসেবে ব্যবহারবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি স্বীকৃত, তবে তার ব্যাবহারিক ভিত্তিও নেহাত অস্বীকার করা যায় না। গোটা পৃথিবীতেই, বিশেষ করে আমেরিকা ও ইউরোপে, ভাষা সংক্রান্ত পড়াশোনা আদর্শ স্তরে কেমন হওয়া উচিত, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা খুঁটিয়ে দেখা এবং সেই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চল কিন্তু প্রথম ব্যবহারবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতির মাধ্যমেই উঠে আসে।

১.২. ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক তত্ত্ব

১.২.১. জ্ঞানমূলক তত্ত্বের বিবর্তন, পরিগ্রহণ ও সীমাবদ্ধতা

ভাষা অর্জনের এই তত্ত্বটির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত হয়ে আছে, পিয়াজে-এর নাম। শিশুর জ্ঞানমূলক বিকাশ প্রসঙ্গে তাঁর বিশদ পর্যবেক্ষণজাত গবেষণা শিশু মনস্তত্ত্ব এবং ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ভাষা অর্জনের এই জ্ঞানমূলক তত্ত্বের মূল সূত্রটি হল ভাষা সবসময়েই জ্ঞাননির্ভর, কিন্তু জ্ঞান কখনোই ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়ার ওপরে নির্ভরশীল নয়। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে, কোনো বিষয় বা ধারণাকে ভাষায় প্রকাশ করতে হলে ভাষা অর্জনের যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, তা একটি বিশেষ যান্ত্রিক পদ্ধতির ওপরে নির্ভরশীল—সেটি হল জ্ঞানমূলক অর্জন থেকে ধারণা নির্মাণের প্রক্রিয়া। ক্রুটেনডেন একে ব্যাখ্যা করে বলেছেন এটি মূলত 'isomorphism between syntactical categories and psychological events and processes'।[৪] ভাষা অর্জনের এই জ্ঞানমূলক তত্ত্ব বা কগনিটিভ মডেলেরই একটি উপশ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করা যায় আরবিব এবং হিল কথিত 'স্কিমা' মডেলকে।[৫] এখানেও ভাষা অর্জনের মূল সূত্র হিসেবে জ্ঞানমূলক মডেলকেই রাখা হয়েছে, কিন্তু তার তাৎপর্য আলাদা। এখানে ভাষা কখনোই জ্ঞানমূলক বিকাশের ধারা থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট হয় না, যে স্বাভাবিক প্রবহমানতার কথা পিয়াজে বলতে চেয়েছিলেন তাঁর ব্যবহৃত 'automatically flow' শব্দবন্ধে।[৬] বরং এক্ষেত্রে শিশুর ভূমিকাটিকে অনেক বেশি সক্রিয়ভাবে দেখা হয়েছে। শিশু নিজেই তার জ্ঞানমূলক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে শোনা ভাষার সূত্র এবং নিয়মগুলি আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। আর এইখানেই কিন্তু জ্ঞানমূলক তত্ত্ব, এমনকি 'স্কিমা'-র ধারণার সঙ্গেও সহজাতবাদের পার্থক্য নিরূপিত হয়ে যায়। সহজাতবাদ অনুসারে, এটি কখনোই সম্ভবপর নয়। কারণ, শিশুর যদি ভাষা সম্পর্কে কোনো সহজাত বোধ না-ই থাকে, তাহলে সে তার শোনা ভাষা থেকে কোনো ব্যাকরণ বা ভাষিক নিয়মই অর্জন করতে পারবে না। এই সীমাবদ্ধতার পরিসর থেকেই সহজাতবাদের উদ্ভব ও প্রসার।

১.৩. ভাষা শিক্ষা ও ভাষা অর্জনের সহজাতবাদ তত্ত্ব

১.৩.১. সহজাতবাদ তত্ত্বের পরিসর

প্রথম ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্বের অবতারণা হয় সহজাতবাদের হাত ধরে। এখন ভাষা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সহজাত বোধের ভূমিকা ঠিক কতটা, তা নিয়ে দার্শনিক বিতর্কের ইতিহাস দীর্ঘ। যদিও, বিশ শতকের পূর্বে ভাষাগত জ্ঞান কীভাবে অর্জন করা হয় এবং সেই অর্জন প্রক্রিয়ায় সহজাত ভাষাদক্ষতা বা পারঙ্গমতা কোনো বিশেষ সহায়তা প্রদান করতে পারে কিনা, এ নিয়ে ভাষাতত্ত্বের দুনিয়ায় আলোচনা হয়নি। যেহেতু এই সহজাত ক্ষমতার বিচার প্রথম ভাষা ভাষা অর্জনের সাপেক্ষেই উঠে আসতে পারে, তাই প্রথম ভাষা অর্জনের সূত্রেই এই তত্ত্বটির আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে। দ্বিতীয় ভাষা বা তৃতীয় ভাষা অর্জনের নিরিখে এই সহজাত ক্ষমতার প্রসঙ্গ অল্পবিস্তর উঠে এলেও, ভাষাশিক্ষা আর ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়াগত পার্থক্যের কারণেই সহজাতবাদকে মূলত প্রথম ভাষা অর্জনের আলোচনাতেই আমরা সীমাবদ্ধ রাখব।

১.৩.২. সহজাতবাদ তত্ত্বের ভিত্তি ও ব্যাখ্যা

১৯৫৭ সালে নোয়াম চমস্কি প্রথম ভাষা অর্জনের এই সহজাতবাদ তত্ত্বটির কথা বলেন, মূলত ব্যবহারবাদী তত্ত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে। তাঁর এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি ছিল একেবারে প্রাথমিক স্তরে, ভাষা গঠনের গোড়ার পর্যায়গুলিতে শিশুরা যে অর্ধগঠিত বা অগঠিত বাক্‌প্রয়াসজনিত ভাষা ব্যবহার করে, সেই সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ। এই তত্ত্ব অনুসারে, মানবশিশু মাত্রেই ভাষা শেখার সহজাত ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় এবং ভাষার অন্তর্নিহিত ব্যাকরণ অনুধাবন সে করতে পারে আদতে তার সহজাত অর্জন ওই ব্যাকরণ দিয়েই, যাকে চমস্কি বললেন 'inborn grammar'। বললেন, সব মিলিয়ে, মানুষের অর্জিত জ্ঞানপরম্পরার মধ্যে ভাষার কাঠামোটিও পূর্বনির্দিষ্ট। পৃথিবীর যে-কোনো ভাষাতেই উপস্থিত বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, স্বর বা ব্যঞ্জন শিশুরা যেভাবে শেখে, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েও এই তত্ত্বটিকেই প্রতিপন্ন করা যায়, কারণ শিশুরা জন্মগতভাবেই ভাষা শেখার জন্য 'প্রি-প্রোগ্রামড' বা 'জেনেটিকালি প্রোগ্রামড'। যাকে তিনি নাম দিচ্ছেন, 'ইনেট হিউম্যান ফ্যাকাল্টি অফ ল্যাংগুয়েজ'। তাঁর প্রাথমিক (১৯৬৫) মত ছিল, শিশুর মস্তিষ্কেই রয়েছে 'ল্যাংগুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস' (LAD)। অর্থাৎ, পূর্ব থেকেই সে মানবভাষার কয়েকটি সার্বিক সাধারণ লক্ষণ (লিঙ্গুইস্টিক ইউনিভার্সালস) সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সুতরাং ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে তার পূর্বপ্রোথিত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে একটি সার্বভাষিক ব্যাকরণ (Universal Grammar)। পরে সে যখন যে বিশেষ ভাষা শেখে, তখন সেই ভাষার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম (Language Specific Rules), যা ভাষাবিশেষে পৃথক, এবং শব্দ, শব্দখণ্ড ইত্যাদি কিছু ভাষিক উপাদান শেখাই হয়ে ওঠে শিশুর ভাষাশিক্ষার মূল ভিত্তি। কিন্তু, স্কিনার, ব্লুমফিল্ড প্রমুখ ব্যবহারবাদীদের মতে, ভাষাশিক্ষা ও কথা বলা উভয়ই আসলে স্টিমুলাস-রেসপন্সের ফল। অর্থৎ, শিশুর ভাষাশিক্ষা হয় আসলে সে যা শোনে,

তারই অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে। কিন্তু চমস্কি তাঁর তত্ত্বে এই অনুকরণবাদকে সর্বতোভাবে খারিজ করলেন। তাঁর যুক্তি, নকলনবিশিই যদি শিশুর ভাষাশিক্ষার একমাত্র প্রক্রিয়া হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে জন্মাবধি কখনও না শোনা লক্ষাধিক বাক্যাবলির অর্থ উদ্ধার কোনোদিনই কোনো মানুষের পক্ষে করে ওঠা সম্ভব হত না, এমনকি, সে নিজে নিজে নতুনতর বাক্যপ্রয়োগেও সক্ষম হতে পারত না।

১.৩.৩. সহজাতবাদ তত্ত্বের প্রেক্ষাপট

মানুষের জীবনে এবং জ্ঞান অর্জনের পরিসরে ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়াটি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেই পর্যবেক্ষণ বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই উঠে এসেছে একাধিক তাত্ত্বিকের আলোচনায়। ভাষার অন্বয়গত এবং শব্দার্থতাত্ত্বিক বিন্যাসের সামান্য বদলও যে ভাষিক প্রকাশের কতদূর পরিবর্তনে সক্ষম, তা নিয়ে কথা হলেও, মানুষের ঠিক কোন্ ক্ষমতার ফলে মানুষ যে কোনো প্রাকৃতিক ভাষা শিখতে পারে এবং তার অর্থপূর্ণ প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়, তা নিয়ে তখনও পর্যন্ত খুব বেশি আলোকপাত হয়নি। এমনকি বিশ শতকের আগে দার্শনিকরা যখনই ভাষা নামক এই জটিল চিহ্নসমন্বয়ের অর্জন নিয়ে কোনো কথা বলছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগ আলোচনাই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছিল মানুষ কীভাবে যুক্তিপরম্পরা আয়ত্ত করে, তা নিয়ে। জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর থেকে মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়ার বিশেষত্ব যে এই যুক্তির প্রয়োগেই, এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি চিহ্নিত করলেও ভাষার অন্তর্নিহিত যুক্তিক্রমটি মানুষ কীভাবে অর্জন করে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট করে আলোচনা ছিল না।

এই প্রসঙ্গে পূর্বসূরী হিসেবে দেকার্তের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। দেকার্ত তাঁর আলোচনাতে[৭] বলছেন, ‘যন্ত্র’ এবং ‘পশু’দের থেকে মানুষকে যে দুটি বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণত আলাদা করে দেয়, তার মধ্যে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ভাষা। তাঁর যুক্তি, পৃথিবীর মূর্খতম মানুষটিও ভাষা বলতে সক্ষম, কিন্তু মানুষ ব্যতিরেকে অন্য কোনো অতি বুদ্ধিমান প্রাণীর পক্ষেও ভাষা অর্জন কিংবা অনুধাবন করা সম্ভবই নয়। তার কারণ, মানুষের রয়েছে ‘rational soul’ কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর ‘have no intelligence at all’। অতীতের অন্যান্য দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিকদের মতোই, দেকার্তও মানুষের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান এবং ধারণা অর্জনের প্রক্রিয়াটিকেই সবচেয়ে বড়ো মনস্তাত্ত্বিক রহস্য হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন, তাঁর কাছে সেই তুলনায় ভাষা অর্জন তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পেয়েছে—‘it patently requires very little reason to be able to speak’।[৮]

কিন্তু এই পর্যবেক্ষণের ধারাটি বদলে গেল বিশ শতকের একেবারে গোড়া থেকেই। ভাষাতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং দার্শনিকরা ভাষা শেখা এবং ভাষিক প্রয়োগক্ষমতাকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করার প্রক্রিয়াটির দিকে জোর দিলেন অনেক বেশি। ভাষাতত্ত্বের জগতে অন্বয়তত্ত্ব এবং শব্দার্থতত্ত্বের গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ এই ধারণাটিও পোক্ত হতে শুরু করল যে, ভাষা শুধু কয়েকটি শব্দকে ধারণার সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়াতেই শেষ হয়ে যায় না। ভাবনাকে ভাষায় যথাযথভাবে প্রকাশ করতে হলে পৃথক পৃথক অর্থবাহী

বিচ্ছিন্ন শব্দই শুধু নয়, এক-একটি বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা জরুরি।

সেক্ষেত্রে ভাষা শিক্ষার পদ্ধতিটি নেহাত সাধারণ কোনো দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়ামাত্র হিসেবে আর বিবেচনা করা চলে না। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বে বারবার এই দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে যে, মানুষের ভাষাব্যবহার একটি জটিল প্রক্রিয়া। আন্বয়িক নিয়মগুলির সূত্রে বাঁধা থাকে এক-একটি বাক্য, বাক্যের ভেতরের অর্থ প্রযুক্ত হয় শব্দার্থতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে এবং শব্দগুচ্ছ দিয়ে নির্মিত বাক্যাংশগুলির গঠনপ্রক্রিয়াও সেই কারণেই যথেষ্ট জটিল। অথচ ভাষাব্যবহারকারীরা প্রতিদিন হাজার হাজার বাক্য বলেন, যার ভাষিক প্রয়োগ যথাযথ এবং অর্থপূর্ণ। আর এই প্রয়োগক্ষমতাও আপাতভাবে অনায়াস এবং অজান্তেই তাঁরা এই জটিল চিহ্নের সিস্টেমটিকে এত সহজে বহন করে চলেছেন। কিন্তু ভাষা জানতে হলে এবং বলতে হলে যদি এতগুলি অন্তর্নিহিত নিয়ম ও সূত্র জেনে বুঝে অগ্রসর হতে হয়, সেক্ষেত্রে ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়াটিকে অন্য যে-কোনো জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সবিশেষ স্থান দিতেই হয়। ঠিক এই নিরিখেই উঠে এল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি—ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়া এত জটিল হলে, একেবারে শিশুরাও কীভাবে ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণগত সূত্রগুলিকে প্রায় নিখুঁত প্রায়োগিক দক্ষতায় তুলে আনতে সক্ষম হয়? উপরন্তু এই সক্ষমতা তারা অর্জন করছে তাদের চারপাশের সামাজিক পরিসরে ভাষার প্রকাশিত কাঠামো থেকেই।

১.৩.৪. সহজাতবাদ তত্ত্বের মূল সূত্র

এই মূলগত প্রশ্নটির উত্তর হিসেবেই ভাষাতত্ত্বের পরিসরে সহজাতবাদের উৎপত্তি। এই প্রশ্নটিকেই যথাযথ আকারে পেশ করেছেন ফিয়োনা কাউয়ি তাঁর ‘Innateness and Language’ প্রবন্ধে— ‘How could mere children learn the myriad intricate rules that govern linguistic expression and comprehension in their language—and learn them solely from exposure to the language spoken around them?’[৯] এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অবশ্যই উঠে এল মস্তিষ্কের প্রসঙ্গ। ভাষাবিজ্ঞানীরা অনুধাবন করলেন, নিশ্চয় মানবমস্তিষ্কের বিশেষ কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণেই কমবেশি আট বছর বয়সের মধ্যেই শিশুদের ভাষা অর্জনের প্রাথমিক কাঠামোটি অর্জিত হতে পারে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটিকেই পরবর্তীকালে নোয়াম চমস্কি ব্যাখ্যা করলেন, মানবমস্তিষ্কের ভেতরে থাকা ‘language organ’ হিসেবে; বললেন মানুষের মস্তিষ্কে সহজাত (‘innate’) একটি ‘মডিউল’ বা ‘ফ্যাকাল্টি’ রয়েছে, যা ভাষা অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণত সহায়ক।

চমস্কির মতে, এই ‘ল্যাংগুয়েজ ফ্যাকাল্টি’র মধ্যেই জন্মগতভাবে নিহিত থাকে ভাষাব্যবহারের উপযোগী বিবিধ নিয়ম, সূত্র ও বিধি সংক্রান্ত জ্ঞান। আর এই সহজাত জ্ঞানই আসলে ভাষা এলাকার (language

faculty) প্রারম্ভিক পর্যায় বা রূপ বলা যেতে পারে। শৈশবে চারপাশের ভাষাপরিবেশের সঙ্গে শিশুর যে প্রাথমিক পরিচয়, বা ভাষা সংক্রান্ত বাহ্যিক অভিজ্ঞতা—তাকে চমস্কি নাম দিলেন 'প্রাইমারি লিঙ্গুইস্টিক ডেটা' বা সংক্ষেপে 'pld', একে আমরা বাংলায় 'প্রাথমিক ভাষা তথ্য'-ও বলতে পারি। এই বিশেষ ভাষা সংক্রান্ত জ্ঞান বা তথ্যের আহরণের কথা বলে চমস্কি কিন্তু নিজেই ভাষা সংক্রান্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি তথ্যমূলক জ্ঞানভাণ্ডারের ধারণা নিয়ে এলেন। আর এই বিশেষ জ্ঞানভাণ্ডার কিন্তু ভাষাভেদে আলাদা আলাদা। ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে একটি ইংরেজিভাষী শিশুর প্রাথমিক ভাষা তথ্য বা 'pld' যা হবে, একটি বাংলাভাষী শিশুর 'pld' অবশ্যই তার চেয়ে আলাদা। কারণ উভয়ের ভাষাপরিবেশ আলাদা, তাই দুটি ক্ষেত্রেই তারা নিজস্ব ভাষাপরিবেশ থেকে ভাষা সংক্রান্ত যে তথ্য ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে, তা পরস্পরের চেয়ে পৃথক। সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশ এইভাবে অর্জিত ভাষাসক্ষমতা চূড়ান্ত রূপের প্রকাশকেই চমস্কি বলবেন, 'linguistic competence' বা ভাষা পারঙ্গমতা। এর মধ্যেই নিহিত থাকে কোনো একজন ভাষীর নিজস্ব ভাষা ও তার ব্যাকরণ সম্পর্কে জ্ঞান। চমস্কির মতে, ভাষা বলা এবং ভাষা বোঝার জন্য, এই জ্ঞানটিই প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিয়ে থাকে। যদিও, শুধু এই জ্ঞানের পুঁজিই ভাষাবোধের ক্ষেত্রে একমাত্র সহায়ক নয়, বৃহত্তর ক্ষেত্রে আরও কিছু বাড়তি বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজনও পড়ে। ফলিত বা ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ভাষা প্রয়োগের জন্য সেই জ্ঞানের প্রয়োগকেই চমস্কি নাম দিলেন 'linguistic performance' বা ভাষা সম্পাদন।

১.৪. তত্ত্বগুলির পারস্পরিক তুলনা ও তাৎপর্য

ওপরে আলোচিত তত্ত্বগুলির মধ্যে ব্যবহারবাদী তত্ত্ব এবং জ্ঞানমূলক তত্ত্ব মূলত প্রথম ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু এই তত্ত্ব দুটির মাধ্যমে কখনোই দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা কিংবা তৃতীয় ভাষা শিক্ষার পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু, সহজাতবাদ তত্ত্ব যেমন প্রথম ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল, তেমনই আবার পরবর্তী স্তরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা শিক্ষা, যেগুলিকে স্বাভাবিকভাবে মানুষ অর্জন করে না, বরং ব্যাকরণ ও ভাষার নিয়মাবলির মাধ্যমে আয়ত্ত করে—সেই ক্ষেত্রেও সহজাতবাদ তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায়। কারণ, এই তত্ত্বের মূলটি দাঁড়িয়ে আছে, পারঙ্গমতাবোধের ধারণার ওপরে, এই পারঙ্গমতার মাধ্যমেই মানুষ ভাষার অন্তর্নিহিত ব্যাকরণটিকে অনুধাবন করতে পারে এবং ব্যাখ্যা করতেও সক্ষম হয়। যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণ ক্ষেত্রবিশেষে ধারণানির্ভর বা বিমূর্ত হতে পারে, কিন্তু ভাষার অধিগঠনের (surface structure) স্তরে ভাষার যে ব্যাবহারিক রূপকে আমরা দেখতে পাই, তার নিরিখে বলা যেতে পারে, ভাষিক ব্যাকরণের একটি মূর্ত ও প্রকাশিত রূপ হল অধিগঠনের বাক্ব্যবহার। প্রতিটি পরিণত মানুষের মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট ভাষা এলাকা বা ল্যাংগুয়েজ ফ্যাকাল্টি থাকলেও তা শুধু ভাষা অর্জনের ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। এখন ভাষা বলতে হলে বা এই ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হলে কিন্তু পারিপার্শ্বিক ভাষা পরিবেশ থেকে অধিগঠনের ভাষার নমুনা শোনার অভিজ্ঞতা থাকতেই হয়। ভাষা না শুনলে ভাষা এলাকা ভাষীর মস্তিষ্কে ভাষার ব্যাকরণ সংক্রান্ত কোনো বোধকে সক্রিয় করে তুলতে পারে না। আর ভাষার ব্যাকরণ সংক্রান্ত এই বোধ ক্রিয়াশীল হয় দুইভাবে, বিশেষ ভাষার বিশেষ ব্যাকরণের

মাধ্যমে এবং বিশ্বজনীন ব্যাকরণের (universal grammar) সূত্র ধরিয়ে দিয়ে। আর এই বৈশ্বিক ভাষা ব্যাকরণের নিয়মটি আয়ত্ত করতে পারার মধ্যেই রয়েছে পরবর্তীকালে যে-কোনো ভাষী কর্তৃক অন্য ভাষা (দ্বিতীয় ভাষা বা তৃতীয় ভাষা বা আরও বেশি সংখ্যক ভাষা) শিখতে পারার ক্ষমতা। যে ভাষী এই বিশ্বজনীন ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি যত ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন, তাঁর পক্ষে অন্য ভাষার সূত্র শিখতে পারা তত সহজ হয়।

তবে, ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত এই তত্ত্বগুলিকে একে অন্যের থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। একমাত্র মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা ব্যতিরেকে অন্য ভাষা শেখার সময় প্রথম দুটি তত্ত্বকে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

সূত্রনির্দেশ

---

[১] Cooter, Robert B. & Reutzel, D. Ray. *Teaching Children to Read: The Teacher Makes the Difference.* Eighth Edition. New York. Pearson. 2019. p. 36

[২] Rivers, Wilga M.*The Psychologist and the Foreign Language Teacher.* Eighth Edition Reprint. USA. University of Chicago Press. 1964. p. 73

[৩] Hubbard, Peter & Jones, Hywel & Wheeler, Rod & Thornton, Barbara. *A Training Course for Tefl.* First Edition. New York. Oxford University Press. 1983. p. 326

[৪] Cruttenden, Alan. *Language in Infancy & Childhood.* First Edition. Manchester. Manchester University University Press. 1979. p. 86

[৫] Arbib, M & Conklin, E & Hill, J. *From Schema Theory to Language.* First Edition. New York. Oxford University Press. 1987. p. 27

[৬] Meichenbaum, Donald & Goodman, Sheryl. 'Clinical Use of Private Speech and Critical Questions About Its Study in Natural Settings'*The Development of Self-Regulation Through Private Speech.* First Edition. New York. John Wiley & Sons. 1979, p. 349

[৭] Descartes, Rene´. Translated by Veitch, John. *Discourse on the Method of Rightly Conducting the Reason, and Seeking Truth in the Sciences.* First Edition, Chicago. The Open Court Publishing Company. 1903. p. 61

[৮] Descartes, Rene´. Translated by Veitch, John. *Discourse on the Method of Rightly Conducting the Reason, and Seeking Truth in the Sciences.* First Edition. Chicago. The Open Court Publishing Company. 1903. p. 142

[৯] Cowie, Fiona. 'Innateness & Language'. *The Stanford Encyclopaedia of Philosophy.* Fall 2017 Edition. p. 3

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষা অর্জনের শারীরবৃত্তীয় প্রকৌশল: ভাষা, স্নায়ু, মস্তিষ্ক

ভাষা অর্জনের শারীরবৃত্তীয় প্রকৌশল: ভাষা, স্নায়ু, মস্তিষ্ক

মানুষের বাক্‌ব্যবহার এবং ভাষাগত অর্জন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মানুষের মস্তিষ্কের গঠন, কার্যপ্রণালী ও স্নায়বিক সক্রিয়তা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। কারণ, ভাষা আর ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা, এ দুইই নির্ভর করে নির্দিষ্ট কিছু স্নায়বিক কার্যকলাপের উপর। ফলে, একজন ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়ার নিরীক্ষকই হোন, কিংবা একজন স্পিচ-ল্যাংগুয়েজ প্যাথোলজিস্টই হোন, তিনি যদি মানুষের ভাষিক সংযোগ সংক্রান্ত কৌশল বুঝতে চান, তাহলে ভাষিক সংযোগ পদ্ধতির যে মানুষী প্রয়োগ (human communication) তা মানুষের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু সংস্থানের মাধ্যমে কীভাবে নির্মিত হয়, তা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ জরুরি।

২.১. স্নায়ুতন্ত্র

মানবদেহের একটি অত্যন্ত জটিল অংশ স্নায়ুতন্ত্র। এই স্নায়ুতন্ত্রই মানবদেহে সংঘটিত যাবতীয় কিছুর প্রধান নিয়ন্তা এবং নিয়ামক। স্নায়ুতন্ত্র মূলত কাজ করে তিনটি ধাপে। প্রথমে ব্যক্তিমানুষের আভ্যন্তর কিংবা বহির্পরিবেশ থেকে স্টিমুলি বা সংবেদনা গ্রহণ করা, দ্বিতীয় ধাপে সেই সংবেদনাটির সমন্বয় সাধন এবং তার অনুধাবন, আর তৃতীয় ধাপ হল সেই উত্তেজনাটিতে সাড়া দেওয়ার জন্য শরীর নামক যন্ত্রটির মধ্যে যথার্থ রেসপন্স তৈরি। এই তিনটে ধাপকে যদি ভাষাব্যবহারের নিরিখে ভেঙে দেখি, তাহলে কী পাওয়া যেতে পারে? প্রথম ধাপে দেখব, বক্তা যা বলছেন, বায়ুবাহিত শব্দতরঙ্গ তাকে পৌঁছে দিচ্ছে শ্রোতার কানের অভ্যন্তরে থাকা রিসেপ্টরে, অডিটরি স্নায়ুপথে সেই উত্তেজনা পরিবাহিত হচ্ছে সেরিব্রাল কর্টেক্সে, যেখানে তা গৃহীত হওয়ার পর সেই উত্তেজনার মর্ম অনুধাবন করবে মস্তিষ্ক। সেইসঙ্গে এ সংক্রান্ত অন্যান্য সেনসরি তথ্য একত্রিত হয়ে মস্তিষ্কের ভাষা এলাকায় এই ভাষিক ইনপুটটির একটি রেসপন্স তৈরি হবে এবং ব্রেনের মোটর এলাকায় বাহিত হবে, যাতে তা সাধিত হতে পারে। এই ইমপালস এবার মোটর এলাকা থেকে বাহিত হবে পূর্বোক্ত শ্রোতার ভাষাব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত পেশিগুলিতে, তৈরি করবে ধ্বনিময় প্রতিক্রিয়া বা ভাষিক প্রতিক্রিয়া। পূর্বোক্ত শ্রোতা এবার বক্তা হয়ে উঠবেন। পুরো প্রক্রিয়াটি চক্রাকারে আবার পরিচালিত হতে থাকবে। যে-কোনো মানুষী ভাষাসংযোগের এই-ই হল প্রক্রিয়া। তবে, বলাই বাহুল্য, ভাষিক উত্তেজনার মূলে যে কেবল ভাষাই থাকবে, এমনটা নাই হতে পারে, মূলে থাকতে পারে ভাষা ব্যতিরেকে অন্য কোনো ধ্বনিজাত দৃশ্যগত উত্তেজনা, গন্ধের উত্তেজনা, স্বাদের উত্তেজনা, শারীরিক উত্তেজনা কিংবা স্পর্শগত উত্তেজনা।

এই সংবেদন বা উত্তেজনা যাইই হোক না কেন, ভাষার উৎপত্তির মূলে রয়েছে পেশির সংকোচন ও প্রসারণ। এর মধ্যে পড়ে ঠোঁট, চোয়াল, জিভ, তালু, মূর্ধা, ল্যারিংস, ফ্যারিংস প্রভৃতি অঙ্গের পেশি এবং অবশ্যই শ্বাসপেশি। এই যাবতীয় পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে স্নায়বিক ইমপালস, যা মস্তিষ্কের মোটর এলাকা থেকে স্নায়ুমূল এবং সুষুম্নাকাণ্ড বেয়ে নেমে এসে হাজার হাজার স্নায়ুর মাধ্যমে পেশিগুলিতে রেসপন্স

বয়ে আনে। এই স্নায়ুগুলির প্রত্যেকটিই কোনো-না-কোনোভাবে হয় মস্তিষ্কের ক্রেনিয়াল স্নায়ু অথব স্পাইনাল কর্ডজাত স্পাইনাল স্নায়ুর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ফলে, মানুষের ভাষাব্যবহার সম্পূর্ণভাবে মস্তিষ্ক, বিশেষত সেরিব্রাল কর্টেক্সের এইসব ক্রিয়াপদ্ধতির উপরেই নির্ভরশীল।

আলোচনার সুবিধার্থে, গোটা স্নায়ুতন্ত্রকে দুটো বড়ো ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে— কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে পড়ছে মস্তিষ্ক আর স্পাইনাল কর্ড, প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে থাকছে স্নায়ুপ্রান্তের সঙ্গে সংলগ্ন প্রান্তীয় অঙ্গ, স্নায়ু এবং গ্যাংলিয়া। এই প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে শরীরের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করে।এই প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের মূল উপাদান কিন্তু মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের প্রান্ত থেকে উৎপন্ন স্নায়ুসমূহ। এর মধ্যে পড়ছে ১২ জোড়া ক্রেনিয়াল স্নায়ু এবং ৩১ জোড়া স্পাইনাল বা সুষুম্না স্নায়ু। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবার দু-ভাগে ভাগ করা হয়: সোমাটিক এবং অটোনমিক। সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুগুলি নিয়ন্ত্রণ করে কঙ্কালপেশিকে (এই পেশিগুলিই বাক্ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাজে লাগে), অন্যদিকে অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্গত স্নায়ুগুলি নিয়ন্ত্রণ করে অনৈচ্ছিক পেশিকে, যেমন হৃৎপেশি, পরিপাক নালীর মসৃণ পেশিসমূহ কিংবা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অটোনমাস স্নায়ুতন্ত্রকে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, আসলে তা কেন্দ্রীয় এবং প্রান্তীয় দুই স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত। নীচে, একটি ছকের মাধ্যমে এই বিভাজনটি তুলে ধরা হল।

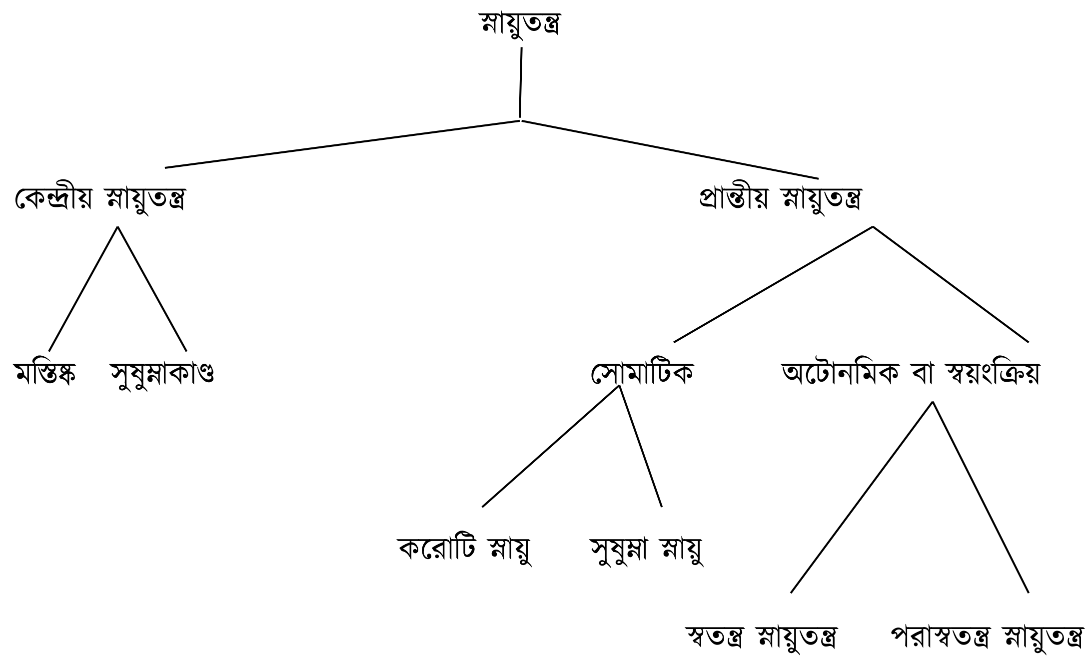

তবে, একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্নায়ুতন্ত্রের এই বিভাজন কৃত্রিম এবং সরলীকৃত। কার্যকালে স্নায়ুতন্ত্র কিন্তু এরকম ভাগে ভাগে মোটেই কাজ করে না, সামগ্রিকভাবেই কাজ করে।

২.১.১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্র তৈরি হয় লক্ষ লক্ষ স্নায়ুকোশ দিয়ে, যেগুলিকে একসঙ্গে ধরে রাখে কিছু বিশেষ নন-কনডাকটিং কোশ, যাকে বলে নিউরোগ্লিয়া। এরকম কয়েকটি নিউরোগ্লিয়া হল অ্যাস্ট্রোসাইট, অলিগোডেনড্রোসাইট, মাইক্রোগ্লিয়া ইত্যাদি। স্নায়ুর সংবেদনকে শরীরের এক অংশ থেকে অন্য অংশে নিয়ে যায় নিউরোন। যেমন, ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখি, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে সংবেদনা পরিবাহিত হয় ভাষা উচ্চারক পেশিগুলিতে, যার ফলে ঠোঁট, জিভ ইত্যাদি নড়াচড়া করতে পারে। যদিও নিউরোনের নানারকম প্রকারভেদ হয়ে থাকে, তবু, মোটের উপর প্রতিটি নিউরোন তিনটি সাধারণ ভাগে বিভক্ত: ১. একটি কোশদেহ (একে সোমা বা পেরিক্যারিয়নও বলা হয়), যেখানে স্নায়ুকোশের নিউক্লিয়াসটি অবস্থান করে, ২. কিছু অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রবর্ধক (সাধারণত লম্বায় কয়েক মিলিমিটারের বেশি হয় না), যাকে ডেনড্রাইট (এই শব্দটির বাংলা মানে করলে দাঁড়ায় ‘গাছের মতো’) বলে, ৩. একটি দীর্ঘায়িত অংশ, যাকে অ্যাক্সন বলে। বেশিরভাগ নিউরোনেই এই অ্যাক্সন স্নেহপদার্থ দিয়ে ঘেরা একটি আবরণী দিয়ে মোড়া থাকে। আবরণীটি কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নয়, বেশ কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। এই আবরণীকে বলা হয় মায়েলিন সিদ বা মায়েলিন আবরণী।

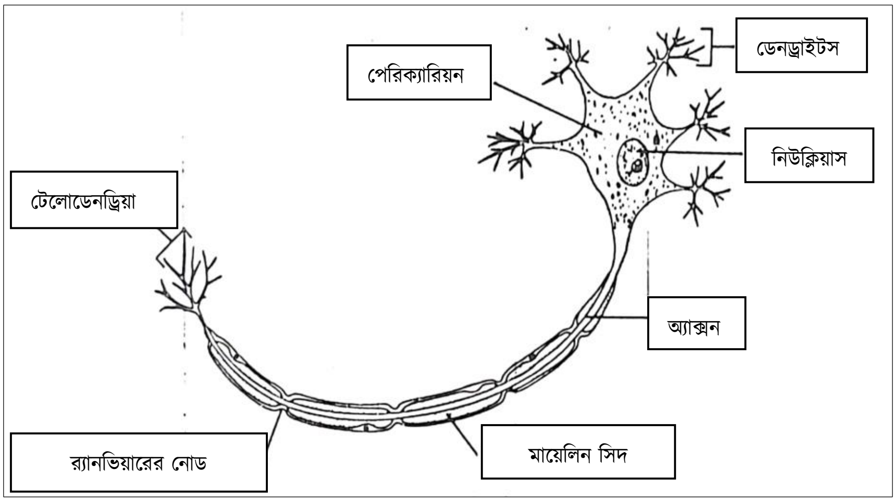

চিত্র ২. ১: মোটর নিউরোন

নিউরোনের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অন্যান্য সাধারণ কোশগুলিতে উপস্থিত কিছু কোশীয় অঙ্গাণুর (যেমন মাইটোকন্ড্রিয়া) দেখা মিললেও সেন্ট্রোজোম দেখতে পাওয়া যায় না। পরিণত নিউরোন কোশ যে বিভাজিত বা প্রতিস্থাপিত হতে পারে না, তার একমাত্র কারণ হল এই সেন্ট্রোজোমের অনুপস্থিতি। এ ছাড়া, একমাত্র নিউরোন সাইটোপ্লাজমেই বিশেষভাবে উপস্থিত থাকে দুটি অঙ্গাণু—নিজল পদার্থ (ক্রোমিডিয়াল সাবস্ট্যান্স) এবং নিউরোফাইব্রিল। লাইট মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যায়, স্নায়ুর কোশদেহে সাইটোপ্লাজম জুড়ে

এই নিজল পদার্থটি বড়ো বড়ো দানার আকারে ছড়িয়ে আছে। নিজল দানার কাজ হল প্রোটিন সংশ্লেষ করা। নিউরোনের কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এবং স্নায়ুর সংবেদনকে এক নিউরোন থেকে অন্য নিউরোনে বয়ে নিয়ে যাওয়ার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই প্রোটিনের প্রয়োজন পড়ে। অন্যদিকে, লাইট মাইক্রোস্কোপে ক্ষুদ্র নালিকাকার নিউরোফাইব্রিলগুলিকে কোশদেহ, অ্যাক্সন এবং ডেনড্রাইট জুড়ে প্রলম্বিত হয়ে থাকতে দেখা যায়। যদিও নিউরোফাইব্রিলের ভূমিকা ঠিক কী, তা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না, তবু, বিজ্ঞানীরা আন্দাজ করেন[১], সম্ভবত একটি নিউরোনের মধ্যে আন্তঃকোশীয় পদার্থের সংবহন প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত হয় নিউরোফাইব্রিলের মাধ্যমে। অ্যালঝাইমার্স রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই নিরোফাইব্রিলগুলি অস্বাভাবিকভাবে মোচড় খেয়ে গেছে। বলা যেতে পারে, এটিই এই রোগের অন্যতম শনাক্তকরণ চিহ্ন।

দুটি নিউরোনের সংযোগকে বলা হয় সাইন্যাপস বা প্রান্তসন্নিকর্ষ। এর গোড়ায় থাকে প্রি-সাইন্যাপটিক নিউরোনটির অ্যাক্সনপ্রান্ত এবং শেষে থাকে পোস্ট-সাইন্যাপটিক নিউরোনটির ডেনড্রাইট, কোশদেহ কিংবা অ্যাক্সন। তবে লক্ষণীয় যে, সাইন্যাপসীয় সংযোগ বস্তুত দুটি নিউরোনের মধ্যে শুধুমাত্র উদ্দীপনা পরিবহনের সংযোগ। শারীরবৃত্তীয়ভাবে এই সংযোগকে কিন্তু চিহ্নিত করা যায় না। সাইন্যাপসই আসলে স্নায়ুসংবেদনাকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সাইন্যাপসে এসেই স্নায়ুসংবেদন অবরুদ্ধ, কিংবা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একটি নিউরোনের উপরিতলে এরকম হাজার হাজার সাইন্যাপস উপস্থিত থাকতে পারে। এখন সেই হিসেবে লক্ষ লক্ষ নিউরোনের কথা ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, স্নায়ুতন্ত্র আসলে কতটা জটিল এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।

গঠনগতভাবে সাইন্যাপসের কেমন সেই বিবরণও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। একটি নিউরোনের অ্যাক্সনপ্রান্ত যেখানে অন্য নিউরোনের কাছাকাছি আসে, অ্যাক্সনের ঠিক সেই জায়গাটা প্রস্থে অনেক কমে আসে বলে মায়েলিন আবরণীও পাতলা হয়ে যায়। এইখানে এসে অ্যাক্সনপ্রান্ত শাখাপ্রশাখায় বিভাজিত হয়ে পড়ে, একে বলে টেলোডেনড্রিয়া। প্রতিটি টেলোডেনড্রনের শেষে একটা করে ছোট্ট ফোলা অংশ থাকে, যাকে বুটন টার্মিনাল বা সাইন্যাপটিক নব বলে। একমাত্র ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপেই এই বুটন টার্মিনাল পরিষ্কার নজরে আসে। এর মধ্যে থাকে বেশ কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া আর সাইন্যাপটিক ভেসিকল। এই সাইন্যাপটিক ভেসিকল তৈরি হয় নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থ দিয়ে। স্নায়ুসংবেদন যখন বুটন টার্মিনালে এসে উপস্থিত হয়, তখন এই নিউরোট্রান্সমিটারই নির্গত হয়। নিউরোট্রান্সমিটার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কিছু নিউরোট্রান্সমিটার পোস্ট-সাইন্যাপটিক নিউরোনে স্নায়ুসংবেদ পরিবহনে সহায়তা করে, তাকে বলে এক্সাইটেটরি ট্রান্সমিটার। উলটোভাবে, কিছু নিউরোট্রান্সমিটার স্নায়ুসংবেদ পরিবহনে বাধা সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় ইনহিবিটরি ট্রান্সমিটার। অ্যাসিটাইলকোলিন, নোরেপিনেফ্রিন (নোর‍্যাড্রিনালিন), সেরোটোনিন, ডোপামিন, গামা অ্যামাইনোবিউট্রিক অ্যাসিড (GABA) এমনই কয়েকটি সাধারণ নিউরোট্রান্সমিটার।

সাইন্যাপটিক নব থেকে নিঃসৃত হওয়ার পর নিউরোট্রান্সমিটার ছড়িয়ে পড়ে বুটন এবং পোস্ট-সাইন্যাপটিক নিউরোনের আবরক পর্দার মধ্যে থাকা একটি ফাঁকের মধ্যে, একে বলে সাইন্যাপটিক ক্লেফট। যেহেতু নিউরোট্রান্সমিটার একমাত্র প্রি-সাইন্যাপটিক অংশেই উপস্থিত থাকতে পারে, ফলে সাইন্যাপসীয়

পরিবহনও সর্বদাই একমুখী। রাসায়নিক সাইন্যাপসের মতো আর-এক ধরনের সাইন্যাপসের দেখা মেলে স্নায়ুতন্ত্রে, যাকে বলে ইলেকট্রিক সাইন্যাপস। এ ধরনের সাইন্যাপসের ক্ষেত্রে প্রি-সাইন্যাপটিক ও পোস্ট-সাইন্যাপটিক নিউরোনগুলি পরস্পরের খুব কাছাকাছি অবস্থান করার ফলে তাদের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের পথ তৈরি হয়। এই প্রবাহ সর্বদাই প্রি-সাইন্যাপটিক নিউরোন থেকে বাহিত হয়ে পোস্ট-সাইন্যাপটিক নিউরোনকে উদ্দীপিত করে। অ্যাক্সনপ্রান্ত এবং কারক (এফেক্টর) কোশ, এ দুয়ের পরস্পরের মধ্যে কাজের সংযোগ রক্ষা করে নিউরোএফেক্টর জাংশন। গঠনগতভাবে, নিউরোএফেক্টর জাংশনও সাইন্যাপসের মতোই। তফাত শুধু একটাই, সাইন্যাপসের মতো এর পোস্ট-সাইন্যাপটিক অংশে কোনো স্নায়ুকোশ থাকে না, তার বদলে থাকে পেশি বা গ্রন্থি। আমরা নিউরোএফেক্টর সংযোগের ক্ষেত্রে হৃৎপেশি, মসৃণ অরেখ পেশি বা গ্রন্থির সঙ্গে সংযোগের বিষয়টি আমাদের আলোচনা থেকে বাদ দেব। আমাদের আলোচনায় প্রাধান্য পাবে শুধু কঙ্কালপেশির সঙ্গে সংযোগ। কারণ, ভাষা উচ্চারণে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলি এ ধরনের পেশিকলা দিয়েই তৈরি হয়। কঙ্কালপেশির ক্ষেত্রে এই নিউরোএফেক্টর জাংশনকে বলা হয় মোটর এন্ড-প্লেট। সাধারণভাবে মোটর এন্ড-প্লেট কেমন দেখতে হয় তা ছবিতে দেখানো হল। প্রতিটি মোটর স্নায়ুতন্তুর শেষ অংশটি শাখাপ্রশাখায় বিভাজিত হয়ে স্নায়ুপ্রান্তে একটি জটিল শাখান্বিত গঠন তৈরি করে। প্রতিটি প্রান্ত প্রবিষ্ট হয় এক-একটি পৃথক পেশিতন্তুর ভিতরে। প্রতি প্রান্তে অবস্থিত বুটনের মধ্যে নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থসমন্বিত সাইন্যাপটিক ভেসিকল থাকে। কঙ্কালপেশিতে প্রবিষ্ট মোটর নিউরোনের ক্ষেত্রে এই নিউরোট্রান্সমিটারের কাজ করে অ্যাসিটাইলকোলিন।

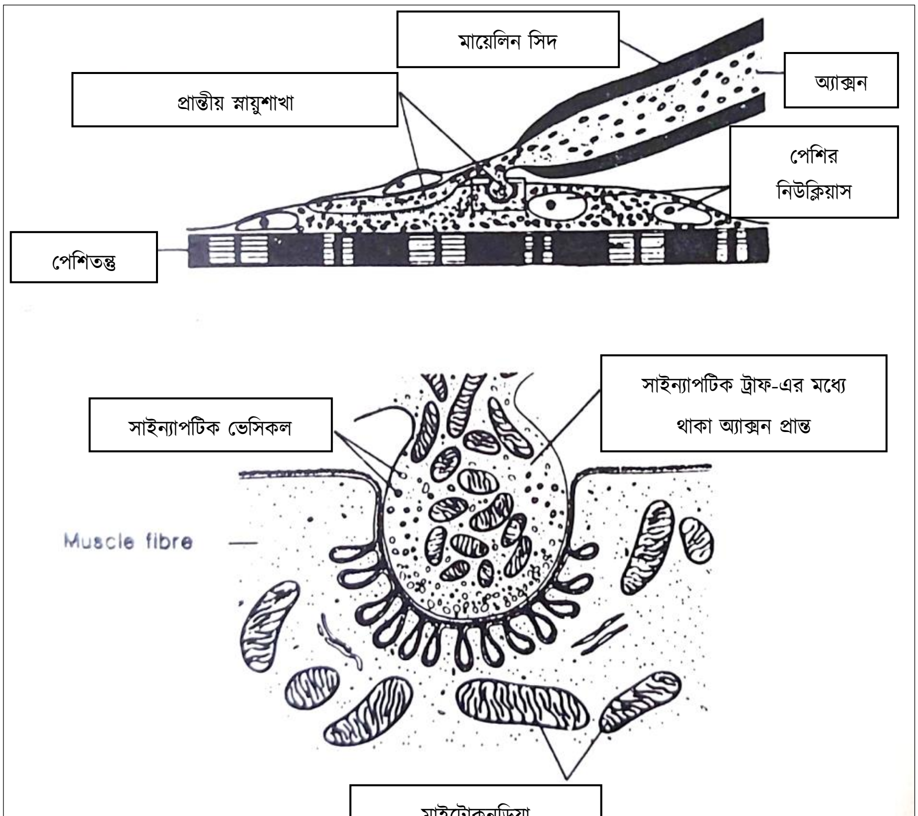

চিত্র ২.২: মোটর এন্ড-প্লেট

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ দুটি তৈরি হয় দু-রকম কলা দিয়ে—শ্বেত বস্তু এবং ধূসর বস্তু। ধূসর বস্তু তৈরি হয় মূলত নিউরোনের কোশদেহ এবং কোশদেহ সংলগ্ন প্রবর্ধক ডেনড্রাইট দিয়ে। শ্বেত বস্তু তৈরি হয় নিউরোনের দীর্ঘায়িত অংশ অ্যাক্সন দিয়ে। অ্যাক্সনের লিপিড আবরণী বা মায়েলিনের কারণেই এর রং হয় সাদা। শ্বেত বস্তুতে কোশদেহ থাকে না। কিন্তু শ্বেত বস্তু বা ধূসর বস্তু, সবেতেই প্রচুর সংখ্যক নিউরোগ্লিয়াল কোশ এবং রক্তজালক থাকে। শ্বেত বস্তুর মধ্যে থাকা স্নায়ুতন্তুর এক-একটি গুচ্ছকে বলে ট্র্যাক্ট। সাধারণত ট্র্যাক্টগুলির উৎস এবং গন্তব্য অনুসারে এদের নামকরণ করা হয় (যেমন কর্টিকো-স্পাইনাল ট্র্যাক্ট)। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে উৎপন্ন স্নায়ুকোশের প্রবর্ধকগুলি গুচ্ছাকারে মিলিত হয়ে বিভিন্ন স্নায়ু তৈরি করে।

মস্তিষ্কের ধূসর বস্তুর অধিকাংশই থাকে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের বহিরাবরকের মধ্যে। এই বহিরাবরকটি ১ থেকে ৪.৫ মিমি. পুরু হয়। একে বলে সেরিব্রাল কর্টেক্স (কর্টেক্স শব্দটির অর্থ খোসা বা ছাল)। সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতরে শ্বেত বস্তু এবং ধূসর বস্তু ঠিক উলটোভাবে বিন্যস্ত থাকে। ধূসর বস্তু থাকে সুষুম্নার কেন্দ্রীয় অংশে আর তাকে ঘিরে থাকে শ্বেত বস্তু। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কিছু অংশ বিশেষত ব্রেনস্টেমে স্নায়ুর কোশদেহ এবং মায়েলিন আবৃত তন্তু উভয়ই উপস্থিত থাকে। ফলে এইসব অংশে মিলিয়েমিশিয়ে থাকে শ্বেত বস্তু এবং ধূসর বস্তু।

২.১.২. মস্তিষ্ক

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশটি থাকে করোটির মধ্যে। মস্তিষ্কেই মানবদেহের বৃহত্তম এবং জটিলতম স্নায়ুবিন্যাস দেখা যায়। এর ওজন গড়ে ১৪০০ গ্রাম। মেনিনজেস নামক একটি ত্রিস্তরীয় তন্তুময় আবরকে ঢাকা এই মানবমস্তিষ্ক সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড নামক একটি ঘন তরলের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে। সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডই মস্তিষ্ককে খুলির হাড়ের সঙ্গে ঘর্ষণজনিত সংঘাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। মস্তিষ্কের ভেতরেও প্রচুর ফ্লুইড ভরা গহ্বর বা ক্যাভিটি দেখতে পাওয়া যায়, যাকে বলে ভেন্ট্রিকল।

ভ্রূণ অবস্থায় নিউরাল টিউব থেকে ধীরে ধীরে গোটা স্নায়ুতন্ত্র বিকশিত হয়। নিউরাল টিউবের রোস্ট্রাল প্রান্তে ক্রমশ তিনটি ফোলা অংশ তৈরি হয়, যাকে প্রাইমারি ব্রেন ভেসিকল বলে। ভেসিকল তিনটি হল প্রোসেনসেফালন, মেসেনসেফালন এবং রম্বেনসেফালন। এর থেকে যথাক্রমে অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক এবং পশ্চাৎমস্তিষ্ক তৈরি হয়। এই তিনটি প্রাইমারি ভেসিকল তৈরি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই প্রোসেনসেফালন দ্বিবিভাজিত হয়ে টেলেনসেফালন ও ডায়েনসেফালন তৈরি করে। টেলেনসেফালন থেকে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার তৈরি হয় এবং ডায়েনসেফালন তৈরি করে থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস। রোস্ট্রাল অঞ্চলেরই একটি খাঁজ আবার রম্বেনসেফালনকে মেটেনসেফালন ও মায়েলেনসেফালন নামে দুটি ভাগে বিভক্ত করে। মেটেনসেফালন থেকে সেরিবেলাম ও পনস এবং মায়েলেনসেফালন থেকে মেডুলা অবলংগাটা তৈরি হয়। মেসেনসেফালন কিন্তু

অবিচ্ছিন্ন থাকে এবং পরিণত অবস্থায় ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে মধ্যমস্তিষ্ক তৈরি করে। পরিণত মস্তিষ্ক বা এনসেফালনকে তিনটি মুখ্য ভাগে ভাগ করা যায় : সেরিব্রাম, ব্রেনস্টেম এবং সেরিবেলাম।

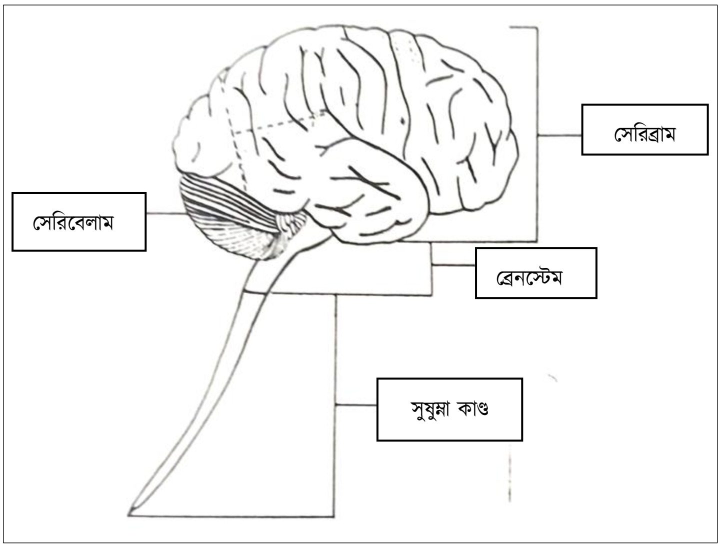

চিত্র ২.৩: কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মুখ্য উপাদানসমূহ

২.১.২.১. সেরিব্রাম

মস্তিষ্কের বৃহত্তম অংশ হল সেরিব্রাম। গোটা মস্তিষ্কের মোট ওজনের আট ভাগের সাত ভাগ ওজনই আসলে সেরিব্রামের ওজন। যাবতীয় সেনসরি এবং মোটর ক্রিয়াকলাপ (যার মধ্যে ভাষা উচ্চারণও পড়ছে) মস্তিষ্কের যে কেন্দ্রগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলির অবস্থান এই সেরিব্রামে। সেই সঙ্গে যুক্তি, বুদ্ধি, স্মৃতি নিয়ন্ত্রক প্রাথমিক ভাষাকেন্দ্র বা প্রাইমারি ল্যাংগুয়েজ সেন্টারও থাকে এখানেই।

সেরিব্রামের উপরিতলে রয়েছে প্রচুর খাঁজ ও ভাঁজ, যার ফলে এর মসৃণ তলদেশে অনেক ওঠাপড়া দেখা যায়। উঠে থাকা অংশগুলিকে বলা হয় জাইরাস (বহুবচনে জাইরি) আর জাইরাসের মাঝেমাঝে থাকা তুলনামূলক অগভীর ও ছোটো খাঁজগুলিকে সালকাস (বহুবচনে সালকি) বলে। জাইরির মধ্যে থাকা গভীর খাঁজকে বলে ফিশার। মস্তিষ্কের মাঝামাঝি, উপর থেকে নীচ বরাবর এমনই একটি গভীর খাঁজ বা ফিশার সেরিব্রামকে দুটো গোলার্ধে ভাগ করে দিয়েছে। এদেরকে যথাক্রমে ডান ও বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার বলা হয়। মস্তিষ্ককে উপর থেকে দেখলে এই লম্বালম্বি খাঁজটি স্পষ্টত চোখে পড়ে (চিত্র ২.৪ দ্রষ্টব্য)।

সেরিরাল কর্টেক্স আসলে ধূসর বস্তুর আবরকে মোড়া একটি অসমতল স্তর যা সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারকে ঢেকে রাখে। মস্তিষ্কের প্রায় ৪০% ওজন ধারণ করে এই সেরিব্রাল কর্টেক্স। ধরে নেওয়া যায়, এই এলাকায় রয়েছে প্রায় ১৫০০ কোটি নিউরোন! সেরিব্রামের সর্বত্র কিন্তু এই সেরিব্রাল কর্টেক্সের কোশীয় গঠন এক নয়।

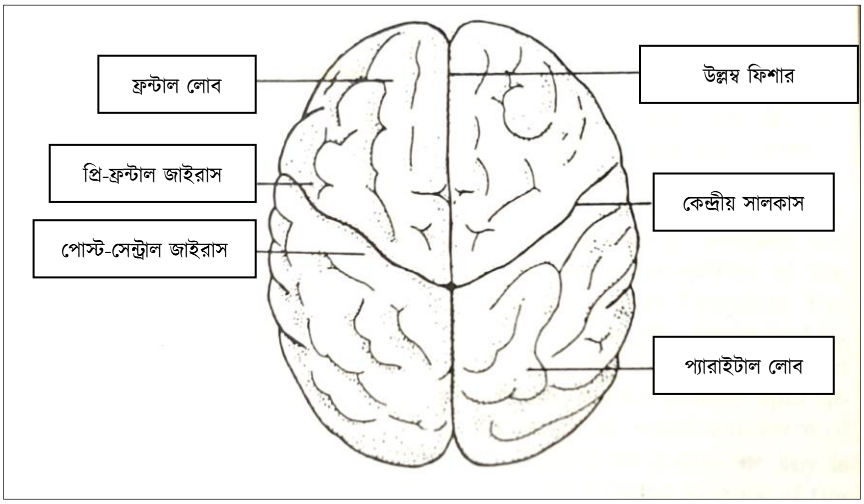

চিত্র ২.৪: উপর থেকে মানবমস্তিষ্কের গঠন

বিজ্ঞানীদের[২] গবেষণায় দেখা গেছে সেরিব্রামের ভিন্নতর কোশীয় গঠনসম্পন্ন এলাকাগুলি কাজের দিক থেকেও ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। মস্তিষ্কের গঠন এবং কাজ সম্পর্কিত এই ধারণা পাওয়ার জন্য বিজ্ঞানীরা[৩] শিম্পাঞ্জি ও বানরের মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করেছেন, সার্জারির সময় মানবমস্তিষ্ককেও খুঁটিয়ে দেখেছেন। দেখা গেছে, সেরিব্রাল কর্টেক্সের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে মস্তিষ্কের কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজ সীমাবদ্ধ। মস্তিষ্কে তড়িৎ-উদ্দীপনা প্রেরণ করে, কিংবা কর্টেক্সের ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলি কেটে বাদ দিয়ে (এই পদ্ধতিকে অ্যাবলেশন বলে) তারপর স্নায়ুসক্রিয়তা পরীক্ষা করে বিভিন্নভাবে এই অঞ্চলগুলিকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা[৪]। মস্তিষ্কের এই সক্রিয়তা অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করতে (ম্যাপিং) বিবিধ পরীক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন ব্রডম্যান। বিশ শতকের গোড়ার দিকে আবিষ্কৃত এই পদ্ধতিটির নাম ছিল সংখ্যা পদ্ধতি। এই ব্রডম্যান নাম্বার সিস্টেমের ছবি নীচে দেওয়া হল।

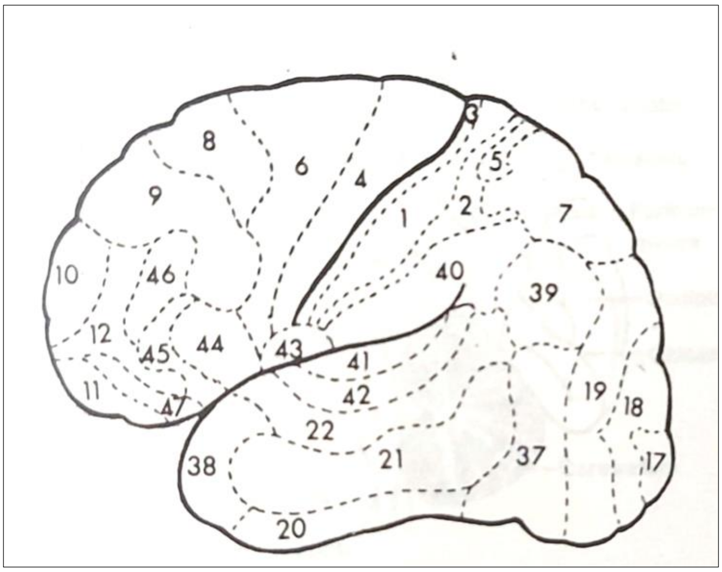

চিত্র ২.৫: ব্রডম্যান সাইটোআর্কিটেকচারাল ম্যাপ

এই পদ্ধতিতে মানবমস্তিষ্কের গঠন এবং কাজ—এই দুটি বিষয়কেই মাথায় রেখে ব্রডম্যান একটি নির্দিষ্ট কাঠামো দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা বোঝাতে মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন ৪৭টি অঞ্চলের প্রতিটিকে তিনি ১ থেকে ৪৭ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করেন। ফলস্বরূপ, সেরিব্রাল কর্টেক্স বিভাজিত হল তিনটি বড়ো অংশে—মোটর, সেনসরি এবং আনুষঙ্গিক (অ্যাসোসিয়েশন) অঞ্চল। মোটর অঞ্চল ঐচ্ছিক পেশির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে, সেনসরি অঞ্চলে গৃহীত হয় বাহ্যিক উদ্দীপনা (দৃশ্য, শব্দ ইত্যাদি)। প্রতিটি হেমিস্ফিয়ারে তিনটি প্রাথমিক সেনসরি অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায়—একটি দর্শন অনুভূতি গ্রহণ করে, একটি গ্রহণ করে শ্রবণ অনুভূতি, অন্যটি সাধারণভাবে অন্যান্য উদ্দীপনা (স্পর্শ ইত্যাদি) গ্রহণ করে। অন্যদিকে অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স মস্তিষ্কের প্রায় ৭৫% অংশ জুড়ে থাকে। একে 'আনকমিটেড কর্টেক্স'-ও বলা হয়, তার কারণ শ্রবণ, দর্শন, আস্বাদন, স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি সেনসরি ভূমিকা পালনে এই অঞ্চলের সরাসরি কোনো অবদান নেই। বিজ্ঞানীরা[৫] মনে করেন, সেনসরি অঞ্চলে গৃহীত প্রাথমিক সেনসরি উদ্দীপনাগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে মোটর অঞ্চলে পাঠানোই এর কাজ। তবে, প্রাইমারি সেনসরি ও মোটর এলাকা নিরপেক্ষভাবেও প্রচুর ইনপুট ও আউটপুট সামলায় এই আনুষঙ্গিক এলাকা। তিনটে বড়ো অংশে এই অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স বিভক্ত—প্রি-ফ্রন্টাল, অ্যান্টেরিয়র এবং প্যারাইটাল-টেম্পোরাল-অক্সিপিটাল অঞ্চল। বিভিন্ন বৌদ্ধিক এবং জ্ঞানমূলক কাজ সম্পাদিত হয় এই এলাকায়।

সেরিব্রাল কর্টেক্সের ঠিক তলায় থাকা প্রতিটি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার তৈরি হয় শ্বেত বস্তু দিয়ে। তার মধ্যে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে ধূসর বস্তু। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এই ধূসর এলাকাগুলিকে বেসাল নিউক্লি (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে নিউক্লিয়াস হল ধূসর বস্তু) বা বেসাল গ্যাংলিয়া (তবে, গ্যাংলিয়ন হল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বাইরে থাকা স্নায়ুকোশের সমষ্টি) বলা হয়। এই বেসাল নিউক্লি বা বেসাল গ্যাংলিয়া গুরুত্বপূর্ণ মোটর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যদি এই এলাকা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে পার্কিনসন্স ডিজিজ, করিয়া, অ্যাথিটোসিস, ডিসকাইনেশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্নায়বিক সমস্যা দেখা দেয়। এই রোগগুলির প্রতিটিই ভাষাব্যবহারের ওপরেও ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে।

সেরিব্রাল কর্টেক্সের তলায় থাকা শ্বেত বস্তু তৈরি হয় মায়েলিন আবরকে ঢাকা স্নায়ুতন্তু দিয়ে। এই স্নায়ুতন্তুগুলি তিনটি মুখ্য অভিমুখে সজ্জিত থাকে। প্রথমত, এখানে রয়েছে কিছু অ্যাসোসিয়েশন (আনুষঙ্গিক) তন্তু। একটি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে স্নায়ু উদ্দীপনাকে সেরিব্রাল কর্টেক্সের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রেরণ করাই এর কাজ। ভাষাগত ভূমিকা পালনে গুরুত্বপূর্ণ একটি অ্যাসোসিয়েশন তন্তুগুচ্ছ হল আরকুয়েট ফ্যাসিকুলাস (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্গত স্নায়ুতন্তুগুচ্ছকে ফ্যাসিকুলাস বলা হয়)। টেম্পোরাল লোবের ভাষা এলাকাকে ফ্রন্টাল লোবের ভাষা এলাকার সঙ্গে যুক্ত করে এই আরকুয়েট ফ্যাসিকুলাস। আরকুয়েট ফ্যাসিকুলাস ক্ষতিগ্রস্ত হলে কনডাকশন অ্যাফেজিয়া জাতীয় ভাষিক বিকার পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া তন্তুগুচ্ছের দ্বিতীয় আর-একটি প্রকার হল কমিস্যুরাল তন্তুগুচ্ছ। এক সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার থেকে অন্য

হেমিস্ফিয়ারে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন করাই এর কাজ। তন্তুগুচ্ছের তৃতীয় প্রকারের নাম প্রজেকশন তন্তুগুচ্ছ। এই গুচ্ছ সাব-কর্টিকাল শ্বেত বস্তু গঠন করে। সেরিব্রাল কর্টেক্সকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিম্নবর্তী অংশ, যেমন ব্রেনস্টেম, সুষুম্নাকাণ্ড প্রভৃতির সঙ্গে উর্ধ্বগামী ও অধোগামী পথে যুক্ত করাই এর কাজ।

সব মিলিয়ে, দুটি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারই দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং এর প্রতিটিতে শরীরের যাবতীয় মোটর এবং সেনসরি কাজ সম্পন্ন করার যাবতীয় কেন্দ্র বর্তমান। বিশেষভাবে উল্লেখের বিষয়, প্রতিটি দিকের হেমিস্ফিয়ার আদতে শরীরের যে দিকের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করে, সেটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিক। অর্থাৎ, ডান সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার যুক্ত থাকে শরীরে বাঁ-দিকের মোটর ও সেনসরি ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের কাজে, একইভাবে, বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের ডান দিক। যদিও প্রতিটি হেমিস্ফিয়ারেই শরীরের মোটর ও সেনসরি কাজ করার মতো গোটা সেট রয়েছে, তবু, এদের প্রত্যেকের কিছু নিজস্ব বিশেষ কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে, যা কিনা একে অন্যের থেকে পৃথক। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ মানুষেরই বাক্‌ব্যবহার কিংবা ভাষার প্রয়োগ মূলত নিয়ন্ত্রিত হয় শরীরের বাম হেমিস্ফিয়ারের দ্বারা। মানুষের হাতের ব্যবহার এবং বিবিধ বিশ্লেষণী ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রও কিন্তু বাম হেমিস্ফিয়ার। আবার, ডান হেমিস্ফিয়ারের বিশেষত্ব প্রদর্শিত হয় স্টেরিওগনোসিস (কোনো বস্তুর আকার-আকৃতি সংক্রান্ত ধারণা করার ক্ষমতা বা বোধকে বলে স্টেরিওগনোসিস; যেমন হাতের তালুতে একটা বল, কয়েন কিংবা পেনসিল থাকলে আমরা সেদিকে না তাকিয়েও বলে দিতে পারি জিনিসটা আসলে কী) এবং স্থানগত ধারণা নির্ধারণের কাজে। প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে বাক্‌নিয়ন্ত্রক হেমিস্ফিয়ারটিকেই মুখ্য হেমিস্ফিয়ার বা ডমিন্যান্ট হেমিস্ফিয়ার বলে চিহ্নিত করা হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, একটি গভীর খাঁজ বা ফিশার আমাদের মস্তিষ্কের হেমিস্ফিয়ার দুটিকে স্পষ্টত দ্বিবিভাজিত করে। কিন্তু এই উল্লম্ব ফিশারের উপস্থিতি সত্ত্বেও, দুটি হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে বেশ কয়েকটি যোজক। সবচাইতে বড়ো যোজকটি হল করপাস ক্যালোসাম। এই করপাস ক্যালোসাম আসলে শ্বেত বস্তু দিয়ে তৈরি, এর কাজই হল এক হেমিস্ফিয়ার থেকে অন্য হেমিস্ফিয়ারে তথ্য আদানপ্রদানের রাস্তা তৈরি করা। করপাস ক্যালোসামের সামনের দিকটাকে বলা হয় জেনু, আর পিছনের দিকটাকে বলা হয় স্প্লেনিয়াম। জেনু এবং স্প্লেনিয়ামের মাঝখানে থাকে করপাস ক্যালোসামের গোটা অংশটা। করপাস ক্যালোসাম ছাড়াও আরও তিনটি যোজকের মাধ্যমে মস্তিষ্কের হেমিস্ফিয়ার দুটি পরস্পর সংযুক্ত হয়। এগুলি হল ফরনিক্স, অগ্রবর্তী যোজক এবং পশ্চাদ্‌বর্তী যোজক। বিভিন্ন যোজকের অবস্থান স্পষ্ট করে দেখানোর জন্য মানবমস্তিষ্কের উল্লম্ব অবচ্ছেদের ছবি দেওয়া হল।

সেরিব্রামের পার্শ্বীয় ছবিতে ধরা পড়ে ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, টেম্পোরাল ও অক্সিপিটাল লোব। সেরিব্রামের এই পার্শ্বীয় তলে লোবগুলির মধ্যে থাকা পারস্পরিক ব্যবধায়ক ও তার অবস্থান এইরকম: সেন্ট্রাল সালকাসের সামনে এবং ল্যাটারাল ফিশারের ওপরে রয়েছে ফ্রন্টাল লোব, সেন্ট্রাল সালকাসের পিছনে এবং কল্পিত প্যারাইটো-অক্সিপিটাল রেখার (প্যারাইটাল ও অক্সিপিটাল লোবকে দ্বিবিভাজিত করে এই রেখা।

প্যারাইটো-অক্সিপিটাল সালকাসের সমান্তরালে এই রেখাকে কল্পনা করা হয়।) সামনে রয়েছে প্যারাইটাল লোব। ওপরে ল্যাটারাল ফিশার-এর পশ্চাদ্‌বর্তী অংশকে যদি বাড়াই, তবে তা চলে যাবে অক্সিপিটাল লোবের দিকে, আর এই ল্যাটারাল ফিশারের নীচে এবং কল্পিত প্যারাইটো-অক্সিপিটাল রেখার সামনে অবস্থান করছে টেম্পোরাল লোব।

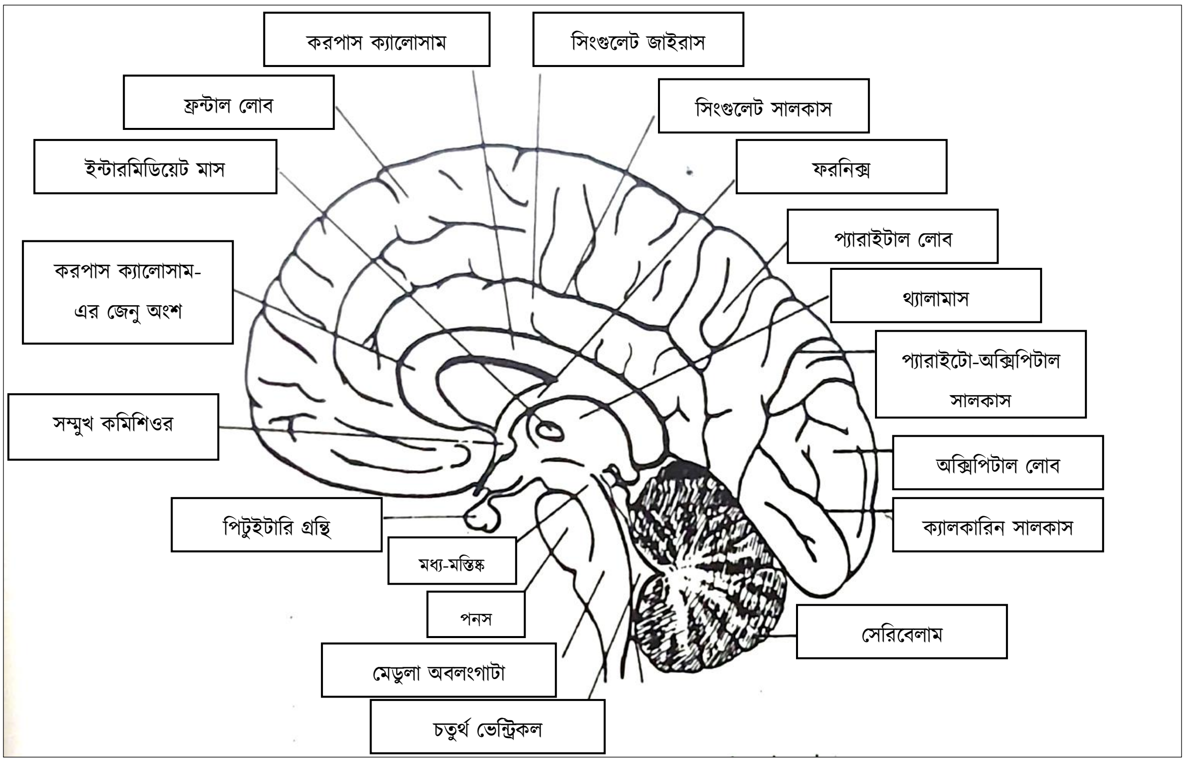

চিত্র ২.৬: মানবমস্তিষ্কের উল্লম্ব অবচ্ছেদ

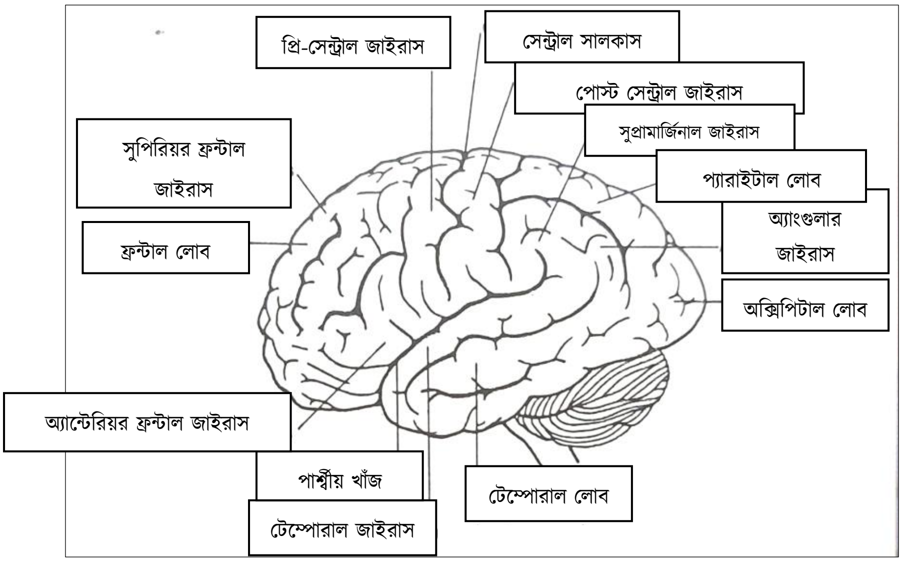

চিত্র ২.৭: মানবমস্তিষ্কের পার্শ্বীয় গঠন

ল্যাটারাল ফিশারের গভীর খাঁজে ঢুকে থাকে বলে মস্তিষ্কের বাইরে থেকে কিন্তু সেন্ট্রাল লোব বা ইনসুলাকে দেখা যায় না। সেন্ট্রাল লোবকে দেখতে হলে ল্যাটারাল ফিশারকে সরাতেই হবে। ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল আর টেম্পোরাল লোবের যে অংশগুলি ইনসুলার বাইরের দিকটা ঢেকে রাখে, সেগুলিকে যথাক্রমে ফ্রন্টাল অপারকুলাম, প্যারাইটাল অপারকুলাম এবং টেম্পোরাল অপারকুলাম বলা হয়।

প্রতিটি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের মাঝ বরাবর জাইরির একটি বৃত্তাকার রিং-এর মতো এলাকাই হল লিম্বিক লোব। লিম্বিক লোবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে থাকে হিপ্পোক্যাম্পাস, প্যারাহিপ্পোক্যাম্পাল জাইরাস আর সিংগুলেট জাইরাস। এর কোনো কোনো অংশ মস্তিষ্কের উল্লম্ব অবচ্ছেদে চোখে পড়ে।

মস্তিষ্কের গোটা তলীয় বিন্যাস বা সেরিব্রাল সারফেস-এর মধ্যভাগকে কয়েকটি সীমারেখা দিয়ে বিশেষভাবে সক্রিয় কিছু অঞ্চলকে পৃথক করে চিহ্নিত করা হয়। ফ্রন্টাল লোবের অবস্থান কেন্দ্রীয় সালকাসের সম্মুখভাগে এবং সিংগুলেট সালকাসের রেখাটির ঠিক ওপরে। প্যারাইটাল লোবকে ঘিরে রাখে সেন্ট্রাল সালকাস, সিংগুলেট সালকাস আর প্যারাইটো-অক্সিপিটাল সালকাস। প্যারা-হিপ্পোক্যাম্পাল জাইরাসের সঙ্গে পার্শ্বীয়ভাবে অবস্থান করে টেম্পোরাল লোব। প্যারাইটাল-অক্সিপিটাল লোবের পশ্চাৎ অংশে থাকে অক্সিপিটাল লোব। অন্যদিকে, সিংগুলেট সালকাস এবং কোল্যাটারাল সালকাস যে বক্ররেখার মতো ভাঁজ তৈরি করে, সেই বক্ররেখা দিয়ে ঘেরা জাইরি-ই হল লিম্বিক লোবের মূল উপাদান।

সংলগ্ন সেরিব্রাল লোবগুলির অবস্থান আলাদা হলেও কাজের দিক থেকে বহু ক্ষেত্রেই এদের মধ্যে সীমারেখা টানা যায় না। এই লোবগুলি প্রায় প্রত্যেকটিই একাধিক বিষয়ে সক্রিয় এবং সক্রিয়তার নিরিখে একাধিক লোব পরস্পরের সাপেক্ষ। যেমন, ঐচ্ছিক গতিবিধির নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রগুলি থাকে সেরিব্রামের মোটর অঞ্চলে, মূলত ফ্রন্টাল লোবে। আবার, কেন্দ্রীয় সালকাসের ঠিক পিছনে যে লম্বা জাইরাসটিকে প্রি-সেন্ট্রাল জাইরাস (চতুর্থ ব্রডম্যান অঞ্চল) বলা হয়, সেটিও প্রাইমারি মোটর অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। কারণ এই উৎসবিন্দু থেকেই স্নায়ুতন্তুগুলি নির্গত হয়, যা সেরিব্রাল কর্টেক্স অঞ্চল থেকে ঐচ্ছিক স্নায়ু সংবেদ পরিবহন করে নিয়ে যায় ব্রেনস্টেম এবং সুষুম্নাকাণ্ডের দিকে। ফলে মস্তিষ্কের কোনো একটি দিকের প্রি-সেন্ট্রাল জাইরাস শরীরের বিপরীত দিকের যাবতীয় কঙ্কালপেশিগুলির ঐচ্ছিক সচলতা নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রাইমারি মোটর অঞ্চলে তড়িৎ সংবেদনা সঞ্চালিত করে দেখা গেছে, এর ফলে শরীরের ঠিক বিপরীত পার্শ্বীয় দিকের (contralateral side) পেশির সংকোচন হয়। প্রাইমারি মোটর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে ব্রেনস্টেম বা সুষুম্নাকাণ্ডের দিকে যাওয়া স্নায়ুতন্তুগুলিকে পিরামিড পথ (pyramidal pathways) বলা হয়।

ঐচ্ছিক পেশি সচলতা শরীরের যে অঙ্গগুলিকে প্রভাবিত করে, সেগুলির সক্রিয় হয়ে ওঠার ক্রমটি নির্ধারিত হয় কেন্দ্রীয় জাইরাসের সক্রিয়তার একটি বিশেষ অভিমুখ ধরে। প্রাইমারি মোটর কর্টেক্সে তড়িৎ

সংবেদ সঞ্চালনা করলে শরীরের বিপরীত পার্শ্বীয় দিকগুলির বিভিন্ন অঙ্গে যে ক্রমে পেশি সংকোচন হয়, তার অভিমুখ বা মোটর হোমানকুলাস ২.৮ সংখ্যক চিত্রে দেখানো হল।

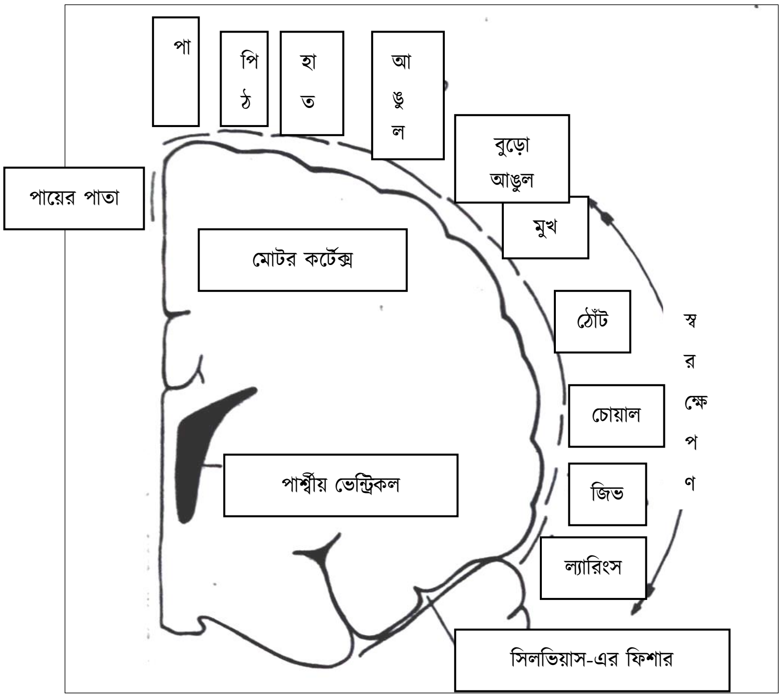

চিত্র ২.৮: প্রাইমারি মোটর অঞ্চল কর্তৃক দেহের পেশি সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে কোনো রোগীর মস্তিষ্কে যখন লোকাল ব্রেন অ্যানাস্থেশিয়ার দরকার পড়ে, তখন এইভাবে প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স এলাকায় তড়িৎ পরিবহন ঘটানো হয়। চিত্রে যে অঙ্গ সক্রিয়তার পথটি দেখানো হয়েছে, স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় মোটর হোমানকুলাস। লক্ষণীয় যে, অঙ্গ সক্রিয়তার অভিমুখটি দেহকাণ্ডের নিরিখে সম্পূর্ণ উলটো। অর্থাৎ, প্রি-সেন্ট্রাল জাইরাস থেকে উদ্ভূত যে মোটর সংবেদনা মাথার দিকে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে, তা পার্শ্বীয় সালকাসের নিকটতম। আর উল্লম্ব ফিশার বা উল্লম্ব খাঁজ থেকে উদ্ভূত সংবেদনা পরিবাহিত হচ্ছে পায়ের দিকে। প্রি-সেন্ট্রাল জাইরাসের ঠিক কতটা অংশ শরীরের কোনো অংশে সংবেদনা পরিবহনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে, তা কিন্তু কখনোই শরীরের ওই নির্দিষ্ট অংশের আয়তন বনাম প্রি-সেন্ট্রাল জাইরাসে ওই অংশের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠা এলাকার আয়তনের অনুপাতে নির্ধারিত হয় না। বরং, পরীক্ষায় দেখা গেছে, মোটর স্ট্রিপগুলির বৃহদায়তন এলাকাই শরীরের সেই সব অঙ্গের পেশি সঞ্চালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, যেগুলির কাজ সূক্ষ্ম, কিন্তু সূক্ষ্ম ক্ষেত্রেই গতিবিধির ওপরে প্রবল শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ যেখানে প্রয়োজন। যেমন, হাতের পেশি সঞ্চালনার জন্য নিয়োজিত মোটর কর্টেক্স এলাকার আয়তন কিন্তু পায়ের পেশি সঞ্চালনার জন্য নিয়োজিত মোটর কর্টেক্স এলাকার আয়তনের চেয়ে অনেক কম। আবার শুধুমাত্র বড়ো মাত্রায় স্থান পরিবর্তন করে গতিবিধিতে পরিবর্তন

আনাই পায়ের যে পেশিগুলির কাজ, সেগুলির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রক প্রি-সেন্ট্রাল জাইরাস এলাকার আয়তনের চেয়ে অনেক বেশি আয়তনের এলাকা কেবলমাত্র স্বরযন্ত্র বা ল্যারিংস-এর পেশি সঞ্চালনা নিয়ন্ত্রিত করে। কারণ, মানুষের দৈহিক গঠনের বিচারে স্বরযন্ত্র একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অঙ্গ হলেও, স্বরযন্ত্রের পেশির নড়াচড়া এবং গতিবিধির সামান্য পরিবর্তনেই স্বরক্ষেপণে অনেক বড়ো মাত্রার পরিবর্তন ঘটে। ফলে স্বরযন্ত্রের পেশির গতিবিধির ওপরে নিয়ন্ত্রণ হতে হবে বিশেষ এবং শক্তিশালী।

কৃত্রিম বাহ্যিক সংবেদনা মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করে দেখা গেছে, প্রাইমারি মোটর অঞ্চল ছাড়াও আরও অনেকগুলি অন্য মোটর অঞ্চল মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবে অবস্থিত। এই মোটর এলাকাগুলির মধ্যে পড়ে প্রি-মোটর এলাকা (ষষ্ঠ ব্রডম্যান অঞ্চল), সাপ্লিমেন্টারি মোটর এলাকা, গৌণ (secondary) মোটর এলাকা এবং সম্মুখ চক্ষু ক্ষেত্র বা ফ্রন্টাল আই ফিল্ড (অষ্টম ব্রডম্যান অঞ্চল)। প্রি-সেন্ট্রাল সালকাসের ঠিক সামনেই থাকে প্রি-মোটর অঞ্চল। পিরামিড পথসহ (pyramidal pathways) অন্যান্য নিম্নগামী মোটর পথগুলিতে স্নায়ুতন্তু সরবরাহ করা ছাড়া এই প্রি-মোটর অঞ্চল পরোক্ষে প্রাইমারি মোটর অঞ্চলের সক্রিয়তার ওপরেও প্রভাব ফেলে। প্রি-মোটর অঞ্চলে তড়িৎ সংবেদনা সঞ্চালিত করলে একাধিক পেশি সংকুচিত হয়ে জটিল শারীরবৃত্তীয় সাড়া তৈরি করতে পারে। কখনও তার মাধ্যমে স্বরক্ষেপণ হয়, কখনও হাঁটার ছন্দে এক পায়ের ওপরে ভর দিয়ে সেই পা পিছিয়ে নিয়ে অন্য পা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর্যায়ক্রমিক যে সচলতা তৈরি হয়, তার নিয়ন্ত্রণ করে, মাথা নাড়ানো, চিবোনো, গেলা, শরীরের বিভিন্ন ভঙ্গিমায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবিধ অবস্থান পরিবর্তন— এ সবই বিভিন্ন সময়ে চালনা করে থাকে প্রি-মোটর অঞ্চল। বিজ্ঞানীরা অনেকেই[৬] মনে করেন, প্রি-মোটর এলাকার মাধ্যমে দক্ষতানির্ভর মোটর ক্রিয়াগুলি পরিচালিত হয় এবং সেইজন্যই প্রি-মোটর এলাকার প্রভাবে প্রাইমারি মোটর এলাকা ঐচ্ছিক পেশির সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, প্রাইমারি মোটর এলাকা একদিকে প্রতিটি একক পেশির সংকোচন ঘটানোর প্রক্রিয়ায় সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে ঐচ্ছিক মোটর ক্রিয়ার আউটপুট পরিবাহিত করে এবং অন্যদিকে প্রি-মোটর এলাকা একাধিক পেশির সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতানির্ভর গতিবিধিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাতে সক্ষম হয়।

গৌণ বা সেকেন্ডারি মোটর এলাকা প্রি-সেন্ট্রাল জাইরাসের ঠিক নীচে পার্শ্বীয় ফিশার-এর পিছনের দেয়ালে অবস্থান করে। আর ষষ্ঠ ব্রডম্যান অঞ্চলের পরিবর্ধিত অংশ সাপ্লিমেন্টারি মোটর এলাকা অবস্থিত প্রাইমারি মোটর এলাকার তলদেশের ঠিক সামনে, হেমিস্ফিয়ারের মধ্যভাগে অবস্থিত উল্লম্ব ফিশার-এর ভেতরে। বেশ কিছু গবেষণায়[৭] একেই দ্বিতীয় ভাষা অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রি-মোটর অঞ্চলের সামনে থাকে ফ্রন্টাল আই ফিল্ড। চোখের পাতার ঐচ্ছিক সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত হয় এই এলাকার মাধ্যমে। শরীরের যে দিকের ফ্রন্টাল আই ফিল্ডে সংবেদনা এসে পৌঁছোচ্ছে, তার বিপরীত পার্শ্বীয় দিকের চোখের পাতার পেশিতে তা প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ফ্রন্টাল লোবের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হল ব্রোকা-র অঞ্চল (৪৪তম এবং ৪৫তম ব্রডম্যান অঞ্চল)। মস্তিষ্কের যে দুটি মুখ্য কর্টিকাল অঞ্চলকে ভাষা সংক্রান্ত বিশেষ দক্ষতা নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, ব্রোকার অঞ্চল তার মধ্যে একটি, একেই মোটর স্পিচ অঞ্চল বলা হয়। ফ্রন্টাল লোবের তৃতীয় ফ্রন্টাল জাইরাসে এই অঞ্চলটির অবস্থান। স্বচ্ছন্দ এবং সুউচ্চারিত ভাষা ব্যবহারের মূল উৎপাদক কেন্দ্র হিসেবে সক্রিয় থাকে এই ব্রোকার অঞ্চল।

সাধারণ সেনসরি সক্রিয়তার একটা বড়ো ক্ষেত্রের বিভিন্ন রকম কাজ নিয়ন্ত্রণ করে প্যারাইটাল লোব। তাপ সংক্রান্ত সংবেদন, যন্ত্রণা, স্পর্শ, চাপ, বিভিন্ন ভঙ্গিতে শরীরের অবস্থান, কিছু স্বাদের সংবেদন—এসবই এই প্যারাইটাল লোব অঞ্চলের অনুভূতি স্তরে এসে পৌঁছোয়। সাধারণ অনুভূতিগুলির প্রাইমারি সেনসরি অঞ্চল (একে সেনসরি স্ট্রিপ বা সামেস্থেটিক অঞ্চলও বলা হয়ে থাকে) হিসেবে কাজ করে পোস্ট-সেন্ট্রাল জাইরাস (ব্রডম্যান সাইটোআর্কিটেকচারাল ম্যাপের ১, ২ এবং ৩ সংখ্যক অঞ্চল)। প্রত্যেকটি সেনসরি স্ট্রিপ শরীরের বিপরীত দিক থেকে সেনসরি সংকেত গ্রহণ করে, একমাত্র মুখমণ্ডলের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সেনসরি অনুভূতি (মূলত স্পর্শ) অবশ্য শরীরের একই দিক থেকেও সেনসরি সংকেত হিসেবে আসে। মোটর স্ট্রিপের ক্ষেত্রে যেমন মোটর হোমানকুলাসের অভিমুখ একটি নির্দিষ্ট ছবিতে ম্যাপিং করে দেখানো হয়েছিল, ঠিক তেমনই পোস্ট-সেন্ট্রাল জাইরাসের অনুষঙ্গে সেনসরি হোমানকুলাসের একটি ম্যাপিং করে দেখানো সম্ভব যে, শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গের সেনসরি নিয়ন্ত্রণ কোথায় কোথায় থাকে।

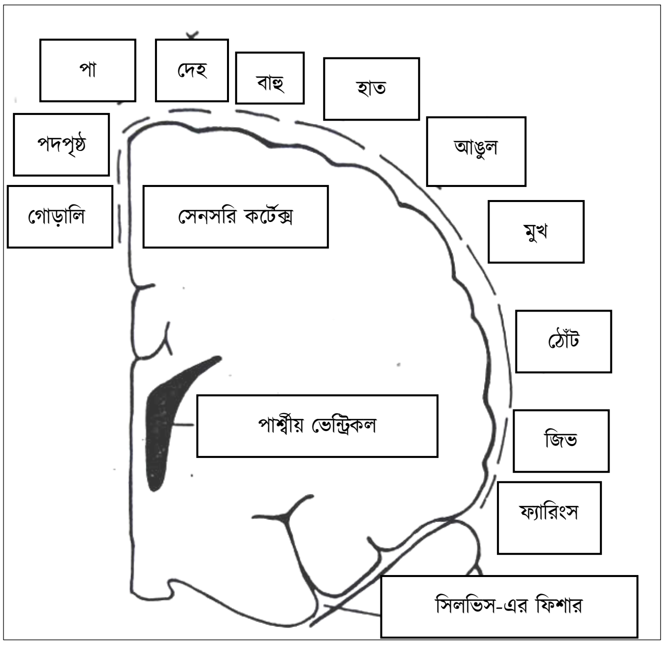

চিত্র ২.৯: সেনসরি হোমানকুলাস

২.৯ সংখ্যক চিত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, দেহের বেশ কিছু অংশের সেনসরি নিয়ন্ত্রণের জন্য পোস্ট-সেন্ট্রাল জাইরাসের অনেকটা বড়ো এলাকা সক্রিয় হয়ে থাকে। শরীরের কোনো অংশের জন্য পোস্ট-সেন্ট্রাল জাইরাসে

যতটা এলাকা কাজ করে, তার আয়তনের সঙ্গে শরীরের ওই অংশে ক্রিয়াশীল সেনসরি রিসেপটরের সংখ্যা সমানুপাতিক হারে বাড়ে বা কমে। অর্থাৎ, সরীরের কোনো অঙ্গ যত বেশি সংবেদনশীল, সেই অংশের জন্য পোস্ট-সেন্ট্রাল জাইরাসে তত বেশি আয়তনের এলাকা সক্রিয় হয়ে থাকে। সেজন্যই, ঠোঁট বা হাতের (বিশেষত বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর) জন্য পোস্ট-সেন্ট্রাল জাইরাসে বেশ অনেকটা আয়তনের এলাকা বরাদ্দ। আবার পিঠের দিক কিংবা পায়ের জন্য বরাদ্দ এলাকার আয়তন তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম।

ভাষার অভিব্যক্তি তথা স্পিচ-ল্যাংগুয়েজ প্যাথোলজির নিরিখে পোস্ট-সেন্ট্রাল জাইরাসের সঙ্গে সঙ্গে প্যারাইটাল লোবের আরও দুটি জাইরির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই দুটি হল সুপ্রামার্জিনাল জাইরাস এবং অ্যাংগুলার জাইরাস। পার্শ্বীয় ফিশার-এর পশ্চাৎ প্রান্তে থাকে সুপ্রামার্জিনাল জাইরাস এবং সুপ্রামার্জিনাল জাইরাসের ঠিক পিছনে সুপিরিয়র টেম্পোরাল জাইরাসকে পেঁচিয়ে থাকে অ্যাংগুলার জাইরাস। মুখ্য প্রভাবশালী (dominant) হেমিস্ফিয়ারে (সাধারণত বাঁ হেমিস্ফিয়ার) এই দুটি জাইরি পশ্চাৎ ভাষা কেন্দ্র (posterior language centre) গঠন করে, যা উচ্চারিত এবং লিখিত ভাষা গ্রহণ ও অনুধাবনে সাহায্য করে।

টেম্পোরাল লোব মূলত শোনার ক্ষেত্রে সহায়ক এবং সেজন্যই এখানে অবস্থিত বেশ কিছু নিউরোন ভাষা শোনা এবং কথা বলার দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কিত। পার্শ্বীয় ফিশার-এর ভেতরে ঢাকা পড়ে থাকে বলে মস্তিষ্কের উল্লম্ব অবচ্ছেদে এই প্রাইমারি শ্রবণ এলাকাটি দেখতে পাওয়া যায় না। পার্শ্বীয় ফিশার-এর তলটি তৈরি হয় সুপিরিয়র টেম্পোরাল জাইরাসের উপরিতল নিয়ে। এই তলের বিপ্রতীপে থাকা টেম্পোরাল জাইরি দিয়েই তলটিকে চেনা যায়। এই জাইরির ঠিক পিছনেই থাকে যথাক্রমে অ্যান্টেরিয়র টেম্পোরাল জাইরি এবং হেসল-এর খাঁজ (Heschl's convolution)। এই হেসল-এর খাঁজ এলাকাটিই মস্তিষ্কের মুখ্য শ্রবণ অঞ্চল বা প্রাইমারি অডিটরি এরিয়া (৪১ এবং ৪২তম ব্রডম্যান এলাকা)। সুপিরিয়র টেম্পোরাল জাইরাসের পিছনের যে অংশটি (২২তম ব্রডম্যান অঞ্চল) টেম্পোরাল লোবের পার্শ্বীয় তলের ওপরে বেশ স্পষ্টত জেগে থাকে সেটি এবং তারই সঙ্গে প্রাইমারি অডিটরি অঞ্চলের ঠিক পিছনের দিকে থাকা পার্শ্বীয় ফিশার-এর তলটি (যাকে প্ল্যানাম টেম্পোরাল বলা হয়) মিলিতভাবে শ্রবণ সহায়ক অঞ্চল হিসেবে কাজ করে। মুখ্য হেমিস্ফিয়ারে এই শ্রবণ সহায়ক অঞ্চলটিকেই বলা হয় ভেরনিক-এর অঞ্চল (Wernicke's area)— পশ্চাৎ ভাষা কেন্দ্রের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অক্সিপিটাল লোব মূলত দর্শনের অভিঘাত বহনেই সহায়তা করে। মস্তিষ্কের মুখ্য দর্শন এলাকা (১৭তম ব্রডম্যান অঞ্চল) ঘিরে থাকে ক্যালকারিন সালকাসকে, যেটি অক্সিপিটাল লোবের মধ্যতলের ওপরে থাকা উল্লম্ব ফিশারের ভেতরে অবস্থিত।

লিম্বিক লোব বা রাইনেনসেফালন (গন্ধমস্তিষ্ক বা smell brain) অলফ্যাকশন ক্রিয়া অর্থাৎ গন্ধের অনুভূতি বহন, কিছু স্বয়ংক্রিয় বা অটোনমিক ক্রিয়া এবং আবেগ, আচরণ এবং স্মৃতি সংক্রান্ত কিছু নির্দিষ্ট মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় লোবও বেস কিছু অটোনমিক ক্রিয়া চালনা করে থাকে।

২.১.২.২. ব্রেনস্টেম

মস্তিষ্ক থেকে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার এবং সেরিবেলাম—এই দুটিকেই যদি সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটি কাণ্ডের মতো কলাজাতীয় পদার্থ পড়ে থাকে, একেই বলে ব্রেনস্টেম। ব্রেনস্টেম চারটি মুখ্য অংশ নিয়ে গঠিত—মাথা (rostral) থেকে লেজ (caudal) পর্যন্ত অংশ নিয়ে তৈরি হয়েছে ডায়ানসেফালন, মধ্য-মস্তিষ্ক বা মেসেনসেফালন, পনস বা মেটেনসেফালন এবং মেডুলা অবলংগাটা বা মায়েলেনসেফালন। এই অংশগুলির পারস্পরিক সংযোগ দেখানো হল ২.১০ সংখ্যক চিত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মস্তিষ্কের ক্রিয়াভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করার সময় অনেক ক্ষেত্রেই এই ডায়ানসেফালনকে সেরিব্রামের অংশ হিসেবে ধরা হয়।

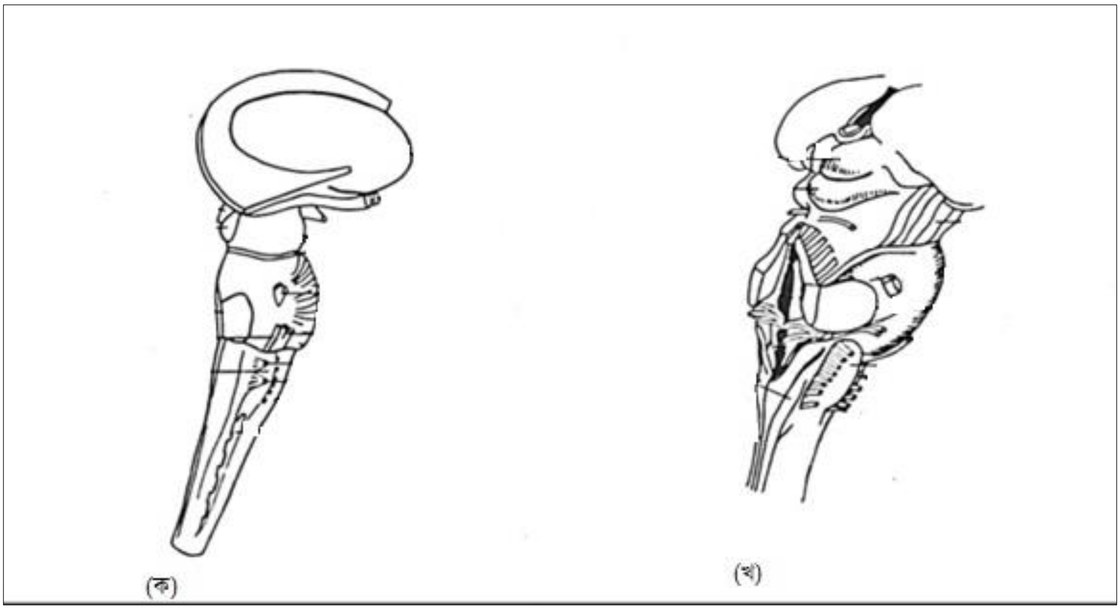

চিত্র ২.১০: (ক) ব্রেনস্টেমের পার্শ্বীয় চিত্র (খ) ব্রেনস্টেমের পশ্চাৎ-পার্শ্বীয় চিত্র

২.১.২.৩. ডায়ানসেফালন

ডায়ানসেফালন ঠিক সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার এবং মধ্য-মস্তিষ্কের মাঝামাঝি অবস্থিত। মূলত দুটি গুরুত্বপূর্ন অংশ—থ্যালামাস এবং হাইপোথ্যালামাস নিয়ে এই ডায়ানসেফালন গঠিত হয়। থ্যালামাস বস্তুত ধূসর পদার্থের একটি বড় ভরপিণ্ড, যার সামনে থেকে পিছনে দৈর্ঘ্যে তিন সেমি. এবং ওপর থেকে নীচে দৈর্ঘ্যে ১.৫ সেমি.। মধ্য মস্তিষ্কের একেবারে ওপরের দিকে থাকায় মস্তিষ্কের তলনির্দেশক চিত্রে একে আলাদা করে দেখা যায় না। শুধুমাত্র মস্তিষ্কের মাঝ বরাবর উল্লম্ব লম্বচ্ছেদ করলে তবেই একে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। মস্তিষ্কের তৃতীয়

ভেন্ট্রিকল এই থ্যালামাসকে প্রায় সমান দুই ভাগে ভাগ করে—বাঁ এবং ডান থ্যালামি। বেশিরভাগ মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে অবশ্য এই দুটি বেশ বড়ো ডিম্বাকৃতি থ্যালামিকে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন করে রাখে ধূসর পদার্থ দিয়ে তৈরি একটি যোজক—একে বলা হয় আন্তঃ-থ্যালামিক আসঞ্জক (intermediate mass)। প্রতিটি থ্যালামিক পিণ্ডে সংখ্যায় তিরিশটিরও বেশি নিউক্লি থাকে, যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেনসরি এবং মোটর ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত হয়। বস্তুত, থ্যালামাস হল মস্তিষ্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, যা সেনসরি কাজগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। একমাত্র অলফ্যাক্টরি অনুভূতিগ্রাহক পথটি ছাড়া আর প্রত্যেকটি সেনসরি অনুভূতিগ্রাহক পথই সেরিব্রাল কর্টেক্সে যাওয়ার পথে থ্যালামাসের মধ্যে দিয়ে যায়। সেজন্যই থ্যালামাস সেনসরি অনুভূতিগ্রাহক পথগুলি থেকে যাবতীয় সেনসরি তথ্য গ্রহণ করে, সেই তথ্যগুলি একজায়গায় জড় করে সেগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে এবং তারপর পরবর্তী স্তরের প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও অনুধাবন ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে সেই তথ্যগুলিকে সেরিব্রাল কর্টেক্সে প্রেরণ করে।

সেনসরি নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও সেরিব্রাল কর্টেক্সের মুখ্য মোটর ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রগুলির সঙ্গেও থ্যালামাস কাজের দিকে থেকে আন্তর্সম্পর্কিত। সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে উদ্ভূত মোটর সংবেদনগুলি প্রকাশ করা এবং সেগুলির পথ সুগম করার কাজও করে এই থ্যালামাস। বেশ কিছু গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে[৭] যে, থ্যালামাস অংশে কোনোরকম আঘাত বা ক্ষতির ফলে নানারকমের বাক্‌বিকার বা অ্যাফেজিয়া হতে পারে। ফলে, এ থেকে তাঁরা অনুমান করেন, ভাষিক সংবেদনা পরিবহনেও থ্যালামাস অংশের পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে।

হাইপোথ্যালামাসের অবস্থান থ্যালামাসের ঠিক নীচে। এই হাইপোথ্যালামাসই মস্তিষ্কের তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের পার্শ্বীয় দেয়ালটির তল এবং নীচের অংশ গঠন করে। মস্তিষ্কের নীচের দিক থেকে খেয়াল করলে হাইপোথ্যালামাসের উপাদানগুলিকেও দেখতে পাওয়া যায়। হাইপোথ্যালামাস মূলত গঠিত হয়েছে টিউবার সিনেরিয়াম, অপটিক কায়াজ়মা, দুটি ম্যামিলারি বডি এবং ইনফান্ডিবুলাম নিয়ে। ম্যামিলারি বডি, অপটিক কায়াজ়মা এবং অপটিক নালিগুলির অগ্রভাগ দিয়ে সীমাবদ্ধ এলাকাটিকেই টিউবার সিনেরিয়াম বলা হয়। পিট্যুইটারি গ্রন্থির পশ্চাৎভাগ আবার যুক্ত হয়ে থাকে ইনফান্ডিবুলামের সঙ্গে। এই ইনফান্ডিবুলাম একটি নালিকাকার অংশ, যেটি উৎপন্ন হয় টিউবার সিনেরিয়ামের সামান্য ফোলা অংশটি থেকে। এই একটু ফুলে থাকা অংশটির নাম মধ্য এমিনেন্স। এই মধ্য এমিনেন্স, ইনফান্ডিবুলাম এবং পিট্যুইটারি গ্রন্থির পশ্চাৎ লোব—এই তিনটি অংশ নিয়ে তৈরি হয় পিট্যুইটারি গ্রন্থির পিছনের দিকটি, যাকে নিউরোহাইপোফাইসিস বলা হয়। টিউবার সিনেরিয়ামের ঠিক পিছনেই দুটি ছোটো অর্ধবৃত্তাকার অংশ নিয়ে তৈরি হয় পাশাপাশি থাকা দুটি ম্যামিলারি বডি। হাইপোথ্যালামাসের কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণ করে এই ম্যামিলারি বডির নিউক্লিয়াস। অপটিক নার্ভের নার্ভতন্তুগুলির ওপরে আড়াআড়ি থেকে একটি ক্রসের মতো অংশ তৈরি করে অপটিক কায়াজমা।

স্বাভাবিক মানুষের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের এই বিশেষ অঞ্চলগুলিই মূলত সক্রিয় অঞ্চল হিসেবে কাজ করে। তবে, কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে, কোনো রোগ বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে মস্তিষ্কের ভাষা অঞ্চলের

কোনো সমস্যা দেখা দিলে ভাষা অর্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা যায়। সেই বিশেষ ক্ষেত্রগুলির আলোচনা করা হল চতুর্থ অধ্যায়ে।

সূত্রনির্দেশ

---

[১] Cowan, W M & Kandel, E R. 'A Brief History of Synapses and Synaptic Transmission'. In: Cowan, W M & Sudhof, T C & Stevens, C F & Davies, K (Ed.). *Synapses.* Baltimore. John Hopkins University Press. 2002. p. 76

[২] Swanson, N & Swanson, L W. Preface. In: Cajal, S R Y (Ed.). *Histology of the Nervous System of Man and Vertebrates. Vol. 1.* United Kingdom. Oxford University Press. 1995. P. 35

[৩] Newsome, M & Jusczyk, P W. 'Do Infants use Stress as a Cue?'. In: MacLaughlin, D & Mcewen, S (Ed.). *Proceedings of the 19th Annual boston University Conference on Language Development.* Vol. 2. Somerville. Cascadilla Press. 1995. P. 415-426

[৪] Kuhl, P K. Perception, 'Cognition and the Ontogenetic and Phylogenic Emergence of Human Speech'. In: S, Brauth & W, hall & R, dooling (Ed.). *Plasticity of Development.* Cambridge. Bradford Books. 1991. P 39

[৫]Goodman, J C & Nusbaum, H C (Ed.). *The development of Speech Perception: Transitions from Speech Sounds to spoken words.* Cambridge. MIT Press. 1994. P 57

[৬] O' Grady, W. *Principles of Grammar Learning.* Chicago. University of Chicago Press. 1987. P 49

[৭] Benedict, H. 'Early Lexical Development: Comprehension & Production'. *Journal of Child language, 6.* Cambridge University Press. 1979. P 183

[৭] Gottieb, G. *Individual Development and evolution: The genesis of Novel Behaviour.* United Kingdom. Oxford university Press. 1992. P 79

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়া ও তার সমীক্ষা সংক্রান্ত পদ্ধতি

৩. প্রথম ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়া ও তার সমীক্ষা সংক্রান্ত পদ্ধতি

৩.১. শিশুর বচন, তা সম্পর্কিত বোধ ও চিন্তন প্রক্রিয়া

৩.১.১. ভাষা বোঝা, ভাষা উচ্চারণ ও ভাষাজ্ঞান: পারস্পরিক নির্ভরতা

ভাষা শেখার সময়, মানবশিশু কথা বলতে পারার আগেই কথা বুঝতে পারে। খুব ব্যতিক্রমী কোনো শব্দ বা বাক্যাংশের কথা বাদ দিলে, শিশু যতক্ষণ না তার চারপাশের বড়োদের বলা শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্যের অর্থ বুঝতে শেখে, ততক্ষণ সে অর্থপূর্ণভাবে শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার করতে পারে না। বাচ্চাদের প্রথমদিকের আধো বুলির মধ্যে তাই বিচ্ছিন্নভাবে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ উঠে এলেও, তারা যে আসলে গোটা একটি ভাবকেই প্রকাশ করতে চাইছে, তা বোঝা যায়। যেমন—'খাওয়া না', 'খেলা দাও', 'ধরব' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ আসলে 'আমি এখন খাব না', 'এখন আমায় খেলনাটা দাও' কিংবা 'আমি পাখিটা ধরতে চাই' ইত্যাদি বাক্যের পরিপূরক হিসেবেই সে ব্যবহার করতে থাকে। অর্থাৎ, বড়োদের কথা বলার ধরন থেকে সে ততক্ষণে আস্ত এক-একটি ভাবকে কীভাবে প্রকাশ করতে হয়, সেই ধারণা পেয়েছে, তবেই সে অসম্পূর্ণ শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশ প্রয়োগ করে সেই ধারণাটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। যে ভাষা শিশুটি শিখবে, সেই ভাষা পরিবেশের সংস্পর্শে আসাটা তার শেখার প্রথম শর্ত। আর সেইসঙ্গে, অতি অবশ্যই, ভাষা পরিবেশ থেকে সে যেসব বস্তু, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে শুনছে, সেগুলি তার অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা পড়াটাও জরুরি। কোনো বস্তু বা বিষয় তার দেখাশোনার জগতে যদি ধরা না পড়ে, তাহলে সেই বস্তু বা বিষয় সম্পর্কিত কথা তার সামনে যতবারই উচ্চারণ করা হোক না কেন, শিশুটি কখনওই সেই বস্তু বা বিষয়কে সার্থকভাবে নিজের বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে না। কারণ সেই সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই তৈরি হয়নি। যেমন, একটি বাচ্চার সামনে 'গাড়ি' শব্দটি যতবারই উচ্চারণ করা হোক না কেন, যতক্ষণ না কোনো একটি খেলনা গাড়ির মাধ্যমে হোক, কিংবা তার চারপাশের বড়োদের অঙ্গভঙ্গি, অথবা একেবারে সত্যি গাড়ি দেখিয়ে তার সামনে 'গাড়ি' শব্দটি উচ্চারণ করা হচ্ছে, ততক্ষণ কিন্তু সে 'গাড়ি' শব্দটি শুনেও, শব্দটির প্রয়োগ ঘটাতে পারবে না। আসলে যে-কোনো শব্দের যে ধ্বনিগত রূপ, তা যতক্ষণ না তার কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গ বহন করে আনতে না পারছে, ততক্ষণ সেই ধ্বনিগত রূপ তার কাছে এতটাই বিমূর্ত যে, শিশু সেই ধ্বনিগুচ্ছের অর্থ অনুধাবন করতে পারে না, তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ করতেও অক্ষম হয়। অর্থাৎ, শব্দের অর্থ তার কাছে অনুষঙ্গবাহী হতে হবে।

একথা ঠিক যে, পরিস্থিতি বুঝে যথাস্থানে যথার্থ ধ্বনিগুচ্ছ বা শব্দগুচ্ছ ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারাটা শিশুর ভাষাজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট বড়ো প্রমাণ। কিন্তু, মজার কথা হল, এর উলটোটা সত্যি নয়। অর্থাৎ, শিশুটি যদি কথা বলে উঠতে না পারে, তার মানেই ধরে নেওয়া যায় না যে, শিশুটির ভাষাজ্ঞান হয়নি। কথা বলার ক্ষেত্রে শারীরিক কোনো সমস্যা জন্মাবধি থাকলে, বা বাক্‌বিকারের শিকার হলে বহুক্ষেত্রেই শিশুর কথা বলার ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু শ্রবণশক্তি অব্যাহত থাকলে সেই শিশু তার চারপাশের সব ভাষিক

প্রকাশভঙ্গিকেই একটু একটু করে চিনে নিতে পারে, বুঝতে পারে, অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সাড়াও দেয়। তবে, সেই বাগ্‌ভঙ্গি শুনে শিখে নিলেও তা নিজে প্রকাশ করে উঠতে পারে না। সেরিব্রাল পলসি বা অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে বাক্‌প্রয়াসে এই ধরনের সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, নিজে কথা বলতে পারা বা বাক্‌প্রয়াস ছাড়াও ভাষাশিক্ষা সম্ভব, কিন্তু কথা বুঝতে না পারলে, ভাষাশিক্ষা সম্ভব নয়। শব্দ বা বাক্যের অর্থ বোঝার মাধ্যমে যদি শিশুর ভাষাশিক্ষার অবকাশ তৈরি হয়, তাহলে সেইসব শিশু খুব অল্প ক্ষেত্রেই ক্বচিৎ কদাচিৎ বাক্‌প্রয়াসে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও, কথা বলার অনেক আগেই যে শিশুর ভাষাজ্ঞান তৈরি হতে থাকে, তার কার্যকর প্রমাণও পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রেই অভিভাবকরা লক্ষ করেছেন যে, শিশুরা নিজে যে বাক্যগুচ্ছ, ধ্বনিগুচ্ছ বা শব্দগুচ্ছ বলছে, তার চেয়ে অনেক জটিল বাক্যের উত্তরে তারা সাড়া দিতে পারছে। এমনকি, শুধু অভিভাবকদের স্মৃতিনির্ভর মতামতের ওপরে ভিত্তি না করে, শিশুদের কথা বলা এবং কথা বোঝার পরস্পর তুলনা প্রতিষ্ঠার নিরিখে হওয়া গবেষণালব্ধ ফলাফলভিত্তিক প্রমাণও এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। এই গবেষণাগুলির পর্যবেক্ষণজাত সিদ্ধান্ত এই মতকেই প্রতিষ্ঠা করে যে, কথা বলার স্তরের তুলনায় কথা বোঝার স্তর আগে আসে। ১৯৭৪ সালে, বিজ্ঞানী জেনেলেন হাটেনলচার একটি বিশেষ পরীক্ষা চালান কয়েকটি শিশুর ওপরে এবং সেই পরীক্ষায় শিশুগুলির কথা বলার দক্ষতার তুলনায় কথা বোঝার দক্ষতা যে অনেক বেশি, তা খুব স্পষ্টভাবেই উঠে এসেছিল।[১] হাটেনলচার বেশ কয়েকটি জিনিস শিশুগুলির সামনে ছড়িয়ে রাখেন, যেগুলির নাম তারা আগে শুনেছে এবং জিনিসগুলি তারা দেখেওছে, কিন্তু সেই জিনিসগুলির নাম তখনও তারা বলতে শেখেনি। তিনি যতবার আলটপকা বিভিন্ন জিনিসের নাম বলে শিশুগুলির দিকে জিজ্ঞাসা ছুড়ে দিচ্ছিলেন, ততবারই কিন্তু প্রত্যেকটি শিশুই একেবারে নির্ভুলভাবে জিনিসগুলি শনাক্ত করতে পেরেছিল। এমনকি, তিনি যখন তাদেরকে বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছিলেন, তখন খুব সচেতনভাবেই, যেসব শব্দ তারা বলতে পারে না, সেইরকম বেশ কিছু শব্দ ব্যবহার করে নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিশুগুলি কিন্তু সেই নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথ প্রতিক্রিয়া দিতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর পরীক্ষায় উঠে আসা প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে একটি শিশুর ঘটনা এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তখনও সেই শিশুটি কথা বলতে শেখেনি। অথচ তাকে যখন ‘তোমার বোতল’ বলে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে স্পষ্ট ইশারায় নিজের দুধের বোতল দেখিয়ে দিয়েছিল, আবার যখন তাকে ‘দিদির বোতল’ বলা হল, তখনও নির্ভুলভাবে তার দিদির দুধের বোতলটিও দেখাতে পেরেছিল। ১৯৭৬ সালে স্যাচস এবং ট্রাসওয়েল-ও এইরকম একটি পরীক্ষা করেন[২] এবং দেখান যে, যেসব বাচ্চা সবে এক-আধটা শব্দ কোনোমতে উচ্চারণ করতে শিখেছে, তারাও কিন্তু অনায়াসে একটু বড়ো বাক্যের অর্থ বুঝতে পারছে এবং সেই অনুযায়ী সাড়া দিচ্ছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ভাষাশিক্ষার বিষয়টি ভাষা বোঝার ওপরে অনেক বেশি নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও, এ নিয়ে গবেষণা এখনও যথেষ্ট অপ্রতুল। শিশুর ভাষা অর্জন সংক্রান্ত বেশিরভাগ গবেষণাই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে শিশুর কথা বলতে শেখা নিয়ে, কথা বুঝতে শেখা নিয়ে এই গবেষণাগুলিতে বিশেষ বাক্যব্যয় করাই হয়নি। এর একটা বড়ো কারণ সম্ভবত এই যে, শিশুর কথা বলতে শেখার বিষয়টি একটি সরাসরি পরিমাপযোগ্য প্রক্রিয়া।

যে-কোনো ভাষিক প্রকাশকে অনেক সহজে রেকর্ড করা যায়, চিহ্নিত করা যায়, কানে শুনে ভাষিক প্রয়োগের ছোটোখাটো পার্থক্য বুঝতে পারা যায়, তাকে লিপিবদ্ধ করে দেখানোও যায়। কিন্তু, শিশু ভাষা বুঝতে পারছে কিনা, তাকে ধরতে পারা যায় একমাত্র ভাষিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার ব্যবহারগত পরিবর্তন কেমন হচ্ছে, তা দিয়ে। ফলত, সেই ভাষিক প্রতিক্রিয়া শিশুর বোধগম্য হচ্ছে কি না, তা বুঝতে হলে পরীক্ষাকারীকে সবসময়েই এমন পদ্ধতির ওপরে নির্ভর করতে হয়, যার কোনোটাই প্রত্যক্ষ পদ্ধতি নয়—যেমন, শিশুটিকে কোনো একটি কাজ ('টাস্ক' হিসেবে) করতে বলে, শিশুটি কীভাবে সেই কাজ সম্পাদন করছে, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া এক্ষেত্রে গতি নেই। এত ছোটো শিশুদের নিয়ে এই পরীক্ষানিরীক্ষা করার সময় স্বাভাবিকভাবেই তাদের খামখেয়াল, তাদের মেজাজ, অপরিচিত কারোর সামনে নিজেকে মেলে ধরার ক্ষেত্রে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য— এইসব কারণে বহুক্ষেত্রেই তার কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপাদান সংগ্রহ করাটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

বেলুজি এবং ব্রাউন ১৯৬৪ সালে তাঁদের রিপোর্টে[৩] এইরকম একটি অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছিলেন। সেখানে অ্যাডাম নামে একটি শিশুর কথা রয়েছে, যে বেশিরভাগ সময়েই পরীক্ষকের কোনো প্রশ্নেরই ঠিকমতো উত্তর দিতে চাইত না। প্রাথমিকভাবে পরীক্ষক এমন সিদ্ধান্তেও এসেছিলেন যে, শিশুটির ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে হয়তো এমন কিছু গাফিলতি রয়ে গেছে যে, সে সমস্ত নির্দেশ ঠিকমতো অনুসরণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। প্রথম দু-দিন তাকে দিয়ে নির্দিষ্ট ছকে কথা বলানোর চেষ্টা করে পরীক্ষক বিফল হন। কিছুতেই তাঁর প্রদর্শিত পথে, তাঁর নির্দেশের প্রতিক্রিয়ায় শিশুটি যথাযথভাবে সাড়া দিচ্ছিল না। বহুক্ষেত্রেই অসংলগ্ন উত্তর, কিংবা প্রশ্নের সঙ্গে কোনো সম্পর্কেই আসে না এমন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া পেয়ে আদৌ তার ভাষা বোঝার ক্ষমতা হয়েছে কি না, সে-বিষয়েই পরীক্ষকরা সন্দিহান হয়ে পড়েন। ঘটনাচক্রে, তৃতীয় দিন কিন্তু শিশুটি পরীক্ষকদের রীতিমতো অবাক করে দিয়ে, তাঁদের প্রায় সব প্রশ্নের উত্তর দেয়, তাকে যা যা করতে বলা হয়, সবকটি কাজই করে দেখায়। পরীক্ষকরা এই ঘটনাটিকে শিশুর খামখেয়ালের অন্যতম ফল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৩.১.২. অর্থ ও অনুষঙ্গের সম্পর্ক

আগের অংশেই উল্লেখ করা হয়েছে, যে-কোনো বাগ্‌ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ শিশুর কানে ধরা পড়ামাত্রেই কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, শিশুর কাছে সেই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ তাৎপর্যবাহী। ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কোনো বস্তু, ঘটনা বা পরিস্থিতির অনুষঙ্গ যুক্ত না হলে শিশু সেই ধ্বনির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যেসব ক্ষেত্রে ভাষাশিক্ষা কিছুটা অগ্রসর হয়েছে, সেক্ষেত্রে অবশ্য কোনো একটি শব্দের অর্থ বোঝানোর জন্য অন্য শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে মূল শব্দটির বর্ণনা দেওয়া যায়। যদিও, এই বর্ণনামূলক শব্দগুলিও আদতে ওই মূল সব্দের সঙ্গে জড়িত অনুষঙ্গটিকেই বাগ্‌ধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশ করে। অর্থাৎ, শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অনুষঙ্গ দু-ক্ষেত্রেই আসছে। প্রথম ক্ষেত্রটিতে অনুষঙ্গের ব্যবহার হচ্ছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ আসছে পরোক্ষে। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে ভাষাশিক্ষা কখনওই সম্ভব নয়। এইজন্যই, একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে

পর্যবেক্ষণযোগ্য বস্তুর বদলে 'ভাবনা', 'আগ্রহ', 'বুদ্ধি' ইত্যাদি বিমূর্ত ধারণা দিয়ে শেখা শুরু হতে পারে না। বাগ্‌ধ্বনির যে-কোনো অর্থবহ বিন্যাস দিয়ে যে শব্দ তৈরি হয়, তার অর্থ বোঝাতে গেলে সেই শব্দটি বাদ দিয়ে অন্য যে-কোনো শব্দগত অথবা বস্তুগত/বিষয়গত শব্দ বা শব্দাবলির মাধ্যমে সেই অর্থ বোঝাতে হয়— ভাষা দিয়ে জগৎকে চেনার এবং শেখার এই হল মূল সূত্র।

এখন প্রশ্ন হল, এক-একটি শব্দ বা ধ্বনিগুচ্ছের অর্থ বুঝতে গেল কেন এই অনুষঙ্গের প্রয়োজন হয়। আসলে, শব্দের সঙ্গে অনুষঙ্গের কোনো প্রত্যক্ষ কার্যকারণ যোগাযোগ নেই। একটি শব্দের মাধ্যমে যে বস্তু, বিষয়, ঘটনা বা পরিস্থিতিকে বোঝানো হচ্ছে, তার সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক নেহাতই আপতিক। একটি শিশু যখন দেখা, ছোঁয়া, স্বাদ নেওয়া প্রভৃতি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ওই বস্তু বা বিষয়টিকে চিনছে, সেটি তার একটি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা; আবার, সে যখন শব্দের আকারে ওই বস্তু বা বিষয়টির নাম শুনছে, সেই শোনার অভিজ্ঞতাও একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। তার হাতে যদি একটা পুতুল দেওয়া হয়, তাহলে সেই পুতুলটি দেখে, ছুঁয়ে অনুভব করাটা একটা আলাদা অভিজ্ঞতা, আবার ওই বস্তুটিকে যে 'পুতুল' নামে অভিহিত করা যায়, সেই শব্দ শোনার অভিজ্ঞতাও তার কাছে পৃথক। বস্তুটিকে 'পুতুল' বলা হোক, বা 'খেলনা' বলা হোক, বা অন্য যে-কোনো নামেই ডাকা হোক না কেন, ওই বস্তুটির সম্পর্কে শিশুর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার সঙ্গে সেই নামটির সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। সেজন্যই বিচ্ছিন্নভাবে এই শোনার অভিজ্ঞতা আর অনুষঙ্গের অভিজ্ঞতা তার কাছে হাজির হলে সে কখনওই এ-দুয়ের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারে না। এই সম্পর্কটিকেই নির্ধারণ করে দেয় অনুষঙ্গ। অর্থাৎ, তার হাতে পুতুলটি দিয়ে যদি 'পুতুল' শব্দটি উচ্চারণ করা হয়, একমাত্র তখনই সে পুতুল দেখা আর শব্দটি শোনা—এই দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা সংযোগ তৈরি করতে পারবে।

শুধু শব্দ নয়, বাক্যের গঠন সংক্রান্ত ধারণা লাভের ক্ষেত্রেও এই একই অনুষঙ্গের তত্ত্ব খাটে। 'বেড়ালছানাটা মাছ খাচ্ছে'—এই বাক্যটি যখন শিশুটির সামনে বলা হয়, তখন সে যদি আলাদা আলাদাভাবে 'বেড়ালছানা', 'মাছ' আর খাওয়া—এই তিনটি শব্দেরই অর্থ বোঝে, তবুও শুধুমাত্র সেই বিচ্ছিন্ন অর্থ তিনটিকে জুড়ে এই বাক্যটির অর্থ দাঁড় করানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, শব্দগুলির বিচ্ছিন্ন অর্থ সম্পর্কিত জ্ঞানের মধ্যে কোথাও কে খাচ্ছে আর কোন্ জিনিসটাকে খাওয়া হচ্ছে, সেই সংক্রান্ত ধারণা দেওয়া নেই। যে খাচ্ছে, এই বাক্যে তার অবস্থান যে বাক্যের গোড়ায় আর যাকে খাওয়া হচ্ছে, তার অবস্থান যে বাক্যের মাঝে, এই বাক্যবিন্যাসের যুক্তিক্রম তখনও জানে না বলেই, শুধু বাক্য শুনে সে তার মানে বুঝতে পারবে না। এই বাক্যের অর্থ বুঝতে গেলে শিশুটিকে চোখের সামনে ঘটনাটি ঘটতে দেখতে হবে। ঘটনাটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে যখন শিশু এই বাক্যটি শুনবে, একমাত্র তখনই বাংলা বাক্যের এই কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার বিন্যাসকে সে মিলিয়ে দেখে নিতে পারবে সামনে ঘটা ঘটনাটির সঙ্গে। সে দেখবে, যে খাচ্ছে, সে 'বেড়ালছানা' এবং বাক্যে তার অবস্থান শুরুতে। আবার যাকে খাওয়া হচ্ছে, সেটাকেই সে 'মাছ' বলে চিনে এসেছে এবং বাক্যে এই শব্দটির জায়গা হচ্ছে মাঝখানে। ফলে, বাক্যমধ্যস্থ পদের অবস্থান দিয়ে সেই বাক্যের অর্থ সম্পর্কে ধারণা করা শিশুর পক্ষে সম্ভব

হবে। এই একই যুক্তিতে, আরও আরও বাক্য শোনার অভ্যেসে সে ক্রমশ সেই সমস্ত বাক্যের অর্থও অনুধাবন করতে পারবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর, কোনো বাহ্যিক অনুষঙ্গ ছাড়াই, শুধু এই বাক্যবিন্যাসের যুক্তিটি মাথায় রেখেই শিশুর পক্ষে বাক্যের অর্থ বুঝে নিতে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

৩.১.৩. মস্তিষ্ক, চিন্তা এবং ভাষার বিকাশ

বিখ্যাত বিজ্ঞানী এরিক লেনেবার্গ অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী তত্ত্বগুলিকে একেবারে খারিজ করে দাবি করেছিলেন, ভাষাশিক্ষার বিকাশ নির্ভর করে মস্তিষ্কের পরিণতির ওপরে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে অনুষঙ্গের মাধ্যমে শব্দের সঙ্গে অর্থের যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার কথা বলা হল, তার সঙ্গে লেনেবার্গের তত্ত্বের কিন্তু কোনো বিরোধ নেই। বরং, বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, মস্তিষ্ক পরিণত না হলে কোনো বিষয়ে ধারণা করার ক্ষমতা বা চিন্তাশক্তির বিকাশ হয় না, আর ভাষাবোধের জন্য এই চিন্তা করতে পারার ক্ষমতা অত্যন্ত জরুরি। লেনেবার্গ অবশ্য চমস্কির ভাষা অর্জনের তত্ত্ব মানেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাষা অর্জনের ক্ষমতা সহজাত নয়। ভাষা রপ্ত করার ক্ষেত্রে জিনের ভূমিকার কথা প্রায় সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়ে লেনেবার্গ বলেছিলেন, পাটীগণিত কিংবা বীজগণিত শিখতে জিনের যতটুকু সহায়তা দরকার হয়, তার চেয়ে বেশি সহায়তা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে কখনওই দরকার পড়ে না।[৪] যদিও, ভাষাশেখার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা কতটা এ নিয়ে প্রচুর তর্ক রয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের মত হল, মস্তিষ্কের যাবতীয় প্রাথমিক উপাদান নিয়েই মানবশিশু জন্মায় এবং সেই সঙ্গে ভাষা শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্ষমতা বা ফাংশনগুলিও প্রথমাবধিই তার মস্তিষ্কে উপস্থিত থাকে। ভাষাবোধকে মস্তিষ্কের বিকাশের ওপরে নির্ভরশীল না বলে, তাঁরা বললেন, মস্তিষ্কের বিকাশও পরোক্ষে ভাষা শেখার ওপরে নির্ভর করে। নতুন শেখা বিষয়গুলি পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলেই মস্তিষ্ক বিকশিত হয়। অর্থাৎ, বৌদ্ধিক বিকাশ ও মস্তিষ্কের বিকাশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ফলেই চূড়ান্ত বৌদ্ধিক বিকাশের পথ খুলে যায় এবং এই বৌদ্ধিক বিকাশই আবার মস্তিষ্কের চূড়ান্ত বিকাশের পথ প্রশস্ত করে। বিকাশের এই পদ্ধতিটি একে অন্যকে প্রভাবিত করে চলে, কিন্তু কিছুতেই কোনো একটিকে অপরটির নিয়ামক হিসেবে দাবি করা যায় না। বরং, মস্তিষ্কে প্রতিনিয়ত প্রবিষ্ট হওয়া নতুন তথ্যের সম্ভার নতুন নতুন নিউরোন সংযোগ তৈরি করতে থাকে, কোশদেহের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। লেনেবার্গ যে একচেটিয়াভাবে মস্তিষ্কের বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা দাবি করলেন, তার বিরোধিতা করে তাঁরা ভাষা ও মস্তিষ্কের একটি পরস্পর নির্ভরশীল মডেলের তত্ত্ব প্রস্তাব করলেন— ভাষার বিকাশে এই তত্ত্বকেই ইন্টারঅ্যাকশনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়।

ঘটনাচক্রে, লেনেবার্গ নিজের মতের পক্ষে যে পরীক্ষালব্ধ পর্যবেক্ষণগুলিকে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে চেয়েছিলেন, সেই পর্যবেক্ষণগুলিকেই আবার তাঁর বিরুদ্ধ মতের প্রমাণ হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মস্তিষ্কের বিকাশের ওপরে ভাষার বিকাশের নির্ভরতা বোঝাতে গিয়ে লেনেবার্গ বলেছিলেন, দল গঠন করতে পারা, একশাব্দিক উচ্চারণ করতে পারা, দ্বিশাব্দিক উচ্চারণ করতে পারা প্রভৃতির ওপরে

ভীষণভাবে নির্ভরশীল হল দাঁড়ানো, বসা, হাঁটা প্রভৃতি মোটর দক্ষতার বিকাশ। লেনেবার্গ বলতে চেয়েছিলেন এই মোটর দক্ষতা আর ভাষার বিকাশের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই ভাষা ও মস্তিষ্কবিকাশের সূত্রটি নিবদ্ধ। কিন্তু লেনেবার্গের এই ধারণার সমর্থনে কোনো বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ মেলে না। নিশ্চিতভাবেই, কথা বলার প্রাথমিক দক্ষতাগুলি অর্জন করার সঙ্গে মোটর দক্ষতার বিকাশের ভূমিকা থাকতে বাধ্য, কারণ কথা বলা বা ধ্বনি উচ্চারণের প্রাথমিক প্রচেষ্টাটির মধ্যেই মোটর দক্ষতা রয়েছে। ধ্বনি গঠন করতে শেখা, মুখ, জিভ, ঠোঁট, ভোকাল কর্ড ব্যবহার করে উচ্চারণ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখার মধ্যেই মোটর দক্ষতার অন্যতম পরিচয়। কিন্তু, প্রাথমিক পর্যায়ে মস্তিষ্কের বিকাশ কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সমান্তরাল একটি প্রক্রিয়া। একটি শিশু অর্থপূর্ণ ও তুলনামূলক কঠিন একশাব্দিক প্রকাশ, দ্বিশাব্দিক প্রয়োগ, বা বহুশব্দের সমন্বয় তার উচ্চারণে সার্থকভাবে নিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছে কিনা, সেই ক্ষমতা অর্জনের বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে মোটর স্কিল গড়ে ওঠার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।

তবে বহুক্ষেত্রে শিশুদের শব্দ বলতে শেখার স্তরকে ঘিরে একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে, যার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত মেলেনি। দেখা গেছে, একশাব্দিক স্তরে পর্যবেক্ষণাধীন শিশুটি হয়তো 'ওই', 'যে' এইরকম দুটি শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু 'ওই যে' এই জাতীয় দ্বিশাব্দিক গঠন সে কোনোভাবেই আয়ত্ত করতে পারছে না। অথচ সে কিন্তু এই ধরনের শব্দের উচ্চারণ চিনতে পারছে, বুঝতে পারছে এবং এই জাতীয় দুটো শব্দকে একসঙ্গে জুড়ে বললে, 'ওইযে' ধরনের উচ্চারণ সে করে ফেলতেও পারছে। অথচ আলাদা আলাদা শব্দ হিসেবে এই দুটিকে সে পাশাপাশি রেখে প্রয়োগ করতে পারছে না। সাধারণত একশাব্দিক স্তর আর দ্বিশাব্দিক স্তরের মধ্যবর্তী সময়ে এই ধরনের কিছু ছেদ পর্যায় (lag) থাকেই। কিন্তু উচ্চারণের শারীরবৃত্তীয় কাজটুকু করার জন্য যে মোটর স্কিল প্রয়োজন, তার কোনো অভাবজনিত কারণে যে এই ছেদ পর্যায় তৈরি হয়, বা মোটর স্কিলের আয়ত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে এই ছেদ পর্যায় কমে আসতে পারে, এমন কোনো প্রমাণ পরীক্ষায় মেলেনি।

গবেষকের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণসূত্রে বলা যায়, এই ছেদ পর্যায় আদৌ মস্তিষ্কের বিকাশের ওপরে নির্ভরশীল নয়। বরং, কোনো একটি ভাবনাকে প্রকাশ করার জন্য কতটুকু শব্দ একবারে বলা দরকার, শিশুর সেই সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার অভাবই এই ধরনের ছেদ পর্যায়ের জন্ম দেয়। 'বল খেলব' কথাটি বোঝানোর জন্য প্রাথমিকভাবে তাদের কাছে 'বল' শব্দটি বলাই যথেষ্ট বলে মনে হয়। তার চারপাশের পরিণত মানুষদের পক্ষে যে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা আপনা থেকেই বুঝতে পারা সম্ভব নয়, এই বোধ তাদের তখনও গড়েই ওঠে না। ক্রমশ তার চারপাশে থাকা পরিণত মানুষদের প্রতিক্রিয়া থেকে তারা যখন খেয়াল করতে পারে যে, তাদের অনুভূতি বা চাহিদা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আরও কিছু ভাষিক সংকেত ব্যবহার করা দরকার, তখন সেই প্রয়োজনীয়তার প্রণোদনাতেই তারা ক্রমশ জটিল ভাষিক অভিব্যক্তির দিকে ঝোঁকে। সুতরাং, বলা যেতে পারে, নিজেকে প্রকাশ করার চাহিদাই তাদেরকে ভাষার সরল থেকে জটিলতর রূপে যেতে বাধ্য করে।

৩.১.৪. সহজাত বোধ, বুদ্ধি এবং স্কিমা

চিন্তন প্রক্রিয়াকে ভাষা অর্জনের ওপরে নির্ভর না করা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবেই যদি শেষপর্যন্ত ধরে নিতে হয়, তাহলে একটা প্রশ্ন অবশ্যই উঠে আসে, চিন্তন প্রক্রিয়ার মূল উৎস কী। জন্মের পর এক থেকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ভাষাপ্রয়াসের মধ্যে বেশ জটিল কয়েকটি ধারণার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। যেমন, শিশুরা যখন বলে, 'লাল গাড়ি' তখন সে 'গাড়ি' বস্তুটির গুণগত বৈশিষ্ট্য (attribute) হিসেবে 'লাল' শব্দটি ব্যবহার করছে। যখন সে বলছে, 'বাবা জামা', তখন সে 'জামা' বস্তুটির সঙ্গে 'বাবা'-র সম্বন্ধ নির্দেশ করছে, অর্থাৎ সম্বন্ধসূচক সম্পর্কে বেঁধে ফেলছে এই শব্দ দুটিকে। একইভাবে, যখন শিশু বলছে, 'মা যাব', সে আসলে 'যাওয়া' কাজটির লক্ষ্য হিসেবে 'মা'-কে বোঝাতে চাইছে, তার কাজের কারণ হিসেবে 'মা'-কে সে চিহ্নিত করছে। যেহেতু ভাষা নিজে থেকে এই বস্তু, বিষয়, কর্ম, সম্বন্ধ, আধার, লক্ষ্য, কারণ, ক্রিয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত ধারণা শিশুকে সরবরাহ করে উঠতে পারে না, সেক্ষেত্রে শিশু ঠিক কোথা থেকে এই ধারণাগুলি অর্জন করছে, তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। অবশ্যই, এর জন্য তার সঙ্গে তার চারপাশের পরিণত ভাষীদের যোগাযোগ ও আদানপ্রদান প্রয়োজন। কিন্তু, এ ছাড়াও প্রশ্ন ওঠে, বস্তুজগতের কোনোরকম প্রভাব বা 'physical stimuli' ছাড়া প্রথম থেকেই কি শিশুর মনে এই জাতীয় মূল ধারণাগুলি কোনোভাবে রয়ে যায়? অর্থাৎ, প্রাথমিকভাবে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী (rationalist) মতবাদের প্রবক্তারা এবং পরবর্তীকালে চমস্কি যাকে ভাষা ব্যবহারের সহজাত (innate) ক্ষমতা বলে চিহ্নিত করছেন, ভাষিক উপাদানের ব্যবহার সম্পর্কিত বিধি আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে শিশুর এই জাতীয় কোনো ক্ষমতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে কিনা, সে প্রশ্ন ওঠে। আবার, একথাও কেউ কেউ বলেছেন যে, এই ব্যবহারবিধি সম্পূর্ণতই শিশুর অভিজ্ঞতালব্ধ বোধ থেকে অর্জিত এবং অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী পর্যায়ে ভাষাবোধ তৈরি হওয়ার মতো কোনো মানসিক প্রক্রিয়াই ক্রিয়াশীল থাকে না, সুপ্ত বা সক্রিয় অবস্থাতেও নয়। মূলত এই দাবি যাঁদের, তাঁরা ভাষা অর্জনের অভিজ্ঞতাবাদী (empiricist) মতামতে বিশ্বাস করেন। ব্যবহারবাদীরা যে অর্থে প্রয়োগ করেন, এখানে অভিজ্ঞতাবাদী বলতে অবশ্য সেই অর্থটি প্রযুক্ত হয়নি। বরং, মেন্টালিস্ট দার্শনিক যে প্রস্থানটি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতকে লক এবং উনিশ শতকে জন স্টুয়ার্ট মিলের হাত ধরে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল, এখানে সেই ধারাটিকে লক্ষ্য করেই অভিজ্ঞতাবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে।

ভাষাবোধ আদৌ সহজাত হতে পারে কিনা, এই নিয়ে যুক্তিবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ তো আছেই, উপরন্তু এই বোধ কতদূর সহজাত হওয়া সম্ভব বা সম্ভব নয়, তাই নিয়ে এঁদের নিজেদের মধ্যেও প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। যুক্তিবাদীরা যেমন এই প্রশ্নে বারবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছেন যে, ভাষা অর্জনের সহজাত ক্ষমতা এবং অন্যান্য বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে পারঙ্গমতা অর্জনের ক্ষমতা কি ক্ষেত্রবিশেষে পৃথকভাবে নির্দিষ্ট? ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ চমস্কি যেমন দাবি করেন, জন্মগতভাবে উপলব্ধ যে মানসিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ভাষা অর্জন সহজাত হয়, তা অবশ্যই মানুষের সহজাত গাণিতিক দক্ষতা থেকে আলাদা। এর

বিপরীতে দাঁড়িয়ে, আর-এক যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী বিভার ১৯৭০ সালে বলেন, মানবশিশুর এইসব সহজাত ধারণার প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মুক্ত এবং ধারণাগুলিও একইসঙ্গে একাধিক বৌদ্ধিক অর্জনের সাধারণ ভিত্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল। অর্থাত, মানবশিশু ঠিক যে সহজাত পারঙ্গমতার বলে ভাষা অর্জন করতে পারে, তার অঙ্ক শিখতে পারার ক্ষমতাও সেই একই পারঙ্গমতার ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে, সব যুক্তিবাদীরাই শেষপর্যন্ত একটি মতে এসে ঐক্য স্বীকার করেছেন—কোনো সহজাত ধারণাই কিন্তু ভাষা বা অন্য কোনো বৌদ্ধিক পারঙ্গমতা অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মনের মধ্যে সুপ্ত হয়ে থাকা এই সহজাত মানসিক দক্ষতাগুলিকে সক্রিয় করে তুলতে জাগতিক অভিজ্ঞতার বিভিন্ন মাত্রাগত প্রয়োগের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যদিও, কোন্ বৌদ্ধিক অর্জনের জন্য এই অভিজ্ঞতার মাত্রা ঠিক কতটা হবে, সেই পরিমাপ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত নীরব।

আবার, যাঁরা অভিজ্ঞতাবাদী, তাঁরা সবাই একবাক্যে বলতে চেয়েছেন, মানবশিশু কোনো সহজাত জ্ঞান বা বোধ নিয়ে জন্মায় না। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে, তারা কোন্ জাতীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করে, অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পরম্পরার মধ্যে কোন্ বোধ আগে এবং কোন্ বোধ তুলনামূলক পরে অর্জিত হয়, সেই বিষয়ে তাঁদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। জন লক বলেছিলেন[৫], জন্মের সময় শিশুর মনে কোনো পূর্বলব্ধ ধারণাই থাকতে পারে না। জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো নীতি, কোনো বোধ, কোনো বিধিই তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হিসেবে সুপ্ত অবস্থাতেও থাকে না। এমনকি, শেখার ইচ্ছা বা চাহিদাও সম্পূর্ণতই অভিজ্ঞতার বলে লব্ধ। পরপবর্তীকালের অভিজ্ঞতাবাদীরা এতটা কট্টরভাবে অভিজ্ঞতার পক্ষে সওয়াল করেননি। যেমন, ১৯৬৭ সালে পুটনাম বলেন[৬], জন্মগতভাবেই মানবশিশুর মনে কিছু সাধারণ বহুমুখী শিখন কৌশল (general multipurpose learning strategies) থাকে। এই কৌশলগত সহায়তা সহজাতভাবে পায় বলেই, অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়। পুটনাম মানবশিশুর বুদ্ধিকে কয়েকটি ধারণা বা বোধের সমন্বয় হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। এই ধারণা বা বোধগুলি কিন্তু কোনো জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে না। বরং, এগুলি জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে। অন্যদিকে, পিয়াজে দাবি করেছিলেন[৭], ভাষা অর্জনের মতো জ্ঞানমূলক আহরণের ক্ষেত্রে মূল সহায়ক যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি কিন্তু জন্মের পর লব্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েই তৈরি হয়। তাঁর মতে, মানবশিশু যা নিয়ে জন্মায়, তাকে অবিভাজিত স্কিমা (undifferentiated schemas) বলা যেতে পারে। এই স্কিমা থেকেই পরবর্তীকালে বুদ্ধি বিকাশ লাভ করে।

এভাবেই, একদিকে যেখানে অভিজ্ঞতাবাদীরা দাবি করছেন, এমন কোনো ধারণাই সহজাত হতে পারে না, যেখানে জ্ঞান নিহিত আকারে থাকে। এমনকি জ্ঞান অর্জনের সহায়ক কোনো বোধও যে জন্মগতভাবে থাকতে পারে, তাও তাঁরা মেনে নিতে রাজি নন। কিন্তু গবেষকের মতে, দুটি তত্ত্বের কোনোটিই সর্বতোভাবে গ্রাহ্য বা অকাট্য নয়। বস্তুত, মানবশিশুর ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণনির্ভর তথ্য দিয়েই একমাত্র বোঝা সম্ভব। কোনো নির্দিষ্ট একটি দিকনির্দেশক তত্ত্ব দিয়ে মানুষের ভাষা অর্জনের মতো জটিল প্রক্রিয়াটিকে

কখনোই এককথায় ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায় না। এই জটিল বৌদ্ধিক প্রক্রিয়াটির মধ্যে একাধিক স্তর রয়েছে। প্রত্যেকটি স্তর তার পূর্ববর্তী স্তরের ওপরে কিছুটা নির্ভরশীল, আবার একইসঙ্গে কিছুটা স্বনির্ভর। শিশুর ভাষা শেখার একটি নির্দিষ্ট অভিমুখ রয়েছে। সেই অভিমুখটি জন্মগতভাবে নির্ধারিত হতে পারে ঠিকই, কিন্তু খুব সামান্য একটি ক্ষেত্র ব্যতিরেকে তার কোনো সাধারণ মাত্রা নির্ধারণ করা যায় না। অর্থাৎ কোন্ পর্যায়ে একটি শিশু কী পরিমাণ বৌদ্ধিক অর্জনে সক্ষম হচ্ছে, সেই পরিমাণকে সমস্ত মানবশিশুর ক্ষেত্রে একটি সাধারণ মাপকাঠি হিসেবে বিচার করা যায় না। ধ্বনি শেখার ক্ষমতা, ধ্বনিগত সমন্বয় সাধন করে শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা, তার অর্থবোধের ক্ষমতা, পরবর্তী পর্যায়ে শব্দের সমন্বয় ঘটিয়ে একাধিক শব্দ সমন্বিত জটিল গঠন তৈরি করা ও বোঝার ক্ষমতা, অস্ত্যর্থক ভাব, নঞর্থক ভাব, প্রশ্নবাচক ভাব বুঝে প্রকাশ করতে পারার ক্ষমতা এই সবই তার জন্মগত অর্জন। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও এই ক্ষমতার রূপায়ণ কোন্ শিশুর ক্ষেত্রে কত দ্রুত হবে কিংবা কী পরিমাণে হবে, সেই মাপ অনেকাংশে নির্ভরশীল তার বংশগতি ও জিনের ওপরে এবং অবশ্যই, তার চারপাশের ভাষিক অভিজ্ঞতার ওপরে।

ফলে, একাধিক শিশুকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে-কোনো শিশুমাত্রেই, ভাষা অর্জনের সহজাত বোধ বা ক্ষমতা কী হতে পারে, তার একটি ন্যূনতম সাধারণ ক্ষেত্র নির্দেশ করা যেতে পারে। কিন্তু শিশুবিশেষে প্রত্যেকের ভাষিক অর্জনের যে বিশিষ্টতা রয়েছে, তাকে সাধারণ নিয়মের মধ্যে না ফেলে অনেকটাই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ফলাফল হিসেবে দেখা প্রয়োজন। অনুকূল অভিজ্ঞতা কীভাবে ভাষিক অর্জনের এই প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করে, বা প্রতিকূল অভিজ্ঞতা কীভাবে ভাষা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, পর্যবেক্ষণের নিরিখে এই সমানুপাত ও ব্যস্তানুপাতের একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণও এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা সম্ভব। অর্থাৎ, গবেষকের মতে, যুক্তিবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ, ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে এই দুই মতবাদের একটি তাত্ত্বিক মিশ্রণকে (amalgamation) গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৌদ্ধিক অর্জনের সহজাত ক্ষমতাটি যদি ভাষা অর্জনের মূল অভিমুখ নিয়ামক প্রক্রিয়া হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়, তাহলে, অভিজ্ঞতাকে সেই প্রক্রিয়ার অনুঘটক হিসাবে স্বীকার করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে এই দুটি প্রক্রিয়া ভাষা অর্জনে কীভাবে সহায়ক হতে পারে, গবেষক তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণজাত তথ্য দিয়ে তা উপস্থাপন করবেন।

৩.২. **শিশুর বচন ও তার বিকাশ**

৩.২.১. কথা বলা: কলধ্বনি থেকে বচন

ভাষা ব্যবহারে সহায়ক বাগ্ধ্বনি বলার অনেক আগে থেকেই শিশুরা তাদের বাগ্যন্ত্র ব্যবহার করে নানারকম আওয়াজ তৈরি করতে থাকে। কাঁদা, কু-ধ্বনি, গলার মধ্যে গার্গল করার মতো ঘড়ঘড়ে আওয়াজ প্রভৃতি নানারকম শব্দ তারা করতে থাকে। যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো জায়গায় জন্মানো শিশুদের প্রথম কথা বলার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলোই দেখা যায়। এমনকি, বধির শিশুদের ক্ষেত্রেও এই স্তরটি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়[৮]।

বোঝাই যায় যে, এই ধরনের ধ্বনি সৃষ্টি করার ক্ষমতা বা প্রবণতা শিশুদের শিখনসাপেক্ষ নয়। অর্থাৎ, বহির্প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত কোনো উত্তেজনা বা অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদান তাদের এই ধরনের ধ্বনি সৃষ্টির নিয়ামক হিসেবে কাজ করে না। এই পর্যায়ে গবেষক শিশুদের নানারকম কান্নার তারতম্য পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, বিভিন্ন কারণ থেকে উদ্ভূত কান্নার ধ্বনিগত বিন্যাসও আলাদা। যদিও তনকোভা ইয়াম্পোলোস্কায়া-র মতো অনেক বিজ্ঞানীরই মতে[৯], শিশুর কান্নাকে যথাযথ ভাষিক সিস্টেমের মধ্যে বিচার করা উচিত নয়, আবার লিবারম্যান প্রমুখ মনে করেন[১০], যেহেতু এই কান্নার মধ্যেও একটি বিশেষ শারীরবৃত্তীয় অনুষঙ্গ এবং একেবারে নির্দিষ্ট কিছু ধরন জড়িত রয়েছে, তাই এই কান্নার মাধ্যমেও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ নির্ধারণ সম্ভব। কান্নার সময় এই পর্যায়ের শিশুরা মূলত যে ধরনের ধ্বনি ব্যবহার করে, সেগুলি সবই ঘোষধ্বনি, মূলত স্বর—/a/, /æ/, /ʌ/ এবং ক্ষেত্রবিশেষে /i/, /u/। কখনো-কখনো ‘য়’ শ্রুতি সমন্বিত ধ্বনি, যেমন /ai/ বা /ua/-ও তাদের মুখে শোনা যায়। খুব অল্পসময়ে সামান্য কিছু স্পর্শধ্বনিও তারা কান্নার মধ্যেই উচ্চারণ করে, বিশেষ করে /g/। তাদের এই পর্যায়ে উচ্চারিত ধ্বনিগুলি বিচিত্র প্রকার—ঘোষধ্বনি থেকে শুরু করে কর্কশ স্বর, কম্পিত স্বর, তীব্র চিৎকার, গুনগুন আওয়াজ, তীক্ষ্ণ স্বর, কোমল স্বর সবই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেজাজে শুনতে পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে, শিশুদের এই পর্যায়ের কান্নাকে কার্যকারণের বিচারে মোট চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—ব্যথা, খিদে, অসুস্থতা এবং বিপদসংকেত। এখানে শিশুদের কান্না সংক্রান্ত যে তথ্যগুলি গৃহীত হয়েছে, তা মূলত কলকাতার রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে সংরক্ষিত তথ্য। কিছু ক্ষেত্রে গবেষক সেই তথ্য পুনর্বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষ গবেষণাধর্মী জার্নালে প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে সেগুলি মিলিয়ে নিয়েছেন। তথ্যের যান্ত্রিক বিশ্লেষণের সময় প্রতি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষজ্ঞের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য যন্ত্রস্থ করা হয়েছে। যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ গবেষকের নিজের নয়।

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে, বাচ্চাদের কান্না সাধারণত কতক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে, সেই সময়ের বিচারে পরস্পরের তুলনায় অনেকটাই পৃথক। কখনও তাদের কান্না খুব অল্পসময় থাকে, যাকে ‘ক্ষণস্থায়ী ক্রন্দন’ (short cries) বলা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কান্নার (এখানে ‘কান্না’ বলতে কাঁদার গোটা প্রক্রিয়াটিকে বোঝানো হচ্ছে না, বরং এক-একবার কান্নাসূচক এক-একটি চিৎকারকেই ‘কান্না’ বলে বোঝানো হচ্ছে) স্থায়িত্ব প্রায় ১০০ মিলিসেকেন্ড। যদিও, বেশিরভাগ সংগৃহীত তথ্যের সাধারণীকরণ করলে দেখা যাবে, শিশুর কান্না গড়ে ৩০০-৬০০ মিলিসেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বেশ বেশিক্ষণ ধরে কাঁদলে, তার সময়কাল হতে পারে ২ সেকেন্ড, এমনকি কখনো-কখনো ৫.৫ সেকেন্ড (গবেষক কর্তৃক পর্যবেক্ষণের অধীন সর্বাধিক সময় পর্যন্ত কান্না) পর্যন্তও! ভাষার অধীন ধ্বনিসমূহের মধ্যে যে তাৎপর্য নিহিত থাকে, কান্নার মধ্যে থেকেও তেমন তাৎপর্য বিচার করার উদ্দেশ্যে যেভাবে কান্নার ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে, তাতে কিন্তু কান্নার সময়কাল মাপা বা কোন্ কান্নার সময় শিশুর শ্বাসতন্ত্রের ওপরে তার কী কী লক্ষণ ফুটে উঠছে, তা বিচার্য নয়। বরং একই কান্নার পরম্পরার (অর্থাৎ গোটা একটি ক্রন্দন প্রক্রিয়ার) মধ্যে সংঘটিত কান্নাগুলি কীভাবে পরস্পর সম্পর্কিত হতে পারে, সেটিই অন্বিষ্ট।

এক-একটি ক্রন্দন প্রক্রিয়াকে আমরা অনেকগুলি কান্নার সমন্বয় বা পরম্পরা হিসেবে দেখতে চাইলে, প্রথমেই এই গোটা প্রক্রিয়াটিকে একাধিক ছন্দোময় বিন্যাস (rhythmic patterns) বা ক্রন্দনবৃত্তের (cry cycle) সমষ্টি হিসেবে দেখতে হবে। এই পদ্ধতিতে ক্রন্দনবৃত্তকে ছোটো-তুলনামূলক ছোটো-তুলনামূলক বড়ো ভাগে ভাগ করার কথা প্রথম বলেন বিজ্ঞানী স্টার্ক[১১]। এক-একটি ক্রন্দনবৃত্তে যে-কটি কান্নার সমন্বয় পাওয়া যাচ্ছে, তার ধরন এবং বিন্যাস দিয়ে কান্নার সঙ্গে জড়িত শিশুর এক-একটি আবেগ কীভাবে পৃথক হয়ে যাচ্ছে, তা নির্দেশ করা হল।

চিত্র ৩. ১-এ একটি শিশুর খিদেজনিত কান্না এবং ক্রমশ খিদে থেকে ব্যথাজনিত কান্নায় রূপান্তরিত হওয়া গোটা ক্রন্দনবৃত্তটির মধ্যে কান্নার দৈর্ঘ্যটি মাপা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এক-একটি কান্নার মধ্যে বিরতির সংখ্যাটিও হিসেব করা হয়েছে। খিদের কান্না গোড়া থেকেই অত্যন্ত জোরালো, অর্থাৎ এই কান্নার সূচনাপর্যায় অত্যন্ত লক্ষণীয়রকম শক্তিশালী। ক্রন্দনবৃত্তের অন্তর্গত কান্নাগুলির স্থায়িত্ব কম, অল্প সময়ের বৃত্তে একাধিক কান্না এখানে একটি ক্রন্দনবৃত্তে জায়গা করে নিয়েছে। এই কান্নাগুলিতে গলার জোর তুলনামূলক কম, কান্নাগুলির মধ্যে বিরতির সংখ্যা ও বিরতির সময়কাল বেশ বেশি। এত দীর্ঘ বিরতি কোথাও কোথাও ঘুমিয়ে পড়ার ইঙ্গিতবাহী। শিশুর খিদে সংক্রান্ত সংবেদন যত তীব্র হতে থেকেছে, ক্রমশ কান্নার ক্ষেত্রে তার গলার জোর তত বেড়েছে, কান্নার সময়কাল বেড়েছে, কমে এসেছে বিরতির পর্যায়গুলি।

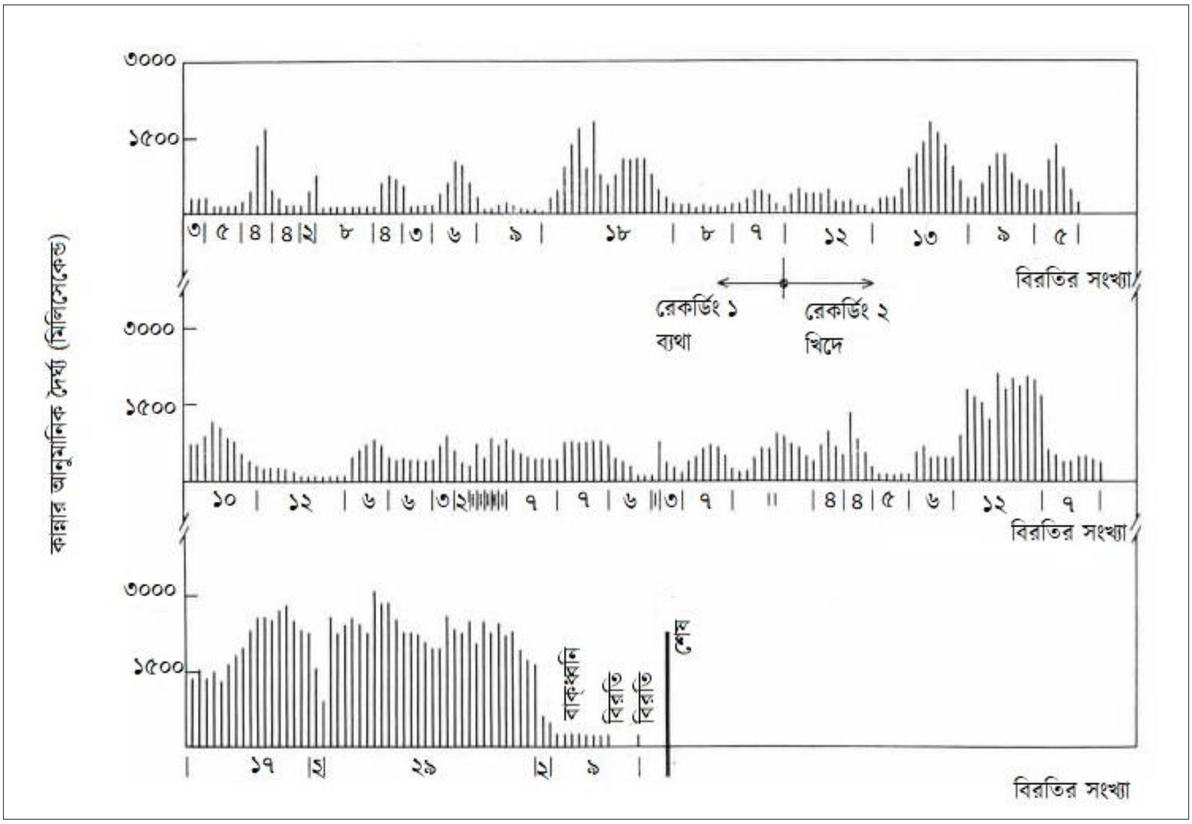

চিত্র ৩. ১: ক্রন্দনদৈর্ঘ্য ও বিরতির পর্যায়

একই ধরনের কান্নার সুরের একটি নির্দিষ্ট অধিধ্বনিমূলক বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণত এই ক্রন্দনবৃত্তে সুরের ওঠাপড়ার বিন্যাসটি সাধারণত ঊর্ধ্ব-নিম্ন-ঊর্ধ্ব এইরকম। কিন্তু বেশ কিছুকাল এই ক্রন্দনপর্যায়গুলি পুনরাবৃত্ত হতে হতে একসময় শিশু রেগে যায়, তার মধ্যে উন্মাদনাপূর্ণ উত্তেজক লক্ষণ খেয়াল করা যায় এবং এই পর্বে কিন্তু কান্নার সঙ্গে সঙ্গে বাগ্‌ধ্বনিগত কিছু প্রকাশও দেখতে পাওয়া যায়। যতক্ষণ না তার কান্নার কারণ উপশম করা হচ্ছে, ততক্ষণ এই উত্তেজনার নিরসন সম্ভব হয় না।

চিত্র ৩. ২-এ খিদেজনিত কান্নার স্পেকটোগ্রাম ব্যান্ডটি দেখানো হয়েছে। একটি টেপ রেকর্ডারকে সাউন্ড লেভেল মিটারের সঙ্গে জুড়ে এই রেকর্ডিংগুলি করা হয়েছে। রেকর্ডিংগুলিকে সোনাগ্রাফের স্পেকটোগ্রাফ লুপে ফেলে স্পেকটোগ্রামগুলি তৈরি, যা এক-একটি 'ক্রাই প্রিন্ট' হিসেবে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্রাই প্রিন্টের ছবিতে শব্দতরঙ্গের তীব্রতা যত বেশি, কম্পন নির্ণায়ক রেখার রং তত বেশি গাঢ় হতে থাকে। খিদেজনিত কান্নার স্পেকটোগ্রামের প্রিন্ট বা ক্রাই প্রিন্টটি দেখলেও চিত্র ৩. ১-এর সঙ্গে মিলিয়ে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, কান্নার ধরনটি শুরুতে বেশ জোরালো। ফলে ছবির প্রথমদিকে কম্পনরেখা গাঢ় রং ফেলেছে কাগজে। মাঝে কয়েকটি বিরতির কারণে জায়গায় জায়গায় কম্পনচিহ্নের রং হালকা। কোথাও কোথাও রং পড়েইনি, অর্থাৎ সেখানে পূর্ণ বিরতির পর্যায় এসেছে। আবার শেষের দিকে বিরতি পর্যায় কম, কান্নার ক্ষেত্রে গলার জোর বেড়ে ওঠায় কম্পননির্দেশক চিহ্নগুলির একটিকে অন্যটির চেয়ে আর ততটা আলাদা করাও যাচ্ছে না। একটানা গাঢ় রং পড়েছে কাগজে।

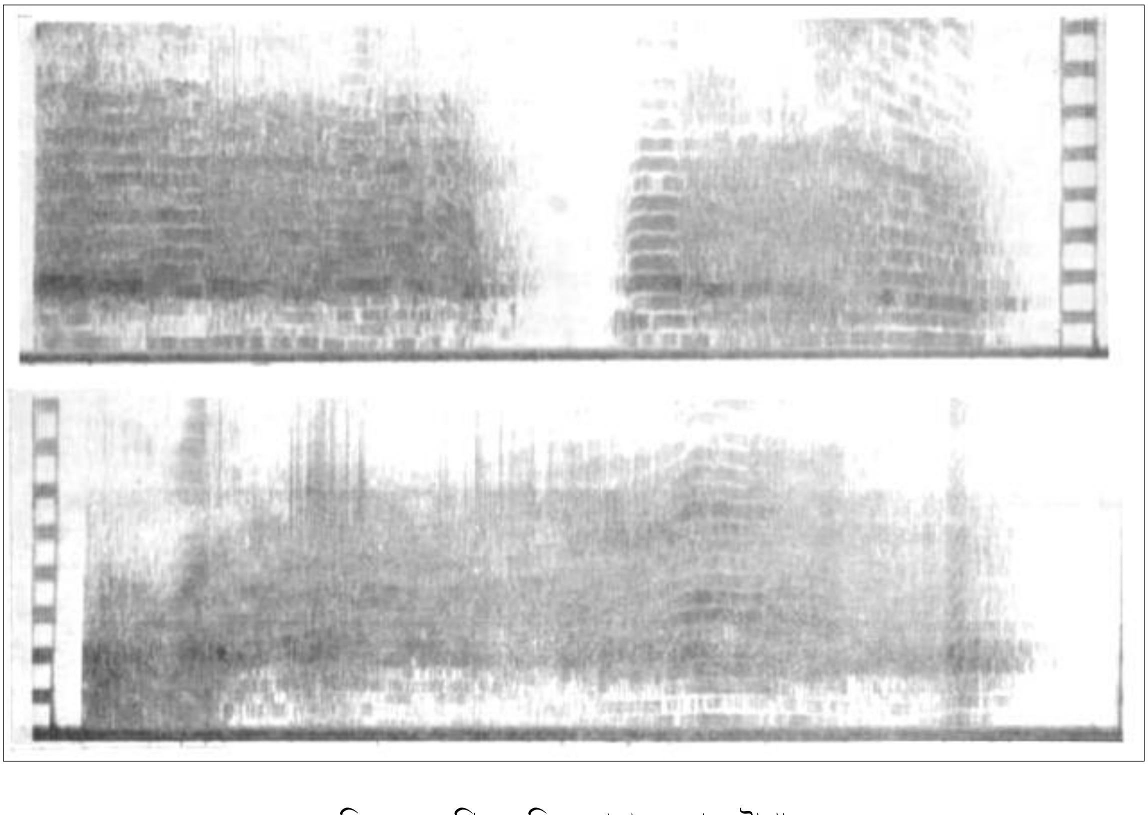

চিত্র ৩.২: খিদেজনিত কান্নার স্পেকটোগ্রাম

ব্যথাজনিত কান্না সাধারণত শুরু হয় আকস্মিকভাবে। একটি ক্রন্দনবৃত্তের শুরুর ক্রন্দন এককটি এখানে বেশ জোরালোভাবে শুরু হয়, এককগুলির মধ্যে বিরতির সংখ্যাও থাকে অনেক বেশি। খিদেজনিত কান্না যেমন ক্রমশ তীব্রতা বাড়ায়, এক্ষেত্রে প্রথমাবধিই কান্নার জোর থাকে অনেক বেশি। বিরতির পর্যায়গুলি হয় বেশ ছোটো ছোটো এবং একটি বিশেষ অধিধ্বনি কান্নার মধ্যে আগাগোড়াই খেয়াল করা যায়। বস্তুত, ব্যথার কারণের ওপরে নির্ভর করে স্বরের ওঠাপড়া ও তীব্রতাও উচ্চনীচ হয়ে থাকে। ব্যথার কারণ অপসারিত হওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ এই কান্নার রেশ সাধারণত থাকে। এই কারনেই, খিদেজনিত কান্নার সমাপ্তি পর্যায় আর ব্যথাজনিত কান্নার সমাপ্তি পর্যায়ের মধ্যে একটা বড়ো তফাত এইখানেই দেখা যায়।

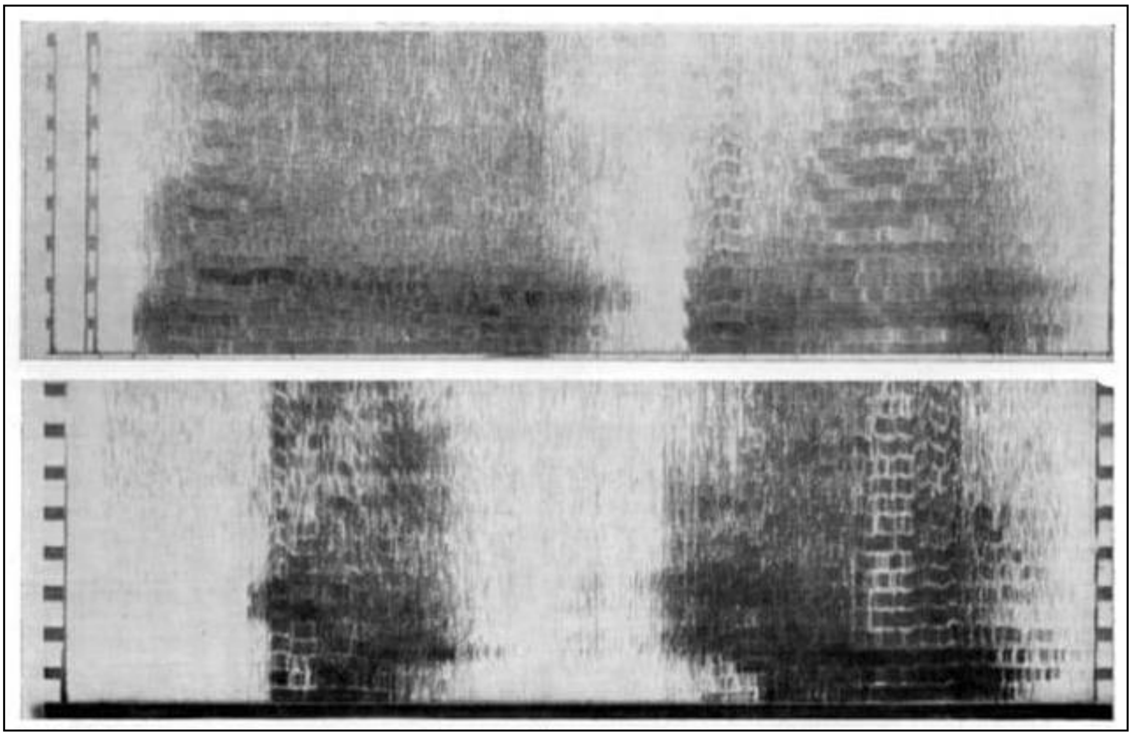

চিত্র ৩.৩: ব্যথাজনিত কান্নার স্পেকটোগ্রাম

কোনো শারীরিক দুর্বলতা বা শারীরিক অসুস্থতা থেকে যে অস্বস্তি হয়, তারই প্রকাশ ঘটে শিশুদের অসুস্থতাজনিত কান্নার মধ্যে দিয়ে। এখানে অসুস্থতাজনিত কান্নার রেকর্ডিং-এর সময় যে শিশুটির কান্নার স্পেকটোগ্রাম ব্যবহৃত হয়েছে, সে দীর্ঘ এক সপ্তাহ সর্দিকাশি ও নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যায় ভুগেছে, ফলে তার রাতের ঘুম ব্যাহত হচ্ছিল। এই রেকর্ডিংটি তার অভিভাবক কর্তৃক রাতেই করা।

কান্নার রেকর্ডিংটি শুনলে বোঝা যায়, আগের কান্নার ধরনগুলির সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য হল, এই কান্নার মধ্যে শিশুটির গলার জোরের কোনো প্রভাব পড়েনি। কান্নার তীব্রতা দিয়ে ক্ষোভ বা বিরক্তি প্রকাশ করার যে বিষয়টি আগের কান্নাগুলিতে ছিল, এখানে সেই ভাবটি নেই। বরং শিশুটির কান্নার সঙ্গে মিশে আছে ক্লান্তি, অস্বস্তি সংক্রান্ত অভিযোগের ভাব। খিদে কিংবা ব্যথার কান্নায় যে জোরালো তীব্রতা, সর্বশক্তি দিয়ে

চেঁচিয়ে আপত্তি জানানো, তার বদলে এখানে শিশুর গলার স্বর তীক্ষ্ণ, কিন্তু তীব্রতা একেবারে স্তিমিত হয়ে এসেছে।

অসুস্থতাজনিত কান্নার স্পেকটোগ্রামটি খেয়াল করলেও দেখা যাবে, সেখানেও ঠিক এই বৈশিষ্ট্যগুলিই ধরা পড়ছে। দীর্ঘ অসুস্থতা কীভাবে শিশুটির স্বাভাবিক শারীরিক ক্ষমতা, গলার জোর, শক্তি কিংবা উত্তেজনার মাত্রায় তফাত এনেছে, তা অন্যান্য স্পেকটোগ্রামের সঙ্গে এই স্পেকটোগ্রামটির তুলনা করলেই বোঝা যায়। দীর্ঘক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে তার বিরক্তি, কষ্ট, ক্লান্তি। একবারে চিৎকার করে জোরগলায় না কেঁদে এই ঘ্যানঘ্যান করে অনেকক্ষণ ধরে একটানা কান্নার মধ্যে দিয়েই অসুস্থ শিশুটির কান্নার স্পেকটোগ্রাম তার অন্য কান্না সংক্রান্ত সংবেদনগুলি থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

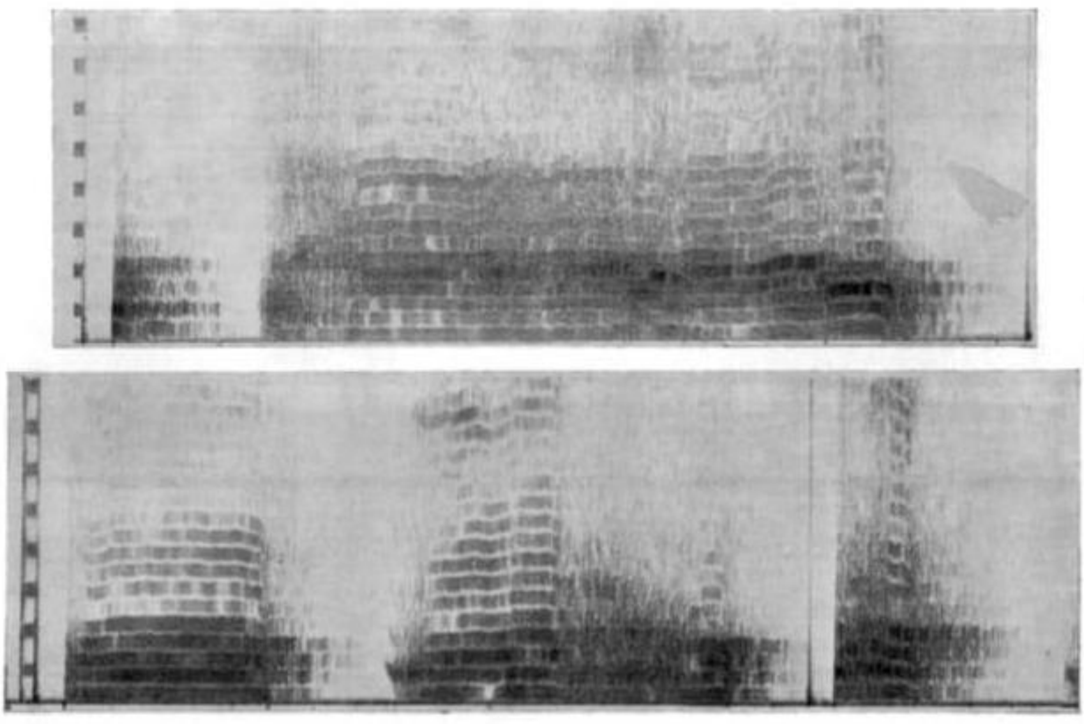

চিত্র ৩.৪: অসুস্থতাজনিত কান্নার স্পেকটোগ্রাম

এ ছাড়া অন্য আর-একটি কারণেও শিশুরা শব্দ করে কাঁদে। আচমকা কোনো কারণে ভয় পেলে বা কোনো হঠাৎ আওয়াজ, জোরে চিৎকার ইত্যাদি কারণে আকস্মিকভাবে ঘুম ভেঙে গেলে বাচ্চাদের এই ধরনের কান্না শুনতে পাওয়া যায়। তীব্রতা এবং গলার ওঠাপড়ার দিক দিয়ে এই কান্ন বহুলাংশেই ব্যথাজনিত কান্নার সমার্থক। তবে ক্রন্দনপর্যায়ের বিন্যাস ব্যথাজনিত কান্নার ক্রন্দনপর্যায়ের থেকে একটু আলাদা।

এই কান্নার ধরনটিকে বিপদসংকেতসূচক কান্না বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে এই কান্না যেমন শুরু হয় আচমকা, তেমনই এর সমাপ্তিপর্বও চলে আসে দ্রুত। যদিও, কান্নার কারণ, শিশুর ওপরে সেই

কারণের মানসিক প্রভাব, সেই কারণ অপসারিত হওয়ার কালপর্ব ইত্যাদির ওপরে এই কান্নার স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এই জাতীয় কান্না দ্রুত উপশম হয় বলেই এই কান্নার ক্রন্দনবৃত্তগুলির পিকের সংখ্যাও বেশি।

তবে, বহুক্ষেত্রেই বিপদসংকেতসূচক কান্না আর ব্যথাজনিত কান্নার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা একটি দুরূহ হয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে কোনো শারীরিক অস্বস্তি বা যন্ত্রণা শুরু হলে, শিশুর কান্নার প্রাথমিক ধরনটি বিপদসংকেতসূচক কান্নার মতো হলেও ক্রমশ তা কিন্তু ব্যথাজনিত কান্নার ক্রন্দনপর্যায়ে পর্যবসিত হবে।

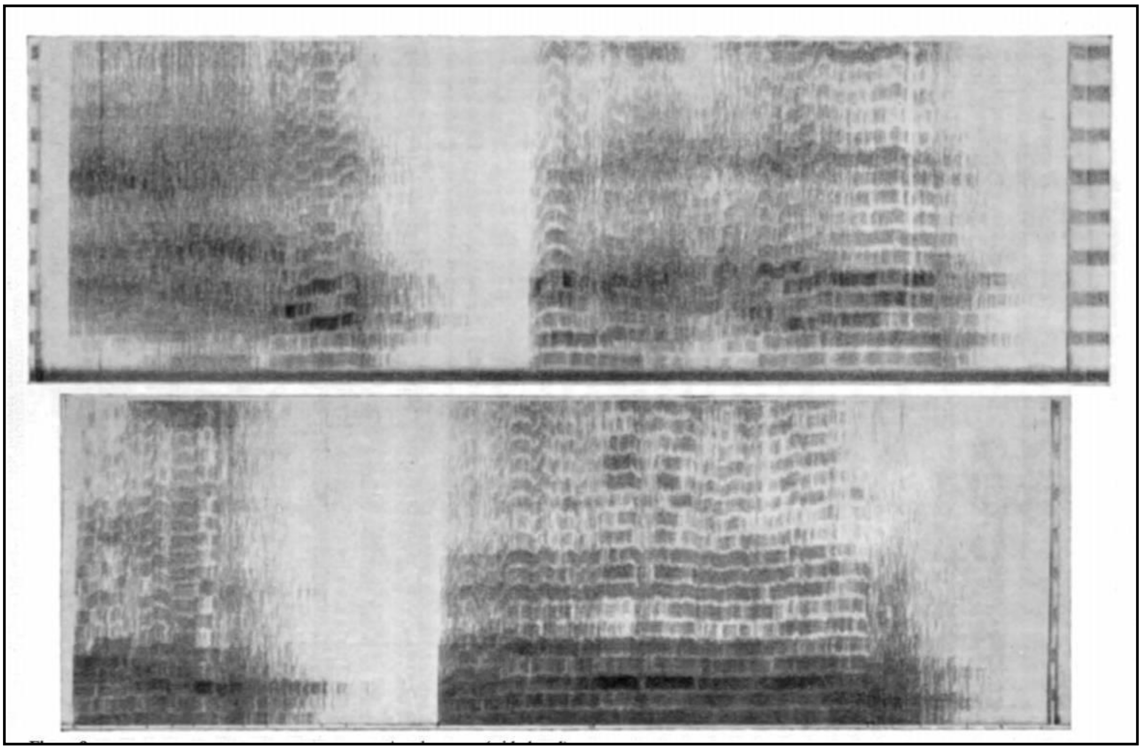

চিত্র ৩.৫: বিপদসংকেতসূচক কান্নার স্পেকটোগ্রাম

এর পরবর্তী স্তরে সাধারণত শিশুদের কলধ্বনি পর্যায় শুরু হয়। এই পর্যায়ে তারা যেসব শব্দ বারংবার বলতে থাকে, সেগুলিকে স্বর ও ব্যঞ্জনের একটি বিশেষ সমাহার বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে— যেমন, 'বা-ব্বা-ব্বা', 'মা-ম্মা-ম্মা', 'প-প্প-প্প' ইত্যাদি। গোটা বিশ্বের যাবতীয় ভাষায় বহির্গামী শ্বাসবায়ুর সাহায্যে উচ্চারিত যে বাগ্‌ধ্বনিগুলি পাওয়া যায়, তার মধ্যে সবকটি না হলেও, বেশ অনেকগুলিই এই পর্যায়ে শিশুর বিভিন্ন সময়ে বলা ধ্বনির মধ্যে উঠে আসে। যেমন বলা যেতে পারে, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত /t̪^{h}/ ধ্বনি ইংরেজি ভাষায় দুর্লভ। আবার, ইংরেজি /z/-এর উচ্চারণ বাংলায় হয় না। আফ্রিকার জুলু প্রভৃতি ভাষায় যে ক্লিক ধ্বনি পাওয়া যায়, সেটি আবার পৃথিবীর অন্য অনেক ভাষাতেই মেলে না। এই ধরনের কিছু বিশেষ ধ্বনির উচ্চারণকে হিসেবের আওতায় না আনলে বলা যেতে পারে, প্রায় অনেকগুলি ধ্বনিই শিশুরা এইসময় বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে থাকে। অবশ্যই সেই প্রয়োগ সুচিন্তিত নয়, সুপ্রযুক্ত তো নয়ই। যাই হোক, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ শিশুর বচনে তাদের নিজস্ব ভাষিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। দেখা গেছে,

মোটামুটি ছয় মাস বয়স হওয়ার পর থেকে, ভাষার নিজস্ব শব্দগুলি শিখে ওঠার আগেই শিশুরা কলধ্বনির মধ্যে তাদের ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমন্বিত এমন কিছু ধ্বনির উচ্চারণ করতে পারে, যেগুলি একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং সেই পার্থক্যে রীতিমতো বিশেষত্ব রয়েছে। এই পর্যায়ে তারা সেই ভাষার সুর বা স্বরের ওঠাপড়াগুলিকেও (intonation) খানিক আয়ত্ত করে নেয়।

তবে, শিশুর ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে এই বিশেষ পর্যবেক্ষণটি অনেকেই কিন্তু মানতে চাননি। তাঁদের মতে, শিশুর এই ভাষাশিক্ষা আদতে সম্পূর্ণত শোনার ওপরে নির্ভরশীল। ফলে শিশু যদি বধির হয়, তাহলে এই যে বিশেষত্বপূর্ণ কলধ্বনির পর্যায়, সেখানে একটি স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় তার ভাষিক বিকাশ অনেকটাই ব্যাহত হয়ে দেখা দেবে।[১২] এই কলধ্বনি পর্যায়েরই একেবারে অগ্রসর স্তরে এসে শিশুরা সাধারণত তাদের প্রথম অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করে। কখনো-কখনো এই প্রথম শব্দ উচ্চারণের পর্বে এসে পৌঁছোতে শিশুদের একবছর বয়স পর্যন্ত সময় লাগে।

শিশুরা যখন শব্দ উচ্চারণ করতে শুরু করে, তখন কিছুটা আশ্চর্যজনকভাবে তাদের কলধ্বনি পর্যায়ে উচ্চারিত সবকটি ধ্বনি কিন্তু তারা শব্দের মধ্যে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না। এতদিন তারা অর্থহীনভাবে যে সমস্ত ধ্বনি সহজেই উচ্চারণ করত, এখন এক-একটি গোটা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে, একসঙ্গে একটি ধ্বনিগুচ্ছ বলা এবং তার নিহিতার্থটিকে মাথায় রেখে তার যথার্থ প্রয়োগ করার পারম্পর্যটি বহুক্ষেত্রেই শিশুর উচ্চারণে ব্যাহত হয়। সেই জন্যই শব্দের মধ্যে থাকা অনেক ধ্বনিই তাদের জিভে ইতিপূর্বে উচ্চারিত হলেও, এই শব্দ উচ্চারণের পর্বে কলধ্বনি পর্যায়ের গুটিকয়েক ধ্বনি বাদ দিলে বাকি ধ্বনিগুলি বেশিরভাগই তাদের নতুন করে আবার আয়ত্ত করতে হয়।

ধ্বনিগুলো পরপর কীভাবে শিশু আয়ত্ত করবে, তারও একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস ও পরম্পরা রয়েছে। যেমন /c/, /k/, /g/ ইত্যাদি ধ্বনি শিশুরা কলধ্বনির পর্যায়ে বহুবার কোনো অর্থগত সূত্র বা তাৎপর্য ছাড়াই উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু শব্দ উচ্চারণের পর্যায়ে এসে দেখা যায়, তারা শব্দের মধ্যে থাকা অবস্থায় এই ধ্বনিগুলি মোটেই বলতে পারছে না। বরং /p/, /t/, /m/, /ɔ/, /a/ প্রভৃতি নতুন অর্জন করা ধ্বনিগুলির বলতে শেখার অবিসংবাদিত পরেই এই /c/, /k/, /g/ প্রভৃতি ধ্বনি আবার নতুন করে উচ্চারণ করতে শেখে তারা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শিশুর ভাষা অর্জনের স্তরগুলির ক্ষেত্রে কলধ্বনি স্তরের পরেই শব্দ উচ্চারণের স্তর লক্ষ করা গেলেও, উপাদানগত দিক থেকে এই দুটি স্তরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, কলধ্বনি পর্যায়ে উচ্চারিত ধ্বনিগুলি চরিত্রগতভাবে একশাব্দিক স্তরের ধ্বনিগুলির প্রত্যক্ষ পূর্বসূরী নয়।

পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমান করা যায়, ভাষিক স্তরে শিশুরা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি বলতে শেখে সম্মুখ থেকে পশ্চাৎ ক্রম অনুসারে। এখানে সম্মুখ থেকে পশ্চাৎ বলতে মুখবিবরের মধ্যে ধ্বনির উচ্চারণগত স্থানগুলির ক্রম,

অর্থাৎ, ওষ্ঠ থেকে কণ্ঠনালীর দিকে ধ্বনির উচ্চারণস্থানের দিককে বোঝানো হচ্ছে। এইজন্যই, শিশু ধ্বনিক্রম আয়ত্ত করার সময় /k/, /g/, /c/ বলার আগেই /m/, /p/, /b/, /t/ বলতে শেখে। রোমান জেকবসন ধ্বনিগত বৈপরীত্যের ওপরে ভিত্তি করে স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন, তার মাধ্যমেও বাগ্‌ধ্বনি অর্জনের ক্রমটি অনুমান করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। জ্যাক ডুরান্ড এবং টিফানি প্রিন্স পরবর্তীকালে জেকবসনের তত্ত্বের ওপরে দাঁড়িয়ে এই বিষয়টিকে বিশদে ব্যাখ্যা করেন—"Jakobson put forward the thesis that the distinctive sounds of a language (i.e., phonemes) are acquired in an order that reflects their structural complexity, in terms of feature composition and basic syllabic structure, and lost in the reverse order in certain types of aphasia. Moreover, he claimed that the complexity of segments that can be laid bare in the development and loss of language corresponds to universal or near-universal laws that govern the sound systems of the world."[১৩]

পরবর্তীকালে অবশ্য ভাষা অর্জন সংক্রান্ত আধুনিক পরীক্ষানিরীক্ষার পরিসরে জেকবসনের এই তত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানীরা খারিজ করেছেন। তাঁদের মতে, ভাষা অর্জনের স্তরে ধ্বনি অর্জনের ক্রমটি এত সহজে সুনির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া সম্ভব নয়, এর মধ্যে প্রচুর বিন্যাস ও পার্থক্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী ভেলটেন একটি পরীক্ষা চালান তাঁর মেয়ে জোয়ান-এর ওপরে। মেয়ের এগারো মাস বয়স থেকে শুরু করে তিন বছর বয়স পর্যন্ত কথা বলতে শেখার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলি রেকর্ড করে, তার মাধ্যমে তিনি নিজের পর্যবেক্ষণজাত তত্ত্বটি খাড়া করেন। তিনি বলেন, শিশুর ধ্বনি অর্জনের ক্রমটির সঙ্গেই ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে 'lexical matters' অনুধাবন করার বিষয়টি। কারণ একইসঙ্গে সে তার চারপাশ থেকে এমন কিছু ধ্বনি শুনছে, যে ধ্বনিগুলি সে নিজে উচ্চারণ করার চেষ্টা করছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে তার নিজস্ব বাগ্‌যন্ত্রের একাধিক প্রয়াসের পর এই ধ্বনিগুলি অর্জন করতে কমবেশি সক্ষমও হচ্ছে। আবার অন্যদিকে, চারপাশের বক্তাদের মুখে সে ধ্বনিগুলিকে বিচ্ছিন্ন আওয়াজের মতো মোটেই শুনছে না। ধ্বনিগুলি আসলে তার কাছে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে ধ্বনিসমষ্টি হিসেবে, শব্দের আকারে। বহু শব্দের অর্থ যেহেতু সে তখনও জানে না, তাই এগুলিকে শব্দ না বলে ধ্বনিসমষ্টি বলাই ভালো। আর এই শিক্ষণীয় ধ্বনিসমষ্টি আসলে তার কাছে হয়ে উঠছে ভাষার প্রথম রেফারেন্স—বলা যেতে পারে 'lexical matters'। ফলে ভেলটেন দেখালেন, শিশুর ধ্বনি অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্রমকে চিহ্নিত করা যায় না। বরং এখানে ধ্বনি অর্জন, ধ্বনি আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সমস্যা ও তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা, ধ্বনি অভ্যাস, ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে থেকে চেনা ধ্বনি শনাক্ত করতে পারার ক্ষমতা, বিশেষ বিশেষ ভাষার অন্তর্গত শব্দের বিশিষ্ট বিন্যাস অনুসরণ করে উচ্চারণের ধরন বদলে যাওয়া, ক্রমশ শব্দের মাধ্যমে গোটা একটি এক্সপ্রেশনকে বোঝানোর চেষ্টা—প্রভৃতি নানারকম প্রক্রিয়া সমান্তরালভাবে চলতে থাকে শিশুর ধ্বনি অর্জনের প্রক্রিয়ায়। সব মিলিয়ে, ভেলটেন এই পর্যায়টিকে একইসঙ্গে রূপতাত্ত্বিক এবং অন্বয়তাত্ত্বিক বিকাশ হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইলেন।[১৪]

মূলত যে জায়গাটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে পর্যবেক্ষণের তফাত ও বিতর্ক তৈরি হতে থাকল, তা হল, বাগ্‌ধ্বনি উচ্চারণ করার নিরিখে কলধ্বনি পর্যায় থেকে বচন পর্যায়ের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতার অভাব এবং বাগ্‌ধ্বনি অর্জনের ক্রমগুলির ক্ষেত্রে পার্থক্য। গবেষকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণজাত মত, কলধ্বনি পর্যায় থেকে বচন পর্যায়ের মধ্যে এই যে ধারাবাহিকতার অভাব, তার মূল কারণটি সম্ভবত নিহিত রয়েছে 'intentional vocalization' এবং 'non-intentional vocalization'-এর পার্থক্যের মধ্যে, যে বিষয়টি অনেক আগেই চিহ্নিত করেছিলেন ইয়েসপারসেন। কলধ্বনি পর্যায়ে শিশুর যাবতীয় উচ্চারণ প্রয়াস অবশ্যই 'non-intentional vocalization' বা অনৈচ্ছিক বাকপ্রচেষ্টা। কারণ, এই পর্যায়ে শিশুর কোনো উচ্চারণই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জ্ঞানমূলক নিয়ন্ত্রণ বা 'central cognitive control'-এর অধীনে থাকে না। শিশু এই সময়ে যা যা ধ্বনি অনর্গল বলে চলে, তার কোনোটাই তার পূর্বনির্ধারিত নয় এবং সে আগে থেকে ভেবেচিন্তে ধ্বনিগুলির বিন্যাস সাজায় না। কিন্তু বচন বা কথা বলার ক্ষেত্রে বিষয়টি খুব স্বাভাবিকভাবেই বেশ আলাদা। এখানে শিশু যে কথা বলে, প্রথমত তা তার সচেতন বাক্‌প্রয়াস। দ্বিতীয়ত এক্ষেত্রে সে এলোমেলো ধ্বনি বলে না, উপরন্তু তার আগে থেকে শোনা ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে তার বলা প্রতিটি ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির সাযুজ্য সে এক্ষেত্রে বজায় রাখার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত, তার বলা প্রতিটি ধ্বনিসমষ্টিই কোনো না কোনো বস্তু, বিষয় বা প্রয়োজনের দিকে ইঙ্গিত করে। কলধ্বনি পর্যায়ের মতো অনৈচ্ছিক উচ্চারণ এক্ষেত্রে হয় না। বরং বচন পর্যায়ে শিশু বুঝে যায়, তার বাগ্‌ধ্বনিগুলি কোন্‌টি কোন্ বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত হচ্ছে। অর্থাৎ, এই পর্যায়ে সে তার জিভ, ঠোঁট, মূর্ধা, ভোকাল কর্ড প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রগুলিকে প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণ করে আলাদা আলাদা ধ্বনি উচ্চারণ করতে সক্ষম। সব মিলিয়ে, এই পর্যায়ের ধ্বনি উচ্চারণের প্রক্রিয়াটিকে আমরা অর্থপূর্ণ প্রচেষ্টা বলেই চিহ্নিত করতে পারি। এখন, এই ঐচ্ছিক এবং সচেতন ধ্বনিপ্রয়াসের নিরিখে কলধ্বনি পর্যায় আর বচন পর্যায়ের মধ্যে একটা বড়ো তফাত হয়ে যাচ্ছে ঠিকই, আবার বচন পর্যায়ে কিন্তু এই বিশেষ সচেতন প্রয়াসজাত বৈশিষ্ট্যগুলি ধরে রাখা সম্ভব হয় কলধ্বনি পর্যায়ের জন্যই। সেই অর্থে বলতে গেলে, বচন পর্যায় আসলে কলধ্বনি পর্যায়ের ওপরে নির্ভরশীল। বাগ্‌ধ্বনিগুলি উচ্চারণের প্রক্রিয়ায় কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিই বা কী—কথা বলার জন্য প্রয়োজনীয় এই যাবতীয় উচ্চারণগত কৌশল বা 'articulatory mechanism'-এর প্রথম পাঠ শিশু পায় কলধ্বনি পর্যায়েই। কলধ্বনি পর্যায়ে আবোলতাবোল আওয়াজ করা, অনর্গল ধ্বনি বলার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে শিশু শিখে যায়, মুখের ভিতরে থাকা বাগ্‌ধ্বনিগুলি কোন্‌টা কীরকমভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে কী জাতীয় ধ্বনি তৈরি করছে। সে নিজে সারাক্ষণ নানাভাবে ধ্বনি উচ্চারণ করে করে একসময় বাগ্‌ধ্বনিগুলিকে নিয়ন্ত্রণের এই কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে। নিজের উচ্চারণ করা ধ্বনি নিজের কানে শুনে এবং চারপাশে শুনতে পাওয়া অন্যদের উচ্চারণ করা ধ্বনিও নিজের কানে একইসঙ্গে শুনতে শুনতে একসময় সে ধ্বনিগুলির পারস্পরিক সাদৃশ্য কমবেশি বুঝতে পারে। পরবর্তীকালের, বচন পর্যায়ে সে যে সচেতনভাবে বাগ্‌ধ্বনিগুলিকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় ধ্বনি উচভচারণ করতে পারবে এবং সফল ধ্বনি অর্জনের নমুনা রাখবে, তার মূল সংযোগটি কিন্তু নিহিত আছে শিশুর কলধ্বনি পর্যায়ের এই

বিশেষ অনুশীলনের ওপরে। এই কারণেই, কলধ্বনি পর্যায় থেকে বচন পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্নতার অভাব নিয়ে যত বিতর্কই থাক না কেন, আসলে নিরবচ্ছিন্নতা না থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ, কলধ্বনি পর্যায়ের অভ্যাস ও পর্যবেক্ষণের ওপরে দাঁড়িয়েই কলধ্বনি পর্যায় থেকে আলাদা হয়ে যায় বচন পর্যায়। তাদের সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য সূচিত হয়ে যায় ঐচ্ছিক বাক্‌প্রয়াস এবং অনৈচ্ছিক বাক্‌প্রয়াসের মতো মূলগত বৈশিষ্ট্যের তফাতের কারণেই।

কলধ্বনি পর্যায় আর বচন পর্যায়ের মধ্যে এই যে একটি অন্তর্নিহিত সংযোগের সূত্র রয়েছে, যার পথ ধরে আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম কলধ্বনি পর্যায় একটি অনৈচ্ছিক সক্রিয়তার স্তর হলেও কীভাবে তার মাধ্যমে বচন পর্যায়ের মতো ঐচ্ছিক সক্রিয়তার স্তরও প্রত্যক্ষত নিয়ন্ত্রিত হয়। এখন এই বিশেষ সংযোগসূত্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করে মূলত দুটি বিষয়— উচ্চারকগুলির দৃশ্যমানতা বা 'visibility of articulators' এবং উচ্চারণের সুবিধা বা 'ease of articulation'। শিশুটি অর্থপূর্ণ বাক্‌ব্যবহারে উৎসাহ পেলে (শিশুর চারপাশের ভাষীরা যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছগুলি উচ্চারণ করছে, শিশুটি যদি সফলভাবে সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণের মাধ্যমে অনুকরণ করতে সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে চারপাশের ভাষীরা শিশুর এই অনুকরণের প্রচেষ্টাকে কতটা প্রশংসা করছেন, তার ওপরেও শিশুর উৎসাহ নির্ভর করে।) বারবার ওই চেনা ধ্বনিগুলি ফিরে ফিরে উচ্চারণ করার কাঙ্ক্ষিত সুযোগ খোঁজে। একই বাগ্‌যন্ত্র কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট ধ্বনিগুলি বারবার উচ্চারণ করতে করতে ক্রমশ শিশুটি সচেতন হয়ে ওঠে তার উচ্চারণের প্রকৌশলগুলির বিষয়ে। শিশুর ভূমিকা এক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় একজন সচেতন দর্শকের মতো। সে লক্ষ করতে থাকে, কোথা থেকে তার বাগ্‌ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হচ্ছে এবং বাগ্‌ধ্বনির সেই উচ্চারণস্থান শনাক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয় উচ্চারকগুলির সঙ্গে তার নিজের উচ্চারিত ধ্বনিগুলির আন্তঃসম্পর্ক বিষয়েও সে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে, জিভ আর ঠোঁটের নড়াচড়া এইসময়ে শিশুর বিশেষ পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়ে উঠতে থাকে। মুখের ভেতরে বাগ্‌যন্ত্রগুলি কীভাবে অবস্থান পরিবর্তন করছে, ক্ষেত্রবিশেষে কীভাবে জিভ ওঠা, নামা, এগোনো এবং পিছোনোর মাধ্যমে কীভাবে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হচ্ছে, সেসবই এই পর্যায়ে তার পর্যবেক্ষণ এবং অনুকরণের বস্তু হয়ে ওঠে। যেহেতু, শিশুর প্রাথমিক এই পর্যবেক্ষণ মূলত ঠোঁট আর জিভের গতিবিধিকে কেন্দ্র করেই নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই বাগ্‌ধ্বনিগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট যে ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণে ঠোঁটের ভূমিকা সর্বাধিক, সেগুলিই শিশু আগে আয়ত্ত করে ফেলে। তার পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণজাত অনুকরণের এই নির্দিষ্ট পরম্পরার মধ্যে স্বাভাবিভাবেই সে প্রথমে বলতে শেখে /m/, /p/, /b/-এর মতো দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনিগুলি (bi-labial sounds)। শেখার এই ক্রম অনুযায়ী এর পরে আসে /k/ কিংবা /g/-এর মতো কণ্ঠ্যধ্বনি, এরও পরে শিশুরা বলতে শেখে /c/ বা /s/ জাতীয় ঘৃষ্ট ধ্বনি। এই ক্রমটি খেয়াল করলেই বোঝা যায়, মুখের মধ্যে উচ্চারকের গতিবিধি যত স্পষ্ট, তত দ্রুত শিশুরা সেই ধ্বনি আয়ত্ত করতে পারে। বরং মুখের ভিতরে অদৃশ্য উচ্চারকের গতিবিধি সম্পর্কে তাঁরা একটু দেরিতে সচেতন হয়, সেই সংলগ্ন ধ্বনিগুলিও পরে বলতে শেখে।

স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে অবশ্য বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। সবকটি স্বরধ্বনির উচ্চারণের সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে একাধিক অদৃশ্য উচ্চারকের ভূমিকা। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে শিশুরা যেভাবে উচ্চারকের গতিবিধি সচেতনভাবে নজর করে, সেই প্রক্রিয়ার সহায়তা এখানে মেলে না। তাই নির্ভুলভাবে স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ করতে পারাটা ধ্বনি অর্জনের স্তরে, শিশুর পক্ষে একটু বেশি আয়াসসাধ্য। স্বরধ্বনি উচ্চারণের এই কৌশল যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে গেলে তাদেরকে বারবার অনুশীলনের অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে আসতে হয়। প্রচেষ্টা ও ভুলের এই পর্যায়টি দিয়ে না গেলে ধ্বনিগুলির যথার্থ উচ্চারণস্থানগুলিকে নির্ভুলভাবে ধরতে পারা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। শিশুদের ধ্বনি অর্জনের এই পর্যায়টি খেয়াল করলে বোঝা যায়, যে স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ করার সময় উচ্চারকগুলি স্থিতিশীল অবস্থানের বেশি কাছাকাছি থাকে, সেগুলিই শিশুরা আয়ত্ত করে দ্রুত। সেই কারণেই, /a/-এর মতো কেন্দ্রীয় এবং নিম্ন ধ্বনি শিশুরা আগে উচ্চারণ করে। কারণ। জিভের ওঠা এবং নামার বিচারে হিসেব করলে, অন্যান্য স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে জিভের অবস্থান যা থাকে, তার চেয়ে /a/ উচ্চারণ করার সময় যেহেতু জিভ অনেক বেশি নীচে অবস্থান করে এবং জিভের অবস্থান যত নীচের দিকে হয়, জিভের স্থিতিশীলতাও তত বাড়ে, তাই স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য স্বরধ্বনির তুলনায় শিশুরা /a/-এর উচ্চারণ আগে করতে সক্ষম হয়। উপরন্তু, জিভের স্বাভাবিক কেন্দ্রীয় অবস্থানও ব্যাহত হয় না /a/ উচ্চারণ করতে গেলে। তুলনায় যে স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ করতে গেলে উচ্চারকের ওপরে পেশির নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি প্রয়োজন হয়, সেগুলি উচ্চারণ করতে এবং অন্যের উচ্চারণ অনুসরণ করে শিখতেও দেরি হয়। যেমন /i/ স্বরধ্বনিটি সম্মুখ এবং উচ্চ, অর্থাৎ এই ধ্বনিটি উচ্চারণ করার সময় জিভকে তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে অনেকটা ওপরে উঠে আসতে হয় এবং জিভকে মাঝামাঝি অবস্থান থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে আনতে হয়। তাই /i/-এর উচ্চারণ শিশুর পক্ষে তুলনামূলকভাবে জটিল এবং তা শিশুরা আয়ত্ত করেও দেরিতে। পূর্বে উল্লিখিত উচ্চারকগুলির দৃশ্যমানতা বা 'visibility of articulators' এবং উচ্চারণের সুবিধা বা 'ease of articulation'—এই দুটি বিষয়ের ওপরে ভিত্তি করে এইভাবেই শিশুদের গড় উচ্চারণের ক্রমটি নির্ধারিত হয়।

তবে, এর পরেও একটি বিশেষ বিষয় থেকে যায়, যার ওপরে শিশুর উচ্চারণ নির্ভর করে— সেটি হল আকস্মিক পারঙ্গমতা। এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র, শিশুর বুদ্ধিমত্তা বা সক্রিয়তার মতো বিষয়ের ওপরে এটি কখনোই নির্ভর করে না। হঠাৎ কখনও, আকস্মিক আবিষ্কারের মতো কোনো একটি ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ শিশুরা অনেক সময়েই উচ্চারণ করে ফেলতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে এই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছটি পুনরায় সে একইভাবে উচ্চারণ করতে পারতেও পারে, আবার সেই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছটিকে সম্পূর্ণ হারিয়েও ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে পরে আবার নতুন করে ধ্বনি অর্জনের নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করতে করতে ধ্বনি উচ্চারণের কাঠিন্য মান অনুযায়ী সেই ধ্বনিটি উচ্চারণ করতে স্বাভাবিকভাবে শিশুটির যে সময় লাগার কথা, সেই সময় অতিক্রান্ত হলে তখনই শিশুটি ওই ধ্বনি উচ্চারণ করবে। কিন্তু যদি শিশুটি ওই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে হারিয়ে

না ফেলে এবং অনুশীলন করতে করতে সে ওই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ আয়ত্ত করে ফেলতে পারে, তাহলে তার বাকি ধ্বনি অর্জনের ক্রম নিরপেক্ষভাবেই ওই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ রয়ে যায়।

৩.২.২. প্রাথমিক তিনটি অর্থপূর্ণ বচন স্তর: নামশব্দ ও হলোফ্রাস্টিক, টেলিগ্রাফিক এবং রূপ-সংবর্তন বা মরফিক-ট্রান্সফর্মেশনাল

৩.২.২.১. নামশব্দ ও হলোফ্রাস্টিক স্তর: একশাব্দিক উচ্চারণ

একেবারে প্রাথমিক উচ্চারণের স্তরে খুব সামান্য কিছু একশাব্দিক উচ্চারণ (যেমন: মা [/ma/]) শিশুর শব্দসংক্রান্ত জ্ঞানের প্রতিফলন হতেও পারে, নাও পারে। তার চারপাশের পরিবেশের মধ্যে থাকা বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দগুলিকে শনাক্ত করার ক্ষমতা জন্মালে, সাধারণত শিশুরা সেই সব শব্দ দিয়েই তাদের কথা বলা শুরু করে। এই পর্যায়ের বচন কখনোই নিখুঁত হওয়ার প্রশ্ন নেই, মূল ধ্বনির কিছুটা কাছাকাছি যাবে মাত্র। এমনকি মূলধ্বনির অন্তর্গত সিলেবল বা দলের সংখ্যাও বহুক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকে না। যেমন 'মা' (/ma/) বলতে গিয়ে শিশুটি 'মাম্মাম্মা' (/mammamma/) জাতীয় উচ্চারণও করতে পারে। এখন এই বাচনিক রূপগুলি নির্ভরযোগ্যভাবে নিয়মিত প্রয়োগ করতে পারলে (কারণ, ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি কখনোই আকস্মিক হতে পারে না), ধরে নেওয়া যেতেই পারে, শিশুটির শব্দসংক্রান্ত জ্ঞান কিছুটা হলেও হয়েছে।

শিশুর প্রাথমিক শব্দসংক্রান্ত জ্ঞান বস্তুত গড়ে ওঠে নামশব্দ শেখার মাধ্যমেই। খেয়াল রাখতে হবে, এখানে নামশব্দ বলতে কিন্তু নামপদকে বোঝানো হচ্ছে না, বোঝানো হচ্ছে নামবাচক বিশেষ্য পদকে যার মাধ্যমে কোনো না কোনো বস্তু বা বিষয়ের নামটি চিহ্নিত করা হয়। যেমন, বাংলাভাষী প্রায় সব শিশুরই প্রথম দিকের অর্জিত শব্দ 'মা' (/ma/)। শিশুবিশেষে এই শব্দটির নানাবিধ উচ্চারণের রীতি পাওয়া যায়। কিন্তু উচ্চারণ যেমনই হোক না কেন, আসলে শিশুর সঙ্গে নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে সে চিনছে এই নামে। ১৯৭৬ সালে গ্রিনফিল্ড এবং স্মিথ দেখিয়েছিলেন যে, ইংরেজিভাষী একটি শিশুর একেবারে গোড়ার দিকে শিখে ফেলা শব্দগুলোর মধ্যে একটি ক্রিয়াবাচক শব্দও রয়েছে—'/bbabba/'। আদতে শিশুটি 'bye bye'-এর বিকল্প হিসেবে এই উচ্চারণটি করছে। গ্রিনফিল্ড এবং স্মিথের মতে, শিশুটি যে এই শব্দটি বলতে শিখেছে, তার কারণ সে এক্ষেত্রে 'bye bye' শব্দটিকে বিদায়গ্রহণ ক্রিয়াটির নাম হিসেবে শনাক্ত করেছে।[১৫] এই প্রসঙ্গে মস্কোউইৎজ বলেন, শিশুরা একেবারে গোড়ায় নির্দিষ্ট কোনো বস্তুকে বোঝাতে হলে সরাসরি একটি নামশব্দই ব্যবহার করে।[১৬] বিজ্ঞানী ক্লার্কের মতে, এই নামশব্দ বা নামবাচক বিশেষ্যগুলিকে প্রথমে চিহ্নিত করার পরে শিশুরা সেই নামগুলিকে সাধারণ বিশেষ্যপদের ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহার করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে।[১৭] যেমন একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুটি যখন তার নিজের মাকে /ma/ বলে শনাক্ত করতে পারছে এবং তার মায়ের সঙ্গে এই শব্দটির একটা সংযোগ সে খেয়াল করতে পারছে, তখন সে এই গোটা অর্থপূর্ণ

উচ্চারণপ্রক্রিয়াটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পারলেও, /ma/ ধ্বনিটির সাধারণ অর্থটি কিন্তু তার পক্ষে তখনই অনুধাবন করা সম্ভব নয়। সে বড়োজোর তার নিজের মাকে এইভাবে ডাকতে পারে, কিন্তু তার চারপাশে অন্য কোনো মা এবং সন্তান যদি উপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে 'মা' শব্দটির এই সাধারণ প্রয়োগ, ব্যবহার এবং সাধারণ অর্থটি কিন্তু সে আদৌ বুঝতে পারবে না। আবার সম্পূর্ণ অন্য ঘটনাও পর্যবেক্ষণের ক্রমে ধরা পড়েছে। যেমন যে শিশুটি তার বাড়ির একটি কুকুরকে প্রথমে /b^{h}ou/ (কুকুরের ডাকের সঙ্গে সাদৃশ্যের কারণে) বলে চিনতে শিখল, অচিরেই কিন্তু সে রাস্তার অন্যান্য কুকুরদেরও সেই একই শব্দ উচ্চারণ করে বোঝানোর চেষ্টা করছে, কিংবা পশমওয়ালা সফট টয়, নরম সোয়েটার এসব বস্তুও কুকুরের লোমশ আকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যহেতু তার কাছে হয়ে উঠছে /b^{h}ou/। ফলে, আগের ঘটনাটির ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখলাম, শিশুটি একটি বিশেষ্য নামশব্দকে ভেঙে সাধারণ বিশেষ্যর জগতে তাকে সম্পর্কিত করে তুলতে পারছে না, আবার এক্ষেত্রে দেখা গেল যে, শিশুটি নামশব্দটি আয়ত্ত করার পরপরই তার সঙ্গে অন্যান্য বিবিধ বস্তু, বিষয় বা প্রাণীর বিভিন্নরকম সাদৃশ্য লক্ষ করে তাদেরকেও ওই নামশব্দ দিয়েই চিহ্নিত করছে। শিশুটি নিজে শব্দটিকে ওই বস্তু বা বিষয়টির নাম হিসেবেই ব্যবহার করছে, কিন্তু প্রয়োগের নিরিখে সেটি ক্রমশ নামশব্দ থেকে সাধারণ বিশেষ্য হয়ে উঠেছে।

উচ্চারিত শব্দের নিরিখে বিচার করতে বসলে আর-একটি বিষয়ও বিশেষভাবে চোখে পড়ে— শিশুরা যে শুধু একটি ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে ওই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক বস্তুকে বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, তা-ই নয়। আপাতভাবে ওই ধ্বনিগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় বা ভাবকে বোঝাতেও তারা বহু ক্ষেত্রে ওই একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ ব্যবহার করে। যেমন, পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, একটি শিশু 'মা' (/ma/) ধ্বনিগুচ্ছটির মাধ্যমে কখনও বলতে চাইছে, 'আমি মায়ের কাছে যাব'; আবার ওই একই শিশু তার মায়ের জুতোটি দেখতে পেয়ে আবারও ওই একই ধ্বনিগুচ্ছ ব্যবহার করে 'মা' (/ma/) বলছে এবং এক্ষেত্রে সে বোঝাতে চাইছে, 'এইটা আমার মায়ের জুতো'। পূর্বে উল্লিখিত বিজ্ঞানীদ্বয় গ্রিনফিল্ড এবং স্মিথও দেখিয়েছেন[১৮], প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুরা একটি একশাব্দিক প্রয়োগের মাধ্যমে একাধিক শব্দার্থগত প্রকাশকে (semantic function) বুঝিয়ে থাকে। এই সবকটি ক্ষেত্রেই শিশুরা যে সমস্ত বিষয় বা ভাব বা বস্তুকে বোঝানোর জন্য ওই একশাব্দিক এক্সপ্রেশন বা প্রকাশভঙ্গিটির সাহায্য নিচ্ছে, পরিণতবয়স্ক ভাষীরা সেই একই বিষয়, ভাব বা বস্তুকে বোঝানোর জন্য একাধিক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে থাকেন। একটি শব্দের মাধ্যমে ভাষার সাধারণ নিয়মে যতদূর অর্থকে বোঝানো যায়, তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর অর্থ এই একশাব্দিক প্রকাশগুলির মাধ্যমে এই পর্যায়ের শিশুরা ধরার চেষ্টা করে। সেইজন্যই, নামশব্দ ব্যবহারের এই বিশেষ একশাব্দিক পর্যায়টিকে **হলোফ্রাস্টিক পর্যায়**ও (Holophrastic Stage) বলা হয়। এখানে 'holophrase' শব্দটির অর্থ হল, একটি শব্দের মাধ্যমে তুলনামূলক জটিল, বৃহত্তর এবং অর্থাতীত অর্থকে বোঝাতে পারে, এমন এক্সপ্রেশন। বস্তুত, এই পর্যায়ে শিশুরা একটি শব্দের ব্যবহারে যে পরিমাণ নতুনত্ব আর উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দেয়, তা সত্যিই বিস্ময়কর! পূর্ববর্তী গবেষণায় এও দেখা গেছে যে, শিশুরা এই পর্যায়ে একটি বেশ

জটিল পরিস্থিতিকেও এই জাতীয় একাধিক হলোফ্রেজ ব্যবহার করে বলার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানী ব্লুম দেখিয়েছিলেন[১৯], তাঁর পর্যবেক্ষণাধীন একটি শিশু এইরকম হলোফ্রাস্টিক প্রকাশের একটি অসামান্য উদাহরণ রেখে বলেছিল, 'peach, daddy, spoon'। আসলে সে বোঝাতে চেয়েছিল, তার বাবা চামচ দিয়ে একটি পিচ ফল কেটে টুকরো করে খাচ্ছেন। গবেষকের পর্যবেক্ষণাধীন একটি শিশুও 'গাই, যাই, বাছ' (/gai̯/, /jai̯/, /bac^{h}/) অর্থাৎ 'গাড়ি, যাই, বাস' এই তিনটি হলোফ্রাস্টিক এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে বোঝাতে চেয়েছিল যে, সে গতকাল একটি বাসে চড়েছিল।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুটি এই একশাব্দিক প্রকাশভঙ্গিগুলির মাধ্যমে ঠিক কী বোঝাতে চাইছে, তা নির্ভুলভাবে বুঝতে পারা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সেজন্য, শিশুর কথাবার্তার এই প্রাথমিক পর্যায়টিকে বুঝতে হলে তার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা, অভ্যাস, সেই মুহূর্তের পরিস্থিতি— এগুলিকে ভালোভাবে খেয়াল করতে পারা জরুরি। তাও, যথেষ্ট মনোযোগী অভিভাবকদের পক্ষেও প্রায়শই তাঁদের বাচ্চাদের উচ্চারণ করা এইসব ধ্বনিগুচ্ছের অর্থ বুঝতে পারা সম্ভব হয় না। তবে, তাঁদের এই না বুঝতে পারার ব্যাপারটাও আদতে শিশুদের পক্ষে ইতিবাচক অনুঘটকের ভূমিকাই নেয়। শিশুরা যখন বুঝতে পারে যে, তারা যা বলতে চাইছে, তা তার শ্রোতাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে তার মনের ভাবটি যথাযথভাবে প্রকাশ করতে কিংবা তার দাবিদাওয়া জানাতে আরও তীব্রভাবে আকুল হয়ে পড়ে। সে বারবার প্রচেষ্টা করতে থাকে, তার বলা শব্দগুলোর মানে তার চারপাশের ভাষীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। একই ধরনের প্রচেষ্টা একাধিকবার করার পরেও বিফল হলে, সে তার প্রচেষ্টার ধরন বদলে ফেলতে সচেষ্ট হয় এবং আগের মতো অতি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে তার শ্রোতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়টিতে ক্রমশ আগ্রহ হারাতে থাকে। আস্তে আস্তে তারা বুঝতে পারে, ভাষিক প্রকাশমাধ্যম যত বেশি দীর্ঘ হবে, যত বিশদ হয়ে উঠবে, তাদের সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনগুলি তত ভালোভাবে এবং দ্রুত মেটানো সম্ভব হবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই, বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর এই একশাব্দিক প্রকাশের ধরন পরিত্যক্ত হয় এবং ক্রমশ তার ভাষা জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে।

৩.২.২.২. টেলিগ্রাফিক স্তর: দ্বিশাব্দিক ও ত্রিশাব্দিক উচ্চারণ

আগের আলোচনায় দেখা গেল, শিশু যাঁর বা যাঁদের সঙ্গে ভাষিক সংযোগ স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠছে, তিনি বা তাঁরা শিশুটির কথা বুঝতে না পারলে সে ক্রমশ আগের যোগাযোগ পদ্ধতিকে বাতিল করে তুলনামূলক জটিল যোগাযোগ পদ্ধতি রপ্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু, এই স্তর পরিবর্তন খুব একটা দ্রুত হয় না। একশাব্দিক স্তর থেকে দ্বিশাব্দিক স্তরে যেতে শিশুর বেশ খানিকটা সময় লাগে। তার একটা বড়ো কারণ, একশাব্দিক প্রয়োগের মাধ্যমে শিশু যখন নানান বিষয় বুঝিয়ে ওঠার চেষ্টা করে, তখন তার সেই পারঙ্গমতার সঙ্গে বোধগম্যতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু সে যখন দ্বিশাব্দিক স্তরে যাবে, তখন তার বোধগম্যতার একটা সাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে সে পরবর্তী এই স্তরটিতে পা রাখতে পারে না। বিষয়টি

একটু বিশদে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আসলে কোনো একটি বিষয়, ভাব বা বস্তুকে শিশুরা যখন একটি ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ দিয়ে চিহ্নিত করে, তখন সেই উচ্চারণের প্রক্রিয়াটি সে শেখে মূলত অনুকরণের মাধ্যমে। তার চারপাশের পরিণতবয়স্ক ভাষীরা ওই পরিস্থিতিতে ওই বিষয়, ভাব বা বস্তুকে যেভাবে প্রকাশ করছেন, সেই প্রকাশভঙ্গিটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চারপাশে শোনা বিভিন্ন ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের মধ্যে থেকে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছগুলি শিশুর কাছে মুখ্য হয়ে ধরা পড়ে, কিংবা সবচেয়ে বেশিবার যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছগুলি সে শুনতে পায়, সেই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছগুলিকেই সে তার হলোফ্রাস্টিক এক্সপ্রেশনের মূল উপাদান হিসেবে বেছে নেয়। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে তার বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ নেই, বরং রয়েছে তার চারপাশের পরিবেশ এবং অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। কিন্তু যে মুহূর্তে শিশু এই একশাব্দিক প্রকাশগত কৌশলটির সীমাবদ্ধতার জায়গাগুলি ধরতে পারে, যখন তার মনের ভাব বোঝানোর জন্য আর এই হলোফ্রাস্টিক এক্সপ্রেশনগুলি যথেষ্ট হয়ে উঠতে পারে না, তখনই তার মধ্যে একটা অভাববোধ তৈরি হয়। নিজেকে স্পষ্ট করে বোঝানোর এই তাড়নার সঙ্গে শিশুর বোধ ও জ্ঞানমূলক বিকাশের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। শিশুর দাবিদাওয়া তার চারপাশের মানুষ বুঝতে না পারলে প্রাথমিকভাবে সে মরিয়া হয়ে উঠবে, তারপর একসময় বিরক্ত হবে। কিন্তু আরও পরে, যখন তার ভাষাগত বোধের আর-একটু পরিণতির পর্যায় এসেছে, একমাত্র তখনই সে এই ধরনের একশাব্দিক এক্সপ্রেশনের বিকল্প রাস্তা খুঁজে পাবে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই, শিশুর ভাষাগত অভাববোধ তৈরি হওয়া আর এই অভাববোধ থেকে তার বিকল্প পথ বেছে নেওয়ার মধ্যে সময়ের বেশ কিছুটা তফাত থাকেই। সাধারণভাবে দেখা গেছে, অন্তত দু-বছর বয়স না হলে শিশুরা দ্বিশাব্দিক এবং ত্রিশাব্দিক এক্সপ্রেশনের স্তরে যেতে পারে না।

নীচে একটি ছকের মাধ্যমে শিশুদের কয়েকটি দ্বিশাব্দিক প্রকাশভঙ্গিকে তুলে ধরা হল। সেই সঙ্গে দেখানো হল ওই একই কথা পরিণতবয়স্ক ভাষীরা বললে কীভাবে বলতেন। শিশুদের বলা শব্দগুলির মধ্যে যে শব্দার্থগত সম্পর্ক নিহিত রয়েছে, তা শনাক্ত করা গেলেই তাদের কথার সম্ভাব্য আদর্শ প্রকাশ (পরিণতবয়স্ক ভাষীর ক্ষেত্রে) কী হতে পারত, তা দেখানো সম্ভব হয়।

শিশুর বচন	সমউদ্দেশ্যে পরিণতবয়স্ক ভাষীর সম্ভাব্য বচন	সম্ভাব্য উদ্দেশ্য	শব্দার্থগত সম্পর্ক (প্রকাশিত বা নিহিত)
১. বিকু (/biku/)	আমি বিস্কুট খাব।	অনুরোধ	(কর্তা)—কর্ম—(ক্রিয়া)
২. আও দাও (/ao dao/)	তুমি আমাকে আরও দাও।	অনুরোধ	(কর্তা)—(গৌণ কর্ম)—পরিমাণবাচক বিশেষণ— (মুখ্য কর্ম)—ক্রিয়া; পরিমাণ মাপা
৩. বাবু খাবে (/babu k^habe/)	আমি (বাবু) খাব।	অনুরোধ	কর্তা—ক্রিয়া
৪. মাম্ দুতো (/mam duto/)	এটা আমার মায়ের জুতো।	সতর্কীকরণ	(নির্দেশক)—(সম্বন্ধ ১)—সম্বন্ধ ২—কর্ম
৫. মাম্ দুতো (/mam duto/)	এটা আমার মায়ের জুতো।	প্রশ্নের উত্তর	(নির্দেশক)—(সম্বন্ধ ১)—সম্বন্ধ ২—কর্ম
৬. মাম্ দুতো (/mam duto/)	আমার মা জুতো পরছে।	প্রশ্নের উত্তর	(সম্বন্ধ)—কর্তা—কর্ম—(ক্রিয়া)
৭. বাও মে (/bao me/)	আমি ভালো মেয়ে।	গর্ব	(কর্তা)—বিধেয়
৮. লাল গায়ি (/lal gayi/)	ওই গাড়িটা লাল।	তথ্যজ্ঞাপন	(নির্দেশক)—কর্তা—বিশেষ্য
৯. গায়ি (/gayi/)	ওটা গাড়ি।	তথ্যজ্ঞাপন	(নির্দেশক)—বিধেয়
১০. গুম না (/gum na/)	আমি ঘুমোব না।	অস্বীকার	(কর্তা)—নঞর্থক ক্রিয়া
১১. পেন তেবিল (/pen tebil/)	পেনটা টেবিলের ওপরে রাখা আছে।	তথ্যজ্ঞাপন	কর্তা—স্থান—(অবস্থান)—(ক্রিয়া)

এই ছকটিতে দেখানো বেশিরভাগ দ্বিশাব্দিক বা ত্রিশাব্দিক প্রকাশের ক্ষেত্রেই তার মূল উদ্দেশ্যগুলির বৈচিত্র্য আর যে শব্দার্থগত সম্পর্কের নজিরে এই উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে ওই দ্বিশাব্দিক বা ত্রিশাব্দিক প্রকাশগুলি জুড়ে গেছে, তার জটিল বিন্যাস দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। শিশুরা এখানে বিভিন্নরকম উদ্দেশ্য নিয়ে এই দ্বিশব্দ বা ত্রিশব্দগুলি ব্যবহার করেছে। ভাষার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল শিশুদের মূল নিয়ামক আবেগটিকে বোঝার চেষ্টা করলে আমরা এখানে যে যে ধরনের ভাষাগত উদ্দেশ্যগুলি এখানে সাধিত হতে দেখছি, তাকে মুখ্যত এই কটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়— অনুরোধ করা, সতর্কীকরণ, কোনো বিষয় চিহ্নিতকরণ, অস্বীকার করা, গর্ব করা, প্রশ্ন করা, উত্তর দেওয়া এবং কোনো কিছু জানানো।এই উদ্দেশ্যগুলি সাধনের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে শিশুরা যে দ্বিশব্দ বা ত্রিশব্দগুলি উচ্চারণ করেছে, তার মধ্যে বেশ কয়েক প্রকার শব্দার্থতাত্ত্বিক সম্পর্ক এবং ধারণার বোধ নিহিত আছে, যেগুলিকে চিহ্নিত করে দেখানো যেতে পারে। যেমন—কর্তা, ক্রিয়া, গ্রহীতা, অবস্থান, বস্তু, সম্বন্ধ, স্থান, বৈশিষ্ট্য, নাকচ করা, পরিমাপ করা ইত্যাদি।

শিশুদের এই পর্যায়ে বলা কথাগুলির দ্বিতীয় বিশেষত্বটি হল, বাক্যের মধ্যে কোথাও কোনো বদ্ধ রূপের (bound morph) অস্তিত্ব না থাকা। শিশুরা এই দ্বিশাব্দিক ও ত্রিশাব্দিক বিন্যাসগুলির মধ্যে যে কটি শব্দ ব্যবহার করেছে, প্রায় প্রতিটিই মুক্ত রূপ (free morph)। তাদের এই পর্যায়ের ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে কোনো অবস্থান নির্দেশক পদ (ওপরে, নীচে, পাশে ইত্যাদি) নেই, কোনো সংযোজক অব্যয় (অথচ, কিন্তু, আর, তবে, বরং ইত্যাদি) নেই এবং বিভক্তির (-তে, -রে, -কে ইত্যাদি) সংখ্যাও লক্ষণীয়ভাবে কম। বরং নামশব্দ, বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও ক্রিয়াই মূলত ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবহারপদ্ধতির বিচারে পদ বাছাইয়ের এই ক্রমটি স্বাভাবিক। কারণ, এই ধরনের পদগুলিই সাধারণত একটি বাক্যের মূল তথ্যগুলি ধারণ করে, ফলে শিশুদের পক্ষেও এই ধরনের পদগুলিই আগে শিখে ফেলাটা সহজ। এই তথ্যবাচক পদগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পারলে কখনোই তাদের পক্ষে অমুকের 'কাছে', অমুকের 'জন্য', অমুক 'এবং' অমুক, অমুক-'কে', অমুক-'এর'— ইত্যাদি ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। 'ওপরে' বা 'নীচে' জাতীয় স্থাননির্দেশক তথ্য যে অবস্থানটি বোঝাতে চায়, শুধুমাত্র এই শব্দের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ দিয়েই শিশুদের পক্ষে সেই তথ্যটি বুঝতে পারা সম্ভব। যেমন, 'ওপরে' শব্দটির ব্যবহার নিজের উচ্চারণে করতে না পারলেও, সে শুধু 'টেবিল' আর 'বল'— এই দুটি শব্দের অর্থ জানা থাকলেই তার সঙ্গে সংযোগের পরিস্থিতিটি আন্দাজ করে নিয়ে সে 'টেবিলের ওপরে বলটা আছে' জাতীয় বাক্যের মানে বুঝতে পারে। একইভাবে, নিজে 'নীচে' শব্দটি উচ্চারণ করতে না পারলেও 'খাট' আর 'বেড়াল'— এই শব্দ দুটির অর্থ জানা থাকলেই সে 'খাটের নীচে বেড়ালটা বসে আছে' জাতীয় বাক্যের অর্থ আন্দাজ করে নিতে পারে। কিন্তু এই মুখ্য বিশেষ্য পদগুলির অর্থ জানা না থাকলে, নানারকমভাবে বিশেষ্য পদগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত এই অন্যান্য পদগুলির তাৎপর্য বা অর্থ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা করার অবকাশই তৈরি হতে পারবে না। এমনকি তার চারপাশের পরিবেশ বা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে কোনো একটি বিষয়কে তার চারপাশের ঘটনা বা বস্তুর সঙ্গে সংলগ্ন আকারে তার কাছে পেশ করা হলেও সে এই বিশেষ দায়িত্ব পালন করা শব্দগুলিকে বুঝে উঠতে

পারবে না। একই তত্ত্ব খাটে শিশুটির বিপরীতে থাকা শ্রোতার বোধগম্যতার ক্ষেত্রেও। শিশুটি যেভাবে মূলত বিশেষ্য, বিশেষণ আর ক্রিয়া দিয়ে গঠিত দ্বিশব্দ বা ত্রিশব্দ বলছে, তার বদলে, শিশুটি যে পদগুলিকে বাদ দিচ্ছে শুধু সেইগুলিকেই যদি শ্রোতার কাছে হাজির করা হত, তাহলে তাদের পক্ষেও শিশুর এই সংক্ষিপ্ত বাক্‌ব্যবহারের আড়াল থেকে মুখ্য উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারা সম্ভব হত না। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। আগে যে দুটি বাক্য বলা হল, সেই দুটি বাক্যকেই যদি এই পর্যায়ের একটি শিশুর মুখে শোনা যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই প্রথম বাক্যটি দাঁড়াবে— 'টেবিল, বল'; যার মাধ্যমে সে বোঝাতে চাইছে, 'টেবিলের ওপরে বলটা আছে'। এক্ষেত্রে, শিশুটি যে যে ধ্বনিগুচ্ছগুলিকে বাদ দিল, সেগুলি হল যথাক্রমে— (-এর), ওপরে আছে। এখন শিশুটি যদি 'টেবিল, বল' না বলে ওই বাদ দেওয়া ধ্বনিগুচ্ছগুলি বলত, তাহলে তার এক্সপ্রেশনটি এইরকম দাঁড়াত— '-এর ওপরে আছে'। শুনেই বোঝা যাচ্ছে, এই এক্সপ্রেশনটির চেয়ে 'টেবিল, বল' এক্সপ্রেশনটি অনেক বেশি বোধগম্য। একই কথা প্রযোজ্য 'নীচে' পদটি ব্যবহারের খাতিরেও। 'খাটের নীচে বেড়ালটা বসে আছে'— এই বাক্যটি যদি শিশুর জবানিতে শোনা যেত, তাহলে তার চেহারা দাঁড়াত এইরকম— 'খাট, বেড়াল'। এই জবানি থেকে বাদ পড়েছে যথাক্রমে 'নীচে', 'বসে' আর আছে। একইভাবে, শিশুটি যদি 'খাট, বেড়াল' না বলে সরাসরি 'নীচে আছে'-র মতো শব্দ ব্যবহার করত, তাহলেও উলটো দিকে শ্রোতা তার মর্মোদ্ধার করতে পারতেন না। এই কারণেই, এই স্তরে শিশুদের কথা বলার ধরনের মধ্যে টেলিগ্রাম মেসেজের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। একইরকম ভাবে, এই পর্যায়ে শিশুদের বচনও ছোটো ছোটো, কাটা কাটা মূল তথ্যজ্ঞাপক শব্দের সমাহারে গড়ে ওঠে। শব্দগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যে আন্বয়িক সম্পর্ক, তাকে বাদ দিয়ে শুধু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কয়েকটি শব্দকে বেছে নিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করার এই বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গির স্তরকে এইজন্যই বলা হয় **টেলিগ্রাফিক স্তর**।

এই পর্যায়ের শিশুদের বাগ্‌বিন্যাসের এই প্রাথমিক প্রয়াসটির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হল পরিণতবয়স্ক ভাষা ব্যবহারকারীদের সম্ভাব্য উচ্চারণ ও নির্বাচিত শব্দের ক্রমের সঙ্গে শিশুদের বেছে নেওয়া শব্দগুলির ক্রমের সাদৃশ্য। বাংলা ভাষা বলতে শেখার একেবারে গোড়ার এই স্তরে শিশুদের যে বাচনভঙ্গি আমরা পেয়েছি, সেখানে একটা খেলনা গাড়ি চাওয়ার সময় সাধারণত তারা বলেছে 'গায়ি দাও', অর্থাৎ 'গাড়ি দাও'; কেউই কিন্তু 'দাও গাড়ি' বলেনি। 'মায়ের জুতো' অর্থে 'মাম্ দুতো' বলেছে, 'দুতো মাম্' বলেনি। ফলে, দ্বিশাব্দিক উচ্চারণের সময়েই তারা যে ক্রমশ বাংলা ভাষার 'কর্তা—কর্ম—ক্রিয়া'-র স্বাভাবিক বিন্যাসটি আয়ত্ত করে ফেলছে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই স্বাভাবিক বিন্যাসের ছক থেকে সামান্য সরে গিয়ে কখনও যে বিশেষ কোনো তাৎপর্যপূর্ণ চ্যুতি তাদের কথায় ধরা পড়ে না, এমন নয়। তবে সাধারণত, স্বাভাবিক এই পর্যায়ক্রমকে একটু অন্যরকম ভাবে অদলবদল করে নিয়ে তারা যে কথাবার্তা বলে, তা আর-একটু পরের স্তরে খেয়াল করা যায়। একেবারে গোড়ার দিকে কিন্তু পর্যবেক্ষণাধীন প্রত্যেকটি শিশুই ভাষার নিয়মিত বিন্যাসকে অনুসরণ করেই দ্বিশাব্দিক বা ত্রিশাব্দিক বচন ব্যবহার করেছে।

যে-কোনো ভাষার বাক্যবিন্যাসের স্বাভাবিক বৈচিত্র্য ও জটিলতার নিরিখে হয়ত শিশুদের এই প্রাথমিক স্তরের বাক্‌ব্যবহার খুবই অপর্যাপ্ত এবং যৎসামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক যে এই প্রথম ভাষাব্যবহার নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করছে, ভাষা যে ক্রমশ তাদের বোধমূলক এবং জ্ঞানমূলক বিকাশের অঙ্গ হয়ে উঠতে চলেছে, তা বোঝার জন্য এই স্তরের বাচনভঙ্গি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত বোধমূলক বিকাশের মাপকাঠিতে, এই পর্যায়ে শিশু যে ভাষা সম্পর্কে তার কতটা জটিল ধারণার পরিচয় দেয়, তা অনুধাবন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরাও বারবার বিস্মিত হয়েছেন। পিয়াজে-পন্থী গবেষকরা অনেকেই স্বীকার করেছেন, শিশুকালে মানুষের বৌদ্ধিক ক্ষমতার প্রকাশ নিঃসন্দেহে অধিক। চমস্কি নিজেও বলেছিলেন, একটি শিশু তার ভাষা শেখার প্রাথমিক পর্যায়ে যে বিপুল পরিমাণ বোধের বিকাশের স্বাক্ষর রেখে যায়, বহু মানুষের ক্ষেত্রে হয়তো সেটাই তার সারাজীবনের সবচেয়ে বড়ো বৌদ্ধিক অর্জন। বস্তুত, পরবর্তীকালে মানুষের ভাষা ব্যবহারের জটিল বিন্যাস থেকে তার ভাষা সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার কাঠামোটি ধরতে পারা যায় না। তার কারণ পরবর্তীকালে একজন পরিণতবয়স্ক ভাষাব্যবহারকারীর ভাষা ব্যবহারের নমুনা বিশ্লেষণ করে তার বুদ্ধ্যঙ্ক বা 'intelligence quotient' (IQ) মাপার যত চেষ্টাই হোক না কেন, তার মূল ভিত্তি অবশ্যই পরিণতবয়সের ভাষিক আউটপুট। অর্থাৎ সেখানে ভাষী কীভাবে তাঁর কথাকে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করছেন, ভাষার সেই উৎপাদনের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যই (speech production data) ধরা পড়ে, কিন্তু এই ভাষিক প্রকাশের পিছনে একজন বক্তার ঠিক কী ভাবনাচিন্তা রয়েছে সেই বোধমূলক তথ্য (speech understanding data) কখনোই সেখানে ধরা পড়ে না।

১৯৭০ সাল নাগাদ যখন শিশুর ভাষিক বিকাশের ভিত্তি হিসেবে বোধমূলক এবং জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়, তখন থেকেই এই শিশুর বচন পর্যায়ের টেলিগ্রাফিক স্তরটি খুঁটিয়ে নজর করার দিকে বিজ্ঞানীদের ঝোঁক বাড়তে থাকে। ১৯৬০-এর দশকে, শিশুর ভাষা অর্জন নিয়ে যখন প্রথম গবেষণা শুরু হয়, তখনও পর্যন্ত প্রাথমিক জোরটা ছিল শিশুর বাক্য ব্যবহারের আন্বয়িক গঠনের ওপরে, শব্দার্থতাত্ত্বিক গঠনের ওপরে নয়। নোয়াম চমস্কির অন্বয়ভিত্তিক তত্ত্ব (syntactic theory) সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার পর এই বিষয়টিকে বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচিয়ে দেখার প্রবণতাও বাড়তে থাকে। শিশুদের উচ্চারণের যাবতীয় রকমের বিন্যাসকে তখন ভাষাতাত্ত্বিকরা বাক্যের আন্বয়িক কাঠামো দিয়ে ভেঙে তার মাত্রাগত পরিবর্তন ও পরিপূর্ণতার একটি রূপরেখা দাঁড় করাতেই সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। কিন্তু শুধুই আন্বয়িক কাঠামোতে শিশুর এই দ্বিশাব্দিক বা ত্রিশাব্দিক বচনকে ফেললে তার ভাষিক উপাদানের বিন্যাসটি নজর করা ছাড়া আর খুব বেশি কিছুই করার থাকে না। যেমন—'বাবা দাবো' (/baba dabo/) বা 'বাবার কাছে যাব', এই টেলিগ্রাফিক বচনকে ভেঙে বড়োজোর একে একটি বিশেষ্য আর ক্রিয়ার সমাহার হিসেবে দেখানো যেতে পারে। কিংবা পূর্বে উল্লিখিত 'মাম্ দুতো' (/mam duto/) বা 'এইটা আমার মায়ের জুতো', এই বাক্যটিকে দুটি বিশেষ্যের সমাহার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আর ঠিক এই পথ অনুসরণ করেই শিশুর বচনকে বিভিন্ন আন্বয়িক উপাদানের সমাহার হিসেবে দেখিয়েছিলেন চার বিজ্ঞানী— ব্রেইন (১৯৬৩), রজার

ব্রাউন ও বেলুজি (১৯৬৪) এবং ম্যাকনিল (১৯৭০)। কিন্তু শিশুরা এই টেলিগ্রাফিক পর্যায়ে ব্যবহার করা বাক্যগুলির অন্তর্গত শব্দগুলির ক্ষেত্রে খুব সীমিত এবং একই ধরনের উপাদান ব্যবহার করতে থাকে। আমরা ওপরে একটি ছকের মাধ্যমেও দেখিয়েছি যে, শিশুরা শব্দের লাগোয়া আন্বয়িক সম্পর্ক নির্দেশক চিহ্নগুলিকে, কিংবা স্থান, অবস্থান, সম্বন্ধ, অধিকরণ, করণ নির্দেশক পদগুলিকে প্রায় বর্জন করেই চলে। তাদের টেলিগ্রাফিক বচনে বিশেষ, বিশেষণ আর ক্রিয়ারই প্রাধান্য। তাই শুধু আন্বয়িক কাঠামোতে ফেলে তাদের এই পর্যায়ের বচন বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলির সম্পর্কে খুব একটা গভীর কোনো দিশা দেখাতে পারেননি।

শিশুর প্রথম ভাষা অর্জনের এই অন্বয়ভিত্তিক বিশ্লেষণকে বলা হয় মুক্ত কেন্দ্র অভিমুখী ব্যাকরণ (pivot open grammar)। সম্পূর্ণত আন্বয়িক বিচারে শিশুর বাগ্‌ভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই 'pivot open grammar' ভাষার শব্দার্থতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দিকে কতটা ব্যর্থ হয়েছিল, তা দেখিয়েছিলেন দি ভিলিয়ার বিজ্ঞানীদ্বয়। তাঁরা একে বলেন, 'fallacy of phonics'।[২০] কারণ, ধ্বনিগত বিচারে শিশুর উচ্চারিত শব্দগুলি সামান্য কিছু ধর্ম প্রদর্শন করছে, কিন্তু শব্দার্থগত তাৎপর্য কখনোই এখানে ধরা পড়ছে না। দুটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট করা যেতে পারে। আমরা দেখেছি, 'এটা আমার মায়ের জুতো' অর্থে শিশুটি বলেছিল, 'মাম্ দুতো' (/mam duto/)। এখন এই বাগ্‌ভঙ্গিটিকে শুধুই উচ্চারণে যতটুকু প্রকাশিত হচ্ছে, ততটুকুর বিচারে আন্বয়িক সম্পর্কের কাঠামোয় বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব, এটি একটি বিশেষ্য—বিশেষ্য সমাহার। একইভাবে আমরা যদি ওপরে উল্লিখিত ছক থেকে শিশুর উচ্চারিত আর-একটি বাগ্‌ভঙ্গিকে বেছে নিই, যেখানে 'পেনটা টেবিলের ওপরে রাখা আছে' অর্থে সে বলছে 'পেন তেবিল' (/pen tebil/), সেখানেও দেখা যাবে বচনটি একটি বিশেষ্য—বিশেষ্য সমাহার। কিন্তু শব্দার্থতাত্ত্বিক বিচারে দেখা যাচ্ছে, প্রথম বাক্‌প্রকাশটি দুটি বিশেষ্যর মধ্যে সম্বন্ধের সম্পর্ক বোঝাচ্ছে আর দ্বিতীয় বাক্‌প্রকাশটি দুটি বিশেষ্যর মধ্যে অধিকরণের সম্পর্ককে প্রকাশ করছে। ফলে, শিশুর বাক্‌প্রকাশকে আন্বয়িক এবং শব্দার্থতাত্ত্বিক— দুই নিরিখেই বিচার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৩.২.২.৩. রূপ-সংবর্তন বা মরফিক-ট্রান্সফর্মেশনাল স্তর

৩.২.২.৩.১. রূপিম অর্জন স্তর (morpheme acquisition)

প্রথম দুটি সংক্ষিপ্ত ভাষিক প্রকাশের স্তর পেরিয়ে যাওয়ার পর শিশু যখন ক্রমশ তুলনামূলক দীর্ঘ বাক্‌প্রকাশের দিকে ঝোঁকে, তখনই ধীরে ধীরে তার বলা বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে আন্বয়িক সম্পর্কের চিহ্ন, জুড়তে থাকে পদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের চিহ্নবাহী অন্য পদগুলিও। বাক্যের গঠন জটিল থেকে জটিলতর হতে শুরু করে। নীচে এই পর্যায়ের তিনটি শিশুর কথা বলার রেকর্ডিং থেকে সংগৃহীত কয়েকটি

বচনের নমুনা সাজিয়ে তার মধ্যে নতুন রূপিমগুলি চিহ্নিত করা হল এবং আন্বয়িক সম্পর্ক প্রকাশক রূপিমগুলি কীভাবে তাদের কথায় ফুটে উঠছে, তা দেখানো হল।

ক্রমাঙ্ক	রূপিমের শ্রেণি	উচ্চারিত বাক্‌প্রয়াস
১.	ঘটমান বর্তমান ও প্রথম পুরুষ নির্দেশক ক্রিয়াবিভক্তি	দিদি খেলছে
২.	অধিকরণের বিভক্তি	মাঠে যাব
৩.	সাধারণ ভবিষ্যৎ নির্দেশক ক্রিয়াবিভক্তি	আমি বাদাম খাব
৪.	উত্তম পুরুষ নির্দেশক সর্বনাম	আমি বাদাম খাব
ক্রমাঙ্ক	রূপিমের শ্রেণি	উচ্চারিত বাক্‌প্রয়াস
৫.	কর্ম সম্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি	দিদুনকে ডাকো না
৬.	অনুরোধপূর্বক 'না'	দিদুনকে ডাকো না
৭.	সাধারণ বর্তমানের প্রথম পুরুষ	ওর লাল গাড়িটা আছে, আমার গাড়ি চাই
৮.	নঞর্থক ক্রিয়ার যুক্ত রূপ	আমি কাগজে হাত দিইনি
৯.	অবস্থানবাচক রূপিম	খাটের নীচে জুতো আছে
১০.	অবস্থানবাচক রূপিম	আমি ওপরে যাব

এই ছকটি খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, এর আগের হলোফ্রাস্টিক এবং টেলিগ্রাফিক পর্যায় দুটিতে শিশুর বচনে আন্বয়িক সম্পর্ক নির্দেশক যে রূপিমগুলি অনুপস্থিত ছিল, সেগুলি এই রূপিম অর্জনের পর্যায়ে এসে তারা শিখতে শুরু করেছে। তাদের এই শেখার স্তরে বেশ কিছু বদ্ধ রূপিম যেমন রয়েছে (-কে, -রে, -এ), তেমনই রয়েছে প্রচুর মুক্ত রূপিমও (ওপরে, পাশে ইত্যাদি)।

৩.২.২.৩.১. সংবর্তন অর্জন স্তর transformation acquisition)

শিশুদের বচনের মধ্যে দীর্ঘ বাক্য বা বাক্যাংশ ঢুকে পড়ামাত্রই একাধিক বাক্যাংশ জুড়ে বড়ো বাক্য বা বাক্যাংশ গঠনের প্রবণতাও তৈরি হতে থাকে। ছোটো ছোটো সরল বাক্যাংশ নিয়ে নানারকম ভাষিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলি যুক্ত, বিযুক্ত, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি করে তা দিয়ে দীর্ঘতর বাক্য তৈরি করতে দেখা যায়। বাক্য গঠনের এই বিবিধ কৌশলের মধ্যে প্রথম তারা শেখে প্রশ্নবাক্য এবং নঞর্থক বাক্য গঠন করার পদ্ধতি। তাদের পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বাক্য সংবর্তনের বিভিন্ন সূত্র ক্রমশ তারা আয়ত্ত করতে থাকে, যার প্রতিফলন পাওয়া যায় তাদের উচ্চারিত বাক্‌প্রয়াসে। তাদের সংবর্তন আয়ত্ত করার প্রকৌশলটি বুঝতে হলে প্রাথমিক স্তরের যে-

কোনো একটি সংবর্তনকে ধরে আমরা আপাতত নঞর্থক বাক্যের সংবর্তন অর্জন করার পদ্ধতি নিয়ে বিশদে আলোচনা করছি।

নঞর্থক সংক্রান্ত ভাষা অর্জনের তথ্য পেশ করার আগে, নঞর্থক আন্বয়িক গঠনের অন্তর্নিহিত মূল বৈশিষ্ট্যগুলি একবার যাচিয়ে দেখে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমে দুটি বাক্য নেওয়া যাক— ১. মিত্রা পায়েস খাবে। ২. মিত্রা বাড়িতে বলে বেরিয়েছে। এই বাক্যগুলির না-বাচক রূপ দাঁড়াবে যথাক্রমে মিত্রা পায়েস খাবে না এবং মিত্রা বাড়িতে না বলে বেরিয়েছে অথবা মিত্রা বাড়িতে বলে বেরোয়নি। এখন এই বাক্য দুটির নঞর্থক গঠন আয়ত্ত করতে হলে একটি শিশুকে বুঝতে হবে ১) নঞর্থক অব্যয়টি সবসময়েই অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে এবং সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। এ ছাড়া, ২) সমাপিকা ক্রিয়ার পরে নঞর্থক অব্যয় কখন আলাদাভাবে বসে আর কখন যুক্ত হয়ে বসে, সেই ধারণাও তাদের থাকতে হবে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, নঞর্থক বাক্য শিশুরা ধারাবাহিক কয়েকটি পর্যায়ে শেখে। নীচে শিশুদের নঞর্থক বাগ্‌ভঙ্গি শেখার পর্যায়গুলি উল্লেখ করা হল। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, যে তিনটি শিশুর রূপিম অর্জনের নমুনা পূর্বের ছকে দেখানো হয়েছিল, সেই তিনটি শিশুরই নঞর্থক বাক্যের নমুনা এখানে পর্যায়ক্রমে দেওয়া হল।

প্রথম পর্যায়

আর না।	ঘুম না।
এই বলটা না।	মা নেই।
তুই না।	গাড়ি নেই।

প্রত্যেকটি নমুনার ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, শিশুরা নঞর্থক অব্যয়টিকে মুখ্য বিশেষ্যগুচ্ছর পরে বসাচ্ছে। অর্থাৎ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাক্যাংশের গঠন দাঁড়াচ্ছে এইরকম— উদ্দেশ্য + নঞর্থক অব্যয়। বাংলা বাক্যের অধিগঠনের কাঠামো যদি বিচার করা হয়, তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, অধিগঠনের বাক্য শোনার অভ্যাস থেকেই শিশুদের বাক্যের অধোগঠনে নঞর্থক অব্যয়ের এই নির্দিষ্ট স্থানটি নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্যায়

জানি না কেন হল।	কিছুতেই খাব না।
বলবে না তবু শুনব।	আমি তো বলিনি।
যাব না আমি।	ও একটুও ভালো না।

আগের পর্যায়টিতে নঞর্থক অব্যয় যেমন মূল বাক্য থেকে বাইরে আলাদাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, এখন এই পর্যায়ের বাক্ব্যবহারগুলি দেখে বোঝা যাচ্ছে ক্রমশ নঞর্থক অব্যয়গুলি বাক্যের মূল গঠনের ভেতরেই জায়গা করে নিয়েছে। দুটি বাক্যাংশ জুড়ে তৈরি হওয়া বাক্য 'জানি না কেন হল'-এর ক্ষেত্রে প্রথম বাক্যাংশটি নঞর্থক হলেও দ্বিতীয়টি তা নয়। যদিও বাক্যের অধোগঠনের দিকে তাকালে বোঝা যাবে প্রথম বাক্যাংশ আর দ্বিতীয় বাক্যাংশ অধিগঠনে বেশ কিছু সংবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। অধোগঠনের প্রথম বাক্যটি ছিল, 'জানি না' আর দ্বিতীয় বাক্যটি ছিল 'কেন হল'। এই পর্যায় থেকে বাক্যটিকে অধিগঠনের চেহারায় নিয়ে যেতে হলে দুটি সংবর্তন জরুরি—সংযোগ আর বিয়োজন। কিন্তু সেই সংবর্তনেরো আগে, অধোগঠনের বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের নির্দিষ্ট কয়েকটি আন্বয়িক বিন্যাস শিশু সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছে। প্রথম বাক্যাংশ 'জানি না'-এর ক্ষেত্রে, এটি এমন একটি বাক্য যার উদ্দেশ্য অংশটি উহ্য এবং বিধেয় অংশটিই মুখ্য। আর বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক বিন্যাস অনুযায়ী, নঞর্থক বাক্যের বিধেয় অংশেই নঞর্থক অব্যয়টি বসে, অর্থাৎ বাক্যের মূল অর্থটি যদি নঞর্থক হয়, তাহলে বাক্যের বিধেয় অংশে অবস্থিত ক্রিয়াগুচ্ছটির সঙ্গেই না-বাচক উপাদানটি বসে। বাক্যের উদ্দেশ্য অংশেও না-বাচক উপাদান যুক্ত হতেই পারে, কিন্তু তাতে মূল বাক্যটির অর্থ নঞর্থক হয়ে যায় না। যেমন—'তোমার ওখানে না-যাওয়াটাই ভালো'। এই বাক্যে উদ্দেশ্য হল 'তোমার ওখানে না-যাওয়াটা' আর বিধেয় হল 'ভালো'। এখন, উদ্দেশ্য অংশে একটি নঞর্থক উপাদান আছে। কিন্তু যেহেতু বাক্যের বিধেয় অংশে কোনো না-বাচক উপাদান নেই, তাই বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে নঞর্থকতা থাকলেও তার জন্য মূল বাক্যের অর্থটি নঞর্থক হয়ে যায়নি। অথচ, এই একই বাক্যে যদি বিধেয় অংশে উপযুক্ত স্থানে একটি না-বাচক উপাদান বসানো যেত, যদি বাক্যটি এরকম দাঁড়াত যে— 'তোমার ওখানে না-যাওয়াটা ভালো নয়।' তাহলেই দেখা যেত, বিধেয় অংশটি নঞর্থক হওয়ায় গোটা বাক্যটির অর্থই না-বাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি, উদ্দেশ্য অংশে কোনো না-বাচক উপাদান না থাকলেও বাক্যটির মূল অর্থ না-বাচক হতে পারে, যদি বিধেয় অংশটি নঞর্থক হয়ে থাকে। যেমন—'তোমার ওখানে যাওয়াটা ভালো নয়।' এক্ষেত্রেও, বাক্যটি অবশ্যই নঞর্থক হবে, উদ্দেশ্য অংশে না-বাচক উপাদান থাক বা না থাক, বাক্যের এই মূলগত নঞর্থক ভাবটি নির্ভর করে বিধেয় অংশে থাকা না-বাচক উপাদানের অস্তিত্বের ওপরে। ফলে, 'জানি না কেন হল' বাক্যটির অধোগঠনের প্রথম বিধেয়মুখ্য বাক্যাংশ 'জানি না'-এর গঠন শিশুটি নির্ভুলভাবে করতে পারলে বোঝা যায়, বাক্যের বিধেয় অংশে না-বাচক উপাদানের অবস্থান সম্পর্কে সে সচেতন এবং এক্ষেত্রে যে সেই না-বাচক উপাদানটি বিধেয় ক্রিয়ার আগে বসাতে হবে, সেই বিষয়টিও সে আয়ত্ত করতে পেরেছে। অধোগঠনের দ্বিতীয় বাক্যাংশটি 'কেন হল'। এটির ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য উহ্য রয়েছে এবং বাক্যাংশটি বিধেয়মুখ্য। এখন এই দুটি বাক্য অধিগঠনে যুক্ত হয়ে কীভাবে উচ্চারিত রূপটি পাচ্ছে, তা নীচে দেখানো হল।

সংবর্তনের প্রথম স্তর

মূল বাক্য

বাক্যাংশ ১   সংযোজক   বাক্যাংশ ২

কেন হল   (এটা-তা)   জানি না

বস্তুত এখানে সংযোজকটি সাপেক্ষ শব্দজোড়। যার ওপরে নির্ভর করে অধিগঠনে একটি যৌগিক বাক্য গঠনের অবকাশ তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ, অধিগঠনে পৌঁছোনোর প্রথম স্তরে বাক্যটির সম্ভাব্য রূপ: 'এটা কেন হল তা জানি না।' এরপর আসবে অধিগঠনে পৌঁছোনোর স্তরের দ্বিতীয় সংবর্তনটি, যেখানে এই সংযোজক সাপেক্ষ শব্দজোড় বিয়োজিত হয়ে মুছে যাবে এবং বাক্যাংশ দুটি কোনো দৃশ্যমান সংযোজক ছাড়াই অধিগঠনে উচ্চারিত হবে।

সংবর্তনের দ্বিতীয় স্তর

মূল বাক্য

বাক্যাংশ ১   বিয়োজন   বাক্যাংশ ২

কেন হল   (এটা-তা)   জানি না

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, অধিগঠনেরবাক্যটি এবার উচ্চারিত বাক্যের রূপটি পেয়ে গেছে। সুতরাং এই একটি বাক্য গঠন করতে গেলে শিশুটিকে প্রথম বিধেয়মুখ্য বাক্যের গঠন সম্পর্কে সচেতন হতে হয়েছে, নঞর্থক বাক্যে না-বাচক উপাদানটির অবস্থান আয়ত্ত করতে হয়েছে এবং বাক্যের সংবর্তনের স্বাভাবিক ভাষাগত নিয়মগুলিও সে বুঝতে পেরেছে।

ওপরে উল্লিখিত বাক্যগুলির ক্ষেত্রে 'যাব না আমি' বাক্যটিকেও আর-একরকমভাবে ভেঙে দেখানো যেতে পারে, এখানে বাক্যের সংবর্তনে কীভাবে উদ্দেশ্য আর বিধেয় পরস্পরের জায়গা বদল করে নিচ্ছে।

সংবর্তন

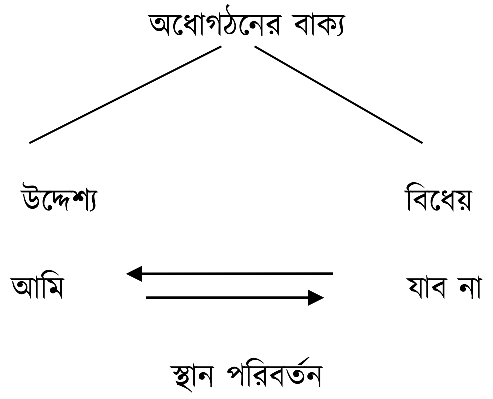

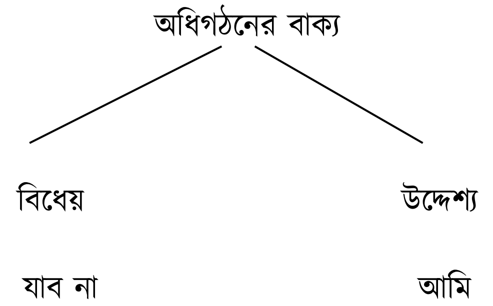

বোঝা যাচ্ছে, শিশুটি যখন এই বাক্যটি উচ্চারণ করছে, তখন সে না-বাচক উপাদানটির অবস্থান নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে এবং সেইজন্যই, উদ্দেশ্য আর বিধেয় তাদের প্রথাগত স্থান পরিবর্তন করে বিধেয় শুরুতে চলে এলেও শিশুর উচ্চারণে বিধেয় ক্রিয়াগুচ্ছের সঙ্গেই না-বাচক উপাদানটি এসে বসেছে। ফলে নঞর্থক বিধেয় ক্রিয়ার গোটাটা বসেছে বাক্যের শুরুতে আর শেষে রয়েছে বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে থাকা বিশেষ্য। এবার আসা যাক শিশুদের নঞর্থক বাক্যের আয়ত্তির তৃতীয় পর্যায়টিতে।

তৃতীয় পর্যায়

তুমি আমায় ধরতে পারবে না।

আমি কোনোদিন পাহাড় দেখিনি।

দিদির জ্বর হয়েছে তো, তাই দিদি আসেনি।

তুমি কাল গল্প বলবে না কেন?

আমি সবাইকে বকে দেব, কেউ তোমাকে বকবে না।

আমার তো বই নেই, কিন্তু বাবার অনেক বই আছে।

এই স্তরের প্রায় প্রতিটি বাক্যই আগের পর্যায়গুলির চেয়ে তুলনামূলক জটিল বিন্যাস প্রদর্শন করছে। নমুনার তিনটি বাক্যের গঠনে একাধিক বাক্যাংশ জুড়ে আছে এবং দুটির ক্ষেত্রে যৌগিক বাক্য গঠন করেছে। একেবারে শেষ বাক্যের নমুনাটি যদি ভেঙে দেখানো যায়, তাহলে দেখব, এখানে অধোগঠনে দুটি বাক্য রয়েছে এবং প্রথম বাক্যটি নঞর্থক। দুটি বাক্যের ক্ষেত্রেই বিধেয় অংশ অপেক্ষাকৃত সরল। মাত্র একটি ক্রিয়াপদ নিয়ে তৈরি হয়েছে অধোগঠনের বাক্য দুটির বিধেয়। প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে একটি আলংকারিক অব্যয় আছে, যার অবস্থান উদ্দেশ্য অংশে থাকা বিশেষ্যগুচ্ছটির অন্তর্গত সম্বন্ধ পদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে একটি বিশেষণ পদ রয়েছে, যার অবস্থান উদ্দেশ্য অংশে থাকা বিশেষ্যগুচ্ছটির সম্বন্ধিত পদের সঙ্গে সম্পর্কিত। সব শেষে, মূল সংবর্তনে অধোগঠনের বাক্য দুটিকে জুড়েছে সংযোজক ক্রিয়াপদ ‘কিন্তু’, যার ফলে গঠনগতভাবে অধিগঠনের বাক্যটি একটি জটিল বাক্যের রূপ পেয়েছে।

<u>সংবর্তন</u>

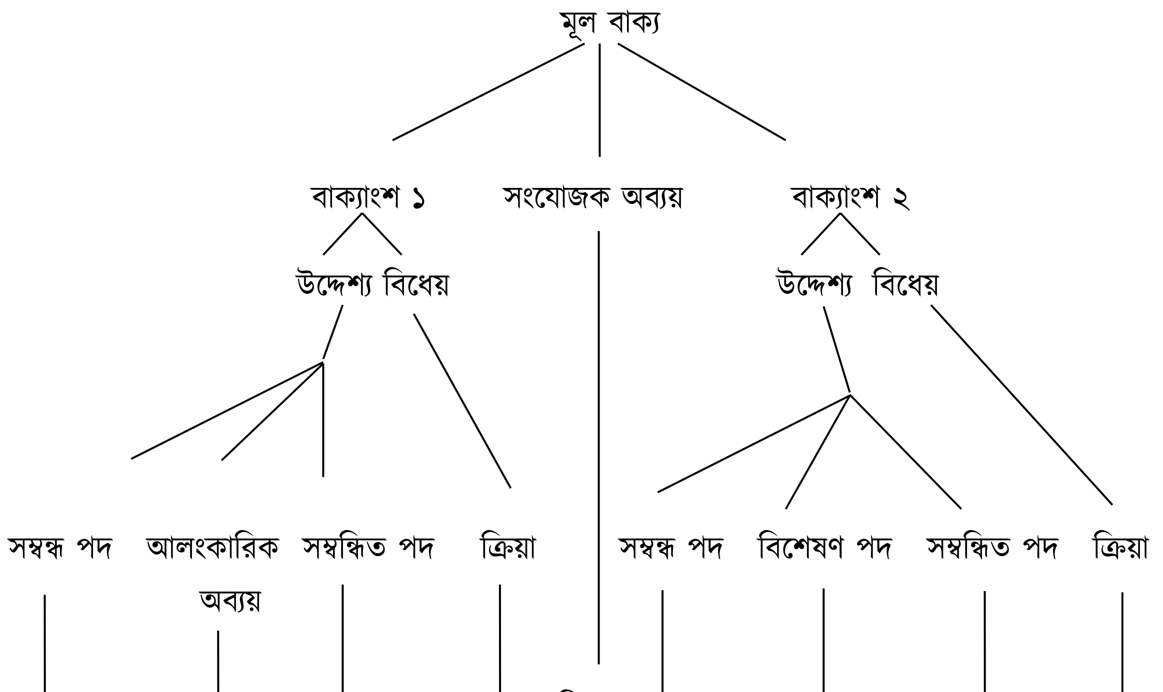

এই তৃতীয় পর্যায়ের মতো জটিল বিন্যাসের বাক্য শিশুদের আয়ত্ত করতে গড়ে পাঁচ বছর সময় লাগে। কর্মবাচ্যের বাক্যের মতো কঠিন সংবর্তনের বাক্য অর্জন করতে অবশ্য তাদের আর-একটু বেশি সময় লাগে। মোটাম,উটি দেখা গেছে, দশ বছর বয়সে তারা নির্ভুলভাবে কর্মবাচ্যের বাক্যের অর্থ বুঝতে পারে, অধিকাংশ শিশুই কর্মবাচ্যের কিছু তুলনামূলক সহজ বাক্য বলেও থাকে।

শিশুর একেবারে প্রাথমিক ধ্বনিগত অর্জনের পর্যায় থেকে শুরু করে জটিল সংবর্তনের প্রক্রিয়ায় উচ্চারিত বাক্যের আন্বয়িক গঠনের প্রকৌশল জানা এবং প্রয়োগের নীতি পর্যন্ত আলোচিত হল এই অধ্যায়ে। তবে, একটি বিশেষ সংযোজন এই প্রসঙ্গে করা দরকার। এই অধ্যায়ে শিশুর ভাষার বিকাশের যে স্তর, পর্যায়ভেদ এবং ক্রমের কথা বলা হল তা শারীরিকভাবে সুস্থ এবং গড় স্বাভাবিক শিশুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোনো জন্মগত বা বাহ্যিক কারণে যদি কোনো শিশুর ভাষাশিক্ষা ব্যাহত বা ত্রুটিপূর্ণ হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই নির্দেশিত পথটি ধরে তার ভাষিক অর্জন সম্পূর্ণ হবে না। সেটি পৃথক আলোচনা ও গবেষণার বিষয়।

সূত্রনির্দেশ

---

[১] Mix, Kelly S & Huttenlocher, Janellen & Levine, Susan Cohen. *Development in Infancy and Early Childhood.* New York. Oxford University Press. 2002. page 89

[২] Sachs, Jacqueline & Truswell, Lynn. 'Comprehension of Two-word Instructions by Children in the One-word Stage'. *Journal of Child Language.* United Kingdom. Cambridge University Press. 1978. page 17-24

[৩] Bellugi, Ursula & Brown, Roger. 'The Acquisition of Language: Report of the Fourth Conference Sponsored by the Committee on Intellective Process Research of the Social science Research Council'. *Monographs of the Society for Research in Child Development.* 92, Vol 29, No. 1. Indiana. Child Development Publication. 1964. page 191

[৪] Lenneberg, Eric H. *Biologial Foundation of Language.* First Corrected Printing. USA. John Wiley & Sons. 1967. page 196

[৫] Ott, Walter. *Locke's Philosophy of Language.* First Edition. United Kingdom. Cambridge University Press. 2004. page 126

[৬] Putnam, Hilary. *Mind Language & Reality: Philosophical Papers Volume 2.* United Kingdom. Cambridge University Press. 1975. page 435

[৭] Piaget, Jean & Inhelder, Barbel. *The Psychology of the Child.* First Print. New York. Basic Books. 1966. page 145

[৮] Lenneberg, Eric H. & Rebelsky, Freda G. & Nichols, Irene A. 'The Vocalizations of Infants Born to Deaf and to Hearing Process'. *Human Development.* Vol. 8. No. 1. 1965. page 25

[৯] Yampol'skaya, Tonkova. 'Development of Speech Intonation in Infants During the First Two Years of Life'. *Studies on Language Development of Children.* Ferguson, C.A. & Slobin, D. I. (Eds.) 1973. page 128-138

[১০] Lieberman, Alicia F. & Horn, Patricia V. 'Psychotherapy with Infants and Young Children'. *Repairing the Effects of Stress and Trauma on early Attachment.* New York. Guilford Press. 2008. page 143

[১১] Stark, Rachel E. & Rose, Susan N. & McLagen Margaret. 'Features of Infant Sounds: The First Eight weeks of Life'. *Journal Of Child Language.* Vol. 2. Issue 2. United Kingdom. Cambridge University Press. 1975. page 205-221

[১২] Gertrude, Moskowitz. 'Interaction Analysis: A New Modern Language for Supervisors'. *Foreign Language Annals.* Vol. 5. Issue 2. American Council on the Teaching of Foreign Languages. 1971. page 37-44

[১৩] Durand, Jacques. & Prince, Typhanie. 'Phonological Markedness, acquisition and Language Pathology: What is Left of The Jakobsonioan Legacy?'. *Neuropsycholinguistic Perspectives on Language Cognition.* CRC Press. 2015. Hal ID: halshs-01292259

[১৪] Velten, H V. 'The Growth of Phonemic and Lexical Patterns in Infant Language'. *Language.* Vol. 19, No. 4. Linguistic Society of America. 1943. Page 281-292

[১৫] Greenfield, P M. & Smith, J H. *The Structure of Communication in early Language & Development.* New York. Academic Press. 1976. Page 238

[১৬] Moskowitz, B A. 'The Acquisition of Language'*. Scientific American.* Vol. 239, No. 5. Scientific American: A Division of Nature America. 1978. Page 92-109

[১৭] Clark, H H. 'The Language as Fixed Effect Fallacy: A Critique of Language Statistics in Psychological Research'. *Jouranal of Verbal Learning & Verbal Behaviour.* Vol. 12. Academic Press. 1973. Page 335-359

[১৮] Greenfield, P M. & Smith, J H. *The Structure of Communication in early Language & Development.* New York. Academic Press. 1976. Page 241

[১৯] Bloom, L. 'Structure and Variation in Child Language'. *Monographs of the Society for Research in Child Development.* Vol. 40. No. 2. United States. Blackwell Publishing. 1973. Page 1-97

[২০] de Villiers, J G. & de Villiers P A. *Language Acquisition.* Cambridge. Harvard University Press. Blackwell Publishing. 1978. Page 312

চতুর্থ অধ্যায়

অ্যাফেজিয়া বা বাক্‌বিকার এবং ভাষা অর্জনে তার প্রভাব

অ্যাফেজিয়া বা বাক্‌বিকার এবং ভাষা অর্জনে তার প্রভাব

৪.১. ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় মস্তিষ্কের গুরুত্ব

ভাষা অর্জনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার নিরিখে শিশুর ভাষা বলতে শেখার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের স্নায়ুবিন্যাস ও তার কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং শিশুর বাক্‌বিন্যাস ও বুলি ফোটার ক্রমপর্যায় বর্ণিত হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলি ছাড়াও বিশেষভাবে সক্ষম ভাষাব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে ভাষা অর্জনে কিংবা ভাষা সংক্রান্ত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা থাকলে ভাষা শেখার পদ্ধতিতে বেশ কিছু বদল আসে। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে সেই বিশেষ সমস্যাগুলি নিয়ে। ভাষা সংক্রান্ত এই ধরনের সমস্যাগুলিকে সাধারণভাবে অ্যাফেজিয়া বা বাক্‌বিকার বলা হয়ে থাকে। এই বাক্‌বিকার বা বাক্‌বিকৃতি নিয়ে গবেষণা মূলত শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানীদের পরিসরে এই বিষয়টির আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগেই, এই ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান খোঁজার প্রচেষ্টা শুরু হয় মূলত চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, পরবর্তীকালে এই বিশেষ ক্ষেত্রটি ভাষাবিজ্ঞানের পরিধিতে স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান নামে গৃহীত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকান রেলওয়ে বিভাগের ফোরম্যান ফিনিয়াস গেজ-এর কথা অবশ্য উল্লেখ্য। ১৮৪৮ সাল নাগাদ এক সাংঘাতিক ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে পড়েন গেজ, একটি ফুট চারেক লম্বা লোহার রড তাঁর মাথার ওপর দিক দিয়ে প্রবেশ করে নীচের দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাঁচাই প্রায় অসম্ভব ছিল তাঁর, কিন্তু এই ঘটনা ঘটার পরেও আরও বারো বছর বেঁচে ছিলেন তিনি, এমনকি উপার্জনের জন্য শেষপর্যন্ত এই দুর্ঘটনাকেই মূলধন করেছিলেন গেজ। লোহার রডটি ঢুকে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে তুমুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গেজের মস্তিষ্কের বাম হেমিস্ফিয়ারে অবস্থিত ফ্রন্টাল লোবের অংশ, মাথার একদিকে তৈরি হয়েছিল অপ্রশস্ত একটি সুড়ঙ্গ। ডাক্তার জে এম হার্লোর চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলেও তাঁর ব্যবহারে এবং মানসিক আবেগের প্রকাশে কিছু সমস্যা দেখা দেয়, যদিও তাঁর ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ছিল অক্ষুণ্ণ। তবে, এর আগে পরিশ্রমী, দক্ষ এবং বিনয়ী কর্মী হিসেবে সুপরিচিত ফিনিয়াস গেজের চারিত্রিক লক্ষণে অসহিষ্ণুতা, পাশবিক আবেগের শক্তিশালী প্রকাশ এবং বিরক্তিসূচক বৈশিষ্ট্য বাড়াবাড়িরকম ফুটে ওঠায়, সুস্থ হওয়ার পরে কর্মজীবনে ফেরার চেষ্টা তাঁর সফল হয়নি। এমতাবস্থায়, গেজ টাকা রোজগারের পন্থা হিসেবে বেছে নিলেন নিজেকেই নিজে প্রদর্শন করার পথ, তাঁর খুলিতে তৈরি হওয়া ওই আশ্চর্য সুড়ঙ্গ দেখিয়েই উপার্জন করতেন তিনি। কিন্তু ফিনিয়াস গেজের এই ঘটনা চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানের জগতে স্মরণীয় হয়ে আছে ভাষা এবং মস্তিষ্কের সম্পর্ক নির্ধারণের জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে। মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলেই যে ভাষাব্যবহার ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এ ধারণার অসারতা প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবের পরিবর্তনজনিত কারণে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনাকে সত্যি করে দেখিয়েছিল গেজের এই দুর্ঘটনা। গেজের মৃত্যুর পর তাঁর সেই চিকিৎসক হার্লো গবেষণার জন্য বিশেষ অনুমতি নিয়ে পরীক্ষা করেন গেজের মস্তিষ্কটিকে। অবশেষে তিনি এই মতই[১]

দেন যে, ওই দুর্ঘটনা পরবর্তী জীবনে গেজের সামাজিক আচরণে যে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে, তার একমাত্র কারণ গেজের মস্তিষ্কের বেশ কিছু অংশ, বিশেষত বাম ফ্রন্টাল লোবের নিষ্ক্রিয়তা। গেজের এই ঘটনা প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল যে, প্রত্যক্ষ ভাষা ব্যবহারেই শুধু নয়, মানুষের আচরণগত ও ব্যক্তিত্বগত পরিবর্তন ঘটিয়ে তার ভাষিক প্রকাশে পরিবর্তনের জন্যও মানবমস্তিষ্কই দায়ী। কারণ, ভাষার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে মানসিক আবেগ ও সংবেদন। সেখানে কোনো তারতম্য ঘটলে, ভাষার ওপরেও তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।

৪.২. ভাষা ও আবেগের উৎস হিসেবে মস্তিষ্কের প্রাধান্য লাভের ইতিহাস

তবে, মস্তিষ্কই যে ভাষা উৎপাদনের ক্ষেত্র, তা প্রথম বলেন প্রাচীন গ্রিসের চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস। শুধু ভাষাই নয়, এমনকি চিন্তাশক্তি বা যুক্তিবোধ ছাড়াও মস্তিষ্ক যে অন্য যে-কোনো অনুভূতি এবং মেজাজেরও উৎপত্তিস্থল, এ কথা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই বলেছিলেন তিনি—"Men ought to know that from the brain, and from the brain alone, arise our pleasures, joys, laughter and jests, as well as our sorrow, pain, grief and tears."।[২] তাঁর ছাত্র ও সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শব ব্যবচ্ছেদ করতেন হিপোক্রেটিস, লক্ষ করতেন মানবমস্তিষ্কের সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুতন্তুগত সংযোগ। এই পর্যবেক্ষণই তাঁকে ওই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে সহায়তা করে। ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর এই তত্ত্বই সুপরিচিত হয়ে আছে 'cerebrocentrism' নামে।

তবে, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর এই 'সেরিব্রোসেন্ট্রিজম' বাতিল হয়ে গেল প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের ঘরানায়। আধ্যাত্মিক চেতনা এবং তত্ত্বমুখিতার ঢেউ আছড়ে পড়ায়, মস্তিষ্কের চেয়ে অধিক জোর দেওয়া হল 'heart'-এর ওপরে, হৃৎপিণ্ড অর্থে নয়, বরং হৃদয় অর্থে। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ সালে অ্যারিস্টটল বললেন, "The seat of the soul and the control of voluntary movement— in fact, of nervous functions in general— are to be sought in the heart. The brain is an organ of minor importance."।[৩] স্বাভাবিকভাবেই, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের এই তত্ত্বের নাম হয় 'cardiocentrism'। এই হৃৎপিণ্ড কীভাবে কাজ করে, তা নিয়ে অ্যারিস্টটল নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, আমাদের শরীরের ভিত্তি হল চারটি প্রধান দেহরস (humor)— রক্ত (blood), কফ (phlegm), হলুদ পিত্ত (yellow bile) এবং কালো পিত্ত (black bile)। এই চারটি দেহরস আসলে প্রকৃতির চারটি উপাদানকে মানবদেহে স্থাপন করছে— মাটি, জল, আগুন আর বায়ু। হৃৎপিণ্ড এই চারটি দেহরসের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। এই ভারসাম্য যখন ঠিকঠাক বজায় থাকে, তখন মানুষ রোগমুক্ত থাকে। কিন্তু এই ভারসাম্য বিনষ্ট হলেই দেখা দেয় যাবতীয় শারীরিক এবং মানসিক রোগ। হৃৎপিণ্ড যথাযথভাবে কাজ না করলেই তা রক্তের তাপমাত্রা বিপজ্জনকভাবে বাড়িয়ে দেয়। 'কার্ডিওসেন্ট্রিজম'-এ বিশ্বাসী তাত্ত্বিকদের মতে, মস্তিষ্কের ভূমিকা এইমাত্রই।

এর পর আবার নতুনরকমের উল্লেখযোগ্য কথা বললেন গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেন। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০-এর মধ্যে তিনি কাজ করে গেছেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল গ্ল্যাডিয়েটরদের মাথায় কোনো চোট বা বড়ো কোনো আঘাত লাগলে তার চিকিৎসা করা। এই কারণে তিনি জীবিত ও মৃত বহু মানুষের আঘাতপ্রাপ্ত মস্তিষ্ক দেখার সুযোগ পান। একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে গ্যালেনের সমসময়ে পোস্টমর্টেমের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এমন বেশ কিছু রোগীকে তখন প্রায়শই পাওয়া যেত, যাদের কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণে হয়তো করোটির হাড় ভেঙে মস্তিষ্ক অংশটি হয় দেখা যাচ্ছে, নয়তো তা বেরিয়ে এসেছে। তিনি লক্ষ করেন যে, মানবমস্তিষ্কের কিছু অংশ বেশ নরম, আবার কিছু অংশ তুলনায় বেশ শক্ত এবং খরখরে। তাঁর মনে হয়েছিল, মানুষের চিন্তনপ্রক্রিয়ার কার্যপ্রণালীর যাবতীয় দায়ভার ন্যস্ত থাকে ওই নরম অংশটির ওপরেই, এমনকি অনুভূতিও নিশ্চয় এই কোমল অংশ দ্বারাই চালিত হয়। আর অন্যদিকে, শক্ত অংশটি চালনা করে পেশির কাজ। পোস্টমর্টেম করে মানুষের মস্তিষ্ক দেখতে পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না বলেই, তিনি ইন্যান্য প্রচুর প্রাণীর মস্তিষ্ক অস্ত্রোপচার করে দেখে ধারণা করার চেষ্টা করেন। এই পর্যবেক্ষণের সময় তিনি খেয়াল করলেন যে, মস্তিষ্কের মধ্যে বেশ কিছু গর্ত (ventricle) আছে, যেগুলি তরলজাতীয় পদার্থ দিয়ে ভরা। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ একইসঙ্গে যেমন সেরিব্রোসেন্ট্রিজমকে আবার ফিরিয়ে আনল, তেমনই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল দেহরসের ধারণাকেও।

গ্যালেনের পরবর্তী প্রায় দু-হাজার বছর ধরে কিন্তু গ্যালেনের তত্ত্বই বলবৎ থেকেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভিয়েনার নিউরোঅ্যানাটমিস্ট ফ্রানৎস গল আর তাঁর ছাত্র জোহান স্পারঝেইম মিলে একটি তত্ত্ব খাড়া করলেন। তাঁরা বললেন, মস্তিষ্কের এক-একটি অংশ মানুষের এক-একটি কাজের জন্য উৎসর্গীকৃত। মস্তিষ্কের আকার আয়তন, ফোলা বা তোবড়ানো অংশ দেখে মানুষের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বলা সম্ভব। এই অদ্ভুত সহজ-সরল পদ্ধতির নাম ক্রেনিয়োস্কোপি। এইভাবে তাঁরা অপরাধী আর পাগলের মাথা পরীক্ষা করে দেখলেন। প্রচুর সংখ্যক মানুষের মাথা দেখার পর মস্তিষ্কের মধ্যে সাতাশটি অঞ্চল চিহ্নিত করলেন, যেগুলি নানারকম কাজের জন্য দায়ী। তাঁদের এই পদ্ধতিটি ফ্রেনোলজি নামে ইউরোপ ও আমেরিকায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এতটাই জনপ্রিয় হয় যে, রাজনৈতিক নেতা থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত মানুষেরা তাঁদের মাথার মাপ নিতেন। বিয়ের ক্ষেত্রে কোষ্ঠী মেলানোর মতো মাথার মাপ মিলিয়ে বিয়ের চল শুরু হয়। কিন্তু ভাষার দিক থেকে তেমন কোনো নির্দিষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ হাতে এল না।

মানুষের স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভাস সিস্টেমটা কেমন, তার বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। সেই সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে থ্যালামাস অংশটির গুরুত্ব আমরা জেনেছি। থ্যালামাসকে তুলনা করা হয় একটি জটিল রিলে স্টেশনের সঙ্গে। থ্যালামাসের বাম অংশটিই বিশেষত ভাষার ক্ষেত্রে এই কাজটি করে থাকে। দেখা যায়, এই বাম থ্যালামাস কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কথার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত পুনরাবৃত্তি (involuntary repeatation of words) দেখা যায় এবং রোগীর খুব সমস্যা হয় কোনো কিছুর

নাম মনে রাখতে। ১৯৭১ সালে ওজেমান আর ওয়ার্ড বিজ্ঞানীদ্বয় বললেন যে ভাষা আর স্মরণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে এই থ্যালামাস অংশটি।

ভাষা প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের মধ্যে দিয়ে সিগন্যাল কীভাবে চলাচল (transmission) করে তা দেখতে গেলে দেখা যাবে ডান দিক থেকে আসা খবর প্রথমে পৌঁছোয় বাম গোলার্ধে যেটি সাধারণভাবে ভাষার ক্ষেত্রে প্রকট (dominant) অংশ, অন্যদিকে বাম দিক থেকে আসা খবর ডান গোলার্ধে পৌঁছে, তারপর করপাস ক্যালোসামের মাধ্যমে এসে পৌঁছোয় বাম গোলার্ধে। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে বাম গোলার্ধ সমস্ত অডিটরি সিগিনালকে প্রসেস করতে পারে না। আবার দেখার ক্ষেত্রে যেসব স্থানিক কার্যকলাপ ঘটে, সেখানেও ডান গোলার্ধের ভূমিকাই মুখ্য। কোনো ব্যক্তির ডান গোলার্ধে আঘাত লাগলে তার সমস্যা হয় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাকে আলাদা করতে, ছবি আঁকতে, পাজল সমাধান করতে, মুখ চিনতে, কোনো দৃশ্যকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে। গবেষকরা বলেন যে ডান গোলার্ধ সামগ্রিকভাবে কোনো খবরকে বোঝে, কিন্তু বাম গোলার্ধ বোঝে অংশ ধরে ধরে (analytically, by parts)। সুতরাং ভাষার ক্ষেত্রে যে বাম গোলার্ধকে সাধারণভাবে এগিয়ে রাখা হয়, তা কিন্তু সবসময় সত্যি নয়।

আবার যদি প্রয়োজন হয়, তবে ডান গোলার্ধ ভাষা ব্যবহারের দায়িত্ব নিজেই পালন করতে পারে, তবে বাম গোলার্ধের মতো দক্ষতা তার নেই। ১৯৭৬ সালে দুই গবেষক ডেনিস আর হুইটেকর এমন তিনজন শিশুকে হাজির করেন, যাদের মস্তিষ্কের একটি করে গোলার্ধ চিকিৎসা করাতে গিয়ে বাদ গেছে। এই তিনজনের মধ্যে দুজনের ছিল শুধু ডান গোলার্ধ আর একজনের ছিল বাম গোলার্ধ। এদের বয়স যখন বছর দশেক, তখন এদেরকে কেন্দ্রে রেখে বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিক এবং মনোভাষাবৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। জটিল ভাষাগত প্রশ্নে, বিশেষত অন্বয়গত প্রশ্নের সামনে একমাত্র সেই শিশুটির ফলাফলি ভালো ছিল, যার বাম গোলার্ধ বর্তমান। তবে, এই শিশুটির ফলাফল দৃষ্টান্তমূলকরকম খারাপ হয়ে রইল দৃশ্য এবং স্থাননির্ভর প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে।

বাম গোলার্ধের সব অংশই যে একইরকম এবং সমানভাবে ভাষার ক্ষেত্রে কাজ করে, এমনটা একেবারেই ঠিক নয়। এই গোলার্ধের কোথাও কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভাষাব্যবহারের সব ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে যায় না। বরং কোন্ অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার ওপরে নির্ভর করে ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিকৃতি দেখা দেয়।

আসলে স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান দুটি পরস্পর সম্পর্কিত ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে— একটি হল মস্তিষ্কের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নিয়ে এবং অন্যটি হল ভাষা বিকৃতি (language disorder) নিয়ে। প্রথম অংশটি নিয়ে ইতিমধ্যেই একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই মস্তিষ্ক আর ভাষার সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে এই ভাষাবিকৃতি। সাধারণভাবে মস্তিষ্কের বিশেষ

কোনো অঞ্চলে আঘাতজনিত কোনো ক্ষতের সৃষ্টি হলে ভাষার বিকৃতি ঘটে। একে বলে বাক্‌বিকৃতি (aphasia)। যেহেতু মস্তিষ্কের কোনো অঞ্চল ভাষার সঙ্গে কীভাবে যুক্ত, তা বাইরে থেকে বোঝা কঠিন, তাই মস্তিষ্কের কোনো বিশেষ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভাষার ক্ষেত্রে তার কী প্রভাব পড়ল, সে দিকে লক্ষ রাখলে মস্তিষ্কের সেই বিশেষ অঞ্চলের ভূমিকা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। সুতরাং স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানে ভাষাবিকৃতির অসামান্য ভূমিকা আছে এবং সেই কারণেই ভাষাবিকৃতিকে একটি আলাদা ক্ষেত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাফেসিওলজি (aphasiology)।

দেহসংস্থানগত (anatomical) দিক থেকে আমরা দেখব কত ধরনের ভাষাবিকৃতি বা অ্যাফেসিয়া হতে পারে—

৪.৩. দেহসংস্থানের ভিত্তিতে অ্যাফেসিয়ার প্রকারভেদ

- পেরিসিলভিয়ান অ্যাফেসিয়া
  - ১। ব্রোকার অ্যাফেসিয়া
  - ২। ভেরনিকের অ্যাফেসিয়া
  - ৩। কনডাকশন অ্যাফেসিয়া
- বর্ডারজোন অ্যাফেসিয়া
  - ১। ট্রান্সকর্টিকাল মোটর অ্যাফেসিয়া
  - ২। ট্রান্সকর্টিকাল সেনসরি অ্যাফেসিয়া
  - ৩। মিক্সড ট্রান্সকর্টিকাল অ্যাফেসিয়া
  - ৪। ফ্রন্টাল অ্যাফেসিয়া
- সাবকর্টিকাল অ্যাফেসিয়া
  - ১। থ্যালামিক, স্ট্রিয়াটাল, প্যালিডাল এবং একই ধরনের ক্ষত থেকে অ্যাফেসিয়া
  - ২। শ্বেত বস্তুতে ক্ষত থেকে জাত অ্যাফেসিয়া
  - ৩। মারি-র কোয়াড্রিল্যাটারাল স্পেসের অ্যাফেসিয়া
- নন-লোকালাইজিং অ্যাফেসিয়া
  - ১। অ্যানোমিক অ্যাফেসিয়া
  - ২। গ্লোবাল অ্যাফেসিয়া

১৮৬১ সালে ফরাসি শল্যচিকিৎসক পল ব্রোকা এমন এক রোগীকে হাজির করলেন, যার কথা বলতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি অন্য লোকের কথা বুঝতে পারতেন, পড়তেও পারতেন। শুধু উচ্চারণ করতে পারতেন না। অটোপসি করে জানা যায়, তাঁর ফ্রন্টাল লোবের পস্টেরিয়র-ইনফিরিয়র অংশে একটি ক্ষত ছিল,

তাই তাঁর উচ্চারণসক্ষমতা বা 'faculty of articulate speech' বিষয়টি হারিয়ে গেছে। সুতরাং পরোক্ষে বোঝা গেল যে বাম গোলার্ধের ওই বিশেষ অংশটি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন্ ভূমিকা পালন করে। পল ব্রোকার নাম অনুসারে, এই অংশটির নাম হল ব্রোকার অঞ্চল এবং এই বিশেষ ভাষাবিকৃতিটির নাম হল ব্রোকার অ্যাফেসিয়া।

একইভাবে ১৮৭৪ সালে এমন কয়েকজন রোগীর খোঁজ পেলেন আর-এক চিকিৎসক কার্ল ভেরনিক। দেখা গেল, এই রোগীদের কথা বলতে কোনো অসুবিধা নেই, বরং তাঁরা অনর্গল কথা বলেন, কিন্তু সেই সব কথার কোনো অর্থ নেই। দেখা গেল, বাম গোলার্ধের টেম্পোরাল লোবে ক্ষত সৃষ্টির কারণেই এই ভাষাগত সমস্যাটি ঘটেছে। ব্রোকার মতোই, তরুণ জার্মান ডাক্তার কার্ল ভেরনিকের নাম জড়িয়ে গেল বাম গোলার্ধের ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে (ভেরনিকের অঞ্চল) এবং একই সঙ্গে এই বিশেষ রোগটির নামও হল ভেরনিকের অ্যাফেসিয়া।

সিলভিয়ান ফিশার-এর ঠিক ওপরে প্যারাইটাল লোবে যদি কোনো আঘাত লাগে, দেখা যায় সেই আঘাতপ্রাপ্ত মানুষটি কথ্যভাষা বুঝতে পারছেন, কিন্তু পরীক্ষকের কথা শুনে বলতে পারেন না। অর্থাৎ যদি এই ধরনের রোগীকে বলতে বলা হয় 'বরফকুচি', তিনি হয়তো বলবেন 'বসপতুচি'। আবার একইভাবে 'দূরদর্শন'কে হয়তো বলবেন 'দূহকটন'। ব্রোকা এবইং ভেরনিকের অঞ্চল জুড়ে থাকা স্নায়ুতন্তুগুচ্ছ, যার নাম আরকুয়েট ফ্যাসিকুলাস, সেটি যদি বিচ্ছিন্ন হয়, অর্থাৎ ব্রোকা আর ভেরনিক অঞ্চলের যোগসূত্র ব্যাহত হলে এই পারিবাহিক ভাষাবিকার (conduction aphasia) দেখা যায়।

মস্তিষ্কের টিউমার বা ট্রমার কারণে বা সম্মুখবর্তী সেরিব্রাল ধমনীতে রক্ত সঞ্চালনে বাধা ইত্যাদি নানা কারণে মস্তিষ্কে স্ট্রোক হলে সেই আঘাত থেকে যে ধরনের অ্যাফেসিয়া হয়, তাকে ট্রান্সক্রুরটিকাল মোটর অ্যাফেসিয়া বলে। এক্ষেত্রে বাম গোলার্ধের সাধারণ ফ্রন্টাল লোবের ওপরের দিকের পিছনের অংশে রক্ত সংবহম ক্ষতিগ্রস্ত হলে মস্তিষ্কের ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলের কোশগুলি মারা যায়। এর ফলে এই অ্যাফেসিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা নিজে থেকে মৌলিকভাবে কোনো কথা শুরু করতে পারে না। যদি প্রশ্ন করা হয়, "আপনি গতকাল কী করেছেন?" এঁরা হয়তো সেক্ষেত্রে এমন উত্তর দেবেন— "মানে... মানে... হচ্ছে না, মানে... অনেক কিছু করেছি।" কোনো পিকনিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে হয়তো বলবেন, "একটা বাচ্চা ছেলে... না... একটা মেয়ে... বাচ্চাটা খেলছে। কুকুর... না... ঘুড়ি... লোকটা... ঘুড়ি...।" কোনো কিছুর বর্ণনা বা কোনো তথ্যের ঠিকঠাক উল্লেখ করতে এঁরা অপারগ। বারবার কোনো না কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি এঁদের প্রিয় অভ্যাস।

ট্রান্সকর্টিকাল সেনসরি অ্যাফেসিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাম গোলার্ধের টেম্পোরাল লোবের নির্দিষ্ট কিছু অংশ। এর ফলে রোগীরা যা শোনেন তা বোঝেন না। যেটা শোনেন সেটাকেই মানে না বুঝে আউড়ে যান। বেশ গড়গড়িয়ে কথা বলেন, কিন্তু সেই কথার তেমন কোনো মানে থাকে না। ছোট ছোটো নির্দেশ বুঝতে

পারলেও, বড়ো বড়ো বাক্যের মানে বুঝতে এঁদের বেশ অসুবিধা হয়। যদি বলা হয়, ‘চোখ বোজো’, তাহলে তা হয়তো এঁরা করতে পারবেন, কিন্তু যদি বলা হয় ‘কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ডান হাত দিয়ে চোখের জল মোছো’, সেক্ষেত্রে এই ধরনের জটিল নির্দেশ অনুসরণ করে কাজটি সম্পন্ন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আশ্চর্যজনকভাবে এঁরা শোনা কথার নির্ভুল পুনরাবৃত্তি করতে পারেন, ধরা যাক, রোগীকে বলা হল “চলুন হেঁটে আসি”, তিনি বলবেন, “হেঁটে হেঁটে হেঁটে আসি আসি আসি হেঁটে...”, বা যদি প্রশ্ন করা হয় “আজ শরীরটা কেমন লাগছে?”, তিনি বলবেন “কেমন লাগছে... কেমন লাগছে...”। তোতাপাখির মতো এইভাবে শোনা কথা আউড়ে যাওয়ার প্রবণতার কারণে এই ধরনের অ্যাফেসিয়াকে ‘parroting’-ও বলা হয়।

অ্যাংগুলার জাইরাসে কোনো কারণে ক্ষতের সৃষ্টি হলে দেখা যায়, কথা বলার সময়ে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না, বিশেষত নাম মনে রাখার ক্ষেত্রে খুব সমস্যা হয়। আদ্রিয়ান আকমাইজান তাঁর বইতে[৪] এই সংক্রান্ত একটি উদাহরণ দিয়েছেন। একজন পরীক্ষক এবং বাক্‌বিকৃতির শিকার এক রোগী— এই দুজনের কথোপকথনের নমুনা তুলে ধরেছেন তিনি—

Examiner: Who is the president of the United States?

Aphasic: I can’t say his name. I know the man, but I can’t come out and say... I’m sorry...

এই ধরনের অ্যাফেসিয়াকে বলে অ্যানোমিক অ্যাফেসিয়া। একে ডিসনোমিয়া বা নমিনাল অ্যাফেসিয়াও বলা হয়। এই অসুখটি বংশগতও হতে পারে, আবার স্ট্রোক কিংবা ব্রেন টিউমারের কারণে প্যারাইটাল লোব বা টেম্পোরাল লোবের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও হতে পারে। এর কয়েকটি ভাগ নীচে দেখানো হল—

১। শব্দ নির্বাচন অ্যানোমিয়া – এক্ষেত্রে রোগী কোনো শব্দ বা পদের ব্যবহার হয়তো জানে, অনেকগুলি বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে থেকে নিজের উদ্দিষ্ট শব্দটিকে নির্বাচন করে নিতেও পারে, কিন্তু তার নাম বলতে পারে না। এরই একটা ধরন বলা যায় বর্ণসংক্রান্ত অ্যানোমিয়া। এই অ্যানোমিয়ার রোগীরা পৃথক পৃথক বর্ণকে আলাদা করে চিনতে পারে, কিন্তু কোনো একটা রঙের নাম বলতে পারে না। কিংবা কোনো জিনিসের রং কী তা বোঝে না।

২। সিমন্যাটিক অ্যানোমিয়া বা শব্দার্থগত অ্যানোমিয়া – এই রোগীরা শব্দের মানে ধরতে পারে না। এরা যে শুধু শব্দ বা পদ নির্বাচন করতে পারে না, তাই-ই নয়, চিনতেও পারে না। ফলে শপব্দ নির্বাচন অ্যানোমিয়ার রোগীদের মতো অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে থেকে এরা নিজেদের লক্ষ্য বিষয়টি আলাদা করে চিনতে পারে না। এমনকি, নাম বলে দিলেও বুঝতে পারে না।

৩। ডিসকানেকশন অ্যানোমিয়া – এক্ষেত্রে ভিস্যুয়াল কর্টেক্স ও ল্যাংগুয়েজ কর্টেক্স-এর মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ফলে রোগীকে কোনো জিনিস হাতে ছোঁয়ালে, বা তার আওয়াজ কানে শোনালে সে হয়তো চিনতে পারবে, এমনকি অনেক জিনিসের মধ্যে থেকে তাকে আলাদা করতেও পারবে। কিন্তু সেই জিনিসটিই তাকে চোখে দেখানো হলে সে আর তার নাম বলতে পারবে না।

এই ডিসকানেকশন অ্যানোমিয়ার আর-একটি ধরন হল কলোসাল অ্যানোমিয়া। করপাস কলোসাম ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই ধরনের অ্যানোমিয়া হয়। করপাস কলোসামের কোনো ক্ষতি হলে আসলে মস্তিষ্কের গোলার্ধ দুটির মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান ও পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভাষামুখ্য অঞ্চলে (বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ) সেনসরি তথ্যও পৌঁছোতে পারে না। তাই অনেক সময়ে দেখা যায়, এ ধরনের রোগীরা বাঁ-হাতে ধরে থাকা জিনিসের নাম বলতে পারছে না। অথচ সেই জিনিসটিই ডান হাতে ধরামাত্র সে তার নাম বলতে পারবে।

গ্লোবাল অ্যাফেসিয়া – শোনা কথা বোঝা এবং কথা বলা— উভয়তই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এই ধরনের অ্যাফেসিয়ার ক্ষেত্রে। মস্তিষ্কের ভাষা প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে আঘাত পেলে, বিশেষত ব্রোকার অঞ্চল বা ভেরনিকের অঞ্চল ক্ষতগ্রস্ত হলে সাধারণত এই ধরনের সমস্যা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিডল সেরিব্রাল আর্টারি স্ট্রোকজনিত কারণে এই অ্যাফেসিয়া হয়ে থাকে।

এই অ্যাফেসিয়ায় আরও অনেকগুলি অক্ষমতার জন্ম হয়। যেমন—

ক। অ্যালেক্সিয়া – এক্ষেত্রে রোগীর ডিসলেক্সিয়া দেখা দেয়। যদি তিনি জন্মগতভাবে ডিসলেক্সিক নাও হন, তাও এক্ষেত্রে ডিসলেক্সিয়া সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যাগুলি একের পির এক দেখা দিতে থাকে, যেমন স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও এঁরা পড়তে পারেন না, বানান বুঝতে পারেন না, তাড়াতাড়ি কোনো বিষয়ের ওপরে চোখ বোলাতেও পারেন না।

খ। অডিটরি ভার্বাল অ্যাগনোসিয়া – এক্ষেত্রে রোগী ভাষা বোঝা, শব্দ আবৃত্তি করা বা কোনো কিছু শুনে লেখার ক্ষমতা হারায়।

গ। অ্যাগ্রাফিয়া – এক্ষেত্রে রোগীরা লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন না, বানানও লিখতে পারেন না। এই ধরনের রোগীরা সামান্য কিছু প্রচলিত শব্দ (হ্যালো, এই যে, ওগো, হ্যাঁরে), বা কিছু বহুলপ্রচলিত পদগুচ্ছ (যাব্বাবা, ধ্যাত্তেরি, ভাল্লাগেনা, কী খবর, কেমন আছ), কিংবা ব্যক্তিগত অভ্যাসজাত কিছু বাক্‌ভঙ্গি (ইয়ে, মানে, বুঝলেন তো) মোটামুটি ঠিকঠাকভাবে বলতে পারে।

প্রাইমারি প্রগ্রেসিভ অ্যাফেসিয়া – এই অ্যাফেসিয়া কখনোই জন্মগত নয়। তবে অন্যান্য অ্যাফেসিয়ার মতো এটি স্ট্রোক বা মস্তিষ্কের আঘাত থেকেও হয় না। সাধারণত অ্যালঝাইমার্স কিংবা ফ্রন্টোটেম্পোরাল লোবের অক্ষমতা ইত্যাদি বিবিধ নিউরোডিজেনারেটিভ রোগ থেকে এই অ্যাফেসিয়া হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে যে ধরনের লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে দেখা দেয়, সেগুলি হল—

- কথা আটকে যাওয়া (halting speech)
- ভাষাব্যবহার চোখে পড়ার মতো কমে যাওয়া
- কথা বলতে গিয়ে ঠিক শব্দ খুঁজে না পাওয়া
- অস্বাভাবিক বিন্যাসের বাক্য বলা
- এক শব্দ বলতে গিয়ে অন্য শব্দ বলা (যেমন— 'টেবিল'-এর বদলে 'চেয়ার')
- ভুল উচ্চারণে বা দুর্বোধ্য উচ্চারণে শব্দ বলা। যেমন— নাক>ন্যাক, সরল>সলর ইত্যাদি
- একটা শব্দকে বোঝাতে গিয়ে অনেক বেশি কথা খরচ করা (যেমন, সোজা কথায় 'মুদির দোকান' না বলে ঘুরিয়ে বলা 'ওই যে জায়গাটায় চাল-ডাল-তেল-নুন কিনতে পাওয়া যায়')
- শোনার ক্ষমতা অটুট থাকা সত্ত্বেও একাধিক লোকের কথাবার্তা বুঝতে না পারা
- খুব সহজ শব্দের মানে হঠাৎ ভুলে যাওয়া
- চেনা বস্তুর নাম মনে রাখতে না পারা
- কাউকে চিনতে পারলেও নাম বলতে না পারা
- লিখতে অসুবিধা
- পড়তে অসুবিধা
- অস্বাভাবিক মাত্রায় বানান ভুল হওয়া
- পাটিগণিত কিংবা হিসেবের অনগকে সামান্য ক্ষেত্রেই ভুল হয়ে যাওয়া

৪.৪. বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামোয় মস্তিষ্কের পর্যবেক্ষণ ও ভাষা অর্জন সংক্রান্ত গবেষণায় তার গুরুত্ব

এ ছাড়াও আরও বেশ কিছু অ্যাফেসিয়া বিভিন্ন সময়ে চিহ্নিত করেছেন ভাষাগবেষক এবং চিকিৎসকেরা। তবে, ভাষা অর্জনের নিরিখে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে, সেই অ্যাফেসিয়াগুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এক্ষেত্রে করা হল না। তবে, অ্যাফেসিয়ার আলোচনার সূত্রটি ধরে বোঝা যায় যে, ভাষাসংক্রান্ত গবেষণা মূলত এগিয়েছে মস্তিষ্কগত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করাতে গিয়েই। স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানে গবেষণার এই ধারা একেবারে পালটে গেল বিশ শতকের সত্তরের দশকে এসে। মাথায় ক্ষত সৃষ্টি না হলে বা ভাষাবিকৃতি না থাকলেও যে গবেষণা চালানো যায়, তা দেখালেন দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যালান কোরমার্ক আর ইংল্যান্ডের গডফ্রে হাউন্সফিল্ড। আধুনিক কমপিউটার আর এক্স-রে-এর সাহায্যে তৈরি করলেন এমন এক যন্ত্র, যার সাহায্যে মস্তিষ্কের ছবি

তোলা যায়। তাঁদের এই প্রচেষ্টাই জন্ম দিয়েছিল 'কমপিউটারাইজড টোমোগ্রাফি' বা 'সিটি' পদ্ধতির। এই প্রক্রিয়ায় সম্ভব হল 'সফট টিস্যু'-র ছবি তোলা। পরবর্তী কয়েক বছরে প্রযুক্তি আরও এগিয়ে যাওয়ায় পাওয়া গেল 'পজিট্রন এমিশন ফোটোগ্রাফি' বা 'পেট' এবং 'ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং' 'এমআরআই'। অসুস্থ নন, অর্থাৎ মস্তিষ্কে কোনো চোট বা ক্ষত না থাকা মানুষেরও সক্রিয় অবস্থায় মস্তিষ্কের ছবি তোলা সম্ভব হল।

পেট স্ক্যানের ক্ষেত্রে রক্ত বা গ্লুকোজের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পদার্থকে মার্কার হিসেবে ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই তেজস্ক্রিয় মার্কার পজিট্রন ছাড়তে থাকে এবং যখন ইলেকট্রনের সঙ্গে পজিট্রনের ধাক্কা লাগে তখন এই দুই কণাই লুপ্ত হয়ে গিয়ে গামা রশ্মির সৃষ্টি হয়। রশ্মির দুটি গামা ফোটন বিপরীত দিকে বেরিয়ে যায় এবং সেটি ধরা পড়ে পেট স্ক্যানে। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমন্বিত জিনিসটি হাতে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করালে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মস্তিষ্কে পৌঁছোয়। এবার কোনো ভাষাগত কাজ বা টাস্ক যদি নির্দিষ্ট ব্যক্তির সামনে রাখা হয়, তাহলে তাঁর মস্তিষ্কের যে অংশটি সক্রিয় হয়ে উঠবে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই বিপাক কার্য বেশি হবে এবং একই কারণে সেখানে রক্তের জোগান বেশি হবে। রক্ত বেশি পরিমাণে এলে সেখানে ইলেকট্রন আর পজিট্রনের সংঘাত বাড়বে এবং গামা রশ্মির সৃষ্টি হবে। কমপিউটারের পর্দায় ভেসে উঠবে তার ছবি এবং মস্তিষ্কের সেই অংশটিকে চিনে নেওয়া সম্ভব হবে। একটা বিষয় আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, পেট স্ক্যানের সাহায্যে যদি আমরা দেখতে চাই মস্তিষ্কের কোন্ অঞ্চলগুলি ক্ষেত্রবিশেষে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তাহলে সবসময় কোনো না কোনো অরদেয় কাজের ভিত্তিতেই তা করতে হবে। সাধারণত, কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে ভাবতে হলে মানুষের মস্তিষ্কের সামনের অংশটি সক্রিয় হয়ে ওঠে, শব্দ উচ্চারণ করার সময়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে মস্তিষ্কের ওপরের দিকের অংশটি আর যখন বেশ কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করে টানা সরব পাঠ করা হতে থাকে, তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে মানবমস্তিষ্কের পিছনের অংশটি।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি মেডিকাল সেন্টারে মার্কাস র‍্যাচলে এবং তাঁর সহযোগীরা মস্তিষ্কে ভাষা-প্রক্রিয়ার বা 'ল্যাংগুয়েজ প্রসেসিং'-এর ধরন বোঝার জন্য পরপর বেশ কয়েকটি পেট স্ক্যান করেন এবং তার ফলাফলগুলি বিশ্লেষণ করেন। যাঁদের ওপরে এই পরীক্ষাগুলি চালানো হয়, শুরুতে তাঁদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক অবস্থার ছবিও নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের বলা হয় কমপিউটারের মনিটরের দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে। দ্বিতীয়বার যখন তাঁদের মস্তিষ্ক স্ক্যান করা হয়, তখন তাঁদের সামনে বেশ কিছু বিশেষ্য জাতীয় শব্দ রাখা হয়েছে। এই বিশেষ্য জাতীয় শব্দগুলি মনিটরে ভেসে ওঠে, আবার হেডফোনের মাধ্যমেও শোনানো হয়। প্রথম সেটের ছবিগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় সেটের ছবি তুলনা করে বোঝা গেল যে, বিশেষ্য বোঝার সময়ে মস্তিষ্কের কোন্ অঞ্চলটি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়বার আবার যখন এঁদের মস্তিষ্কের পেট স্ক্যান করা হয়, তখন তাঁদের বলা হয়েছিল যে ওই বিশেষ্যগুলিকে আওয়াজ করে পড়তে হবে। এখন দ্বিতীয় সেটের স্ক্যানের ছবির সঙ্গে তৃতীয় সেটের স্ক্যানের ছবিগুলিকে তুলনা করে বোঝা গেল যে, উচ্চারণ করে বলা বা 'স্পিচ প্রসেসিং'-

এর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কোন্ অঞ্চল সক্রিয় হয়ে ওঠে। এইভাবে, নির্দিষ্ট ভাষাগত কাজের সঙ্গে সঙ্গে পেট স্ক্যান থেকে প্রাপ্ত ছবির মধ্যে তুলনা করে বেশ কিছুদূর এগোনো গেল।

এই পরিকল্পিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া গেল, তা কিন্তু ভাষা-মস্তিষ্কের সম্পর্কে নতুন পথের সন্ধান দিল। ব্রোকা বা ভেরনিক-গেসউইন্ড মডেলে ভাষার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের যে স্থানিকতা বা 'লোকালাইজেশন'-এর কথা বলা হয়েছিল, এই পেট স্ক্যান তার অনেকটাই বাতিল করে দিল। দেখা গেল, কোনো বিশেষ অঞ্চলের পরিবর্তে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চল ভাষা উৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

পেট স্ক্যানের ক্ষেত্রে অসুবিধা হল যে, রক্তের মধ্যে তেজস্ক্রিয় মার্কার ঢুকিয়ে দিতে হয়, কিন্তু ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং বা এমআরআই এবং ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং বা এফএমআরআই-এর ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই। মস্তিষ্কের কোনো অঞ্চল যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন সেই অঞ্চলে বিপাক কার্য বেড়ে যাওয়ায় জ্বালানি হিসেবে ওই অঞ্চলে গ্লুকোজ আর অক্সিজেন হাজির হয়ে রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে। এফএমআরআই-এর মাধ্যমে মস্তিষ্কের সেই অঞ্চলটিকেই চিহ্নিত করা যায়, যেখানে সবচেয়ে বেশি অক্সিজেন জড়ো হয়েছে। আধুনিক স্ক্যানারের মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে অন্তত চারটি ছবি তোলা সম্ভব। মস্তিষ্ক যেহেতু কোনো উদ্দীপনায় সাড়া দিতে এক সেকেন্ডের অর্ধেক সময় নেয়, তাই দ্রুত স্ক্যানিং প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উদ্দীপনায় বা বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের অবস্থার ছবি ধরা পড়ে। অধিকাংশ গবেষকই যে সাধারণত এফএমআরআই করতে পছন্দ করেন, তার কারণ এই প্রযুক্তির মাধ্যমে এমন বেশ কিছু সিগনালকে ধরা যায় এবং মাপা যায়, যা পেট স্ক্যানের মাধ্যমে সম্ভব ছিল না। র‍্যাচেল তাঁর 'ভিস্যুয়ালাইজিং দ্য মাইন্ড' প্রবন্ধে[৫] বলছেন, "The method depends on the fact that many atoms behave as little compass needles in the presence of a magnetic field. By skillfully manipulating the magnetic field, scientist can align the atoms. Applying the radio wave pulses to the sample under these conditions perturbs the atopms in a precise manner. As a result they emit detectable radio signals unique to the number and state of the particular atoms in the sample... specifically, it (fMRI) can detest an increase in oxygen that occurs in an area of heightened neuronal activity."

এফএমআরআই নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল যে, মস্তিষ্কের মধ্যে প্রতিনিয়তই নানারকম গঠন ও পুনর্গঠন চলতে থাকে। যেমন ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি মনিটরে 'কুকুর' শব্দটি দেখতে পেল। এখন এই বিশেষ্যটির সঙ্গে কোনো সমাপিকা ক্রিয়া যোগ করতে বলা হলে তিনি যদি 'কুকুর' শব্দটির সঙ্গে 'ডাকে' বা 'দৌড়োয়'-এর মতো কোনো ক্রিয়াপদ জুড়ে দেন, তখন এই সক্রিয়তার পর্যায়টি যে সময়ে ঘটতে থাকবে, তখন এফএমআরআই-এর মাধ্যমে নিশ্চিত নিউরাল অ্যাকটিভিটির একটি ছবি পাওয়া যাবে। এই ঘটনার কিছু সময় পরে আবার যখন একই রকমের কাজ করতে বলা হবে ওই ব্যক্তিকেই, তখন এফএমআরআই-তে দেখা

যাবে যে, যে নিউরাল অ্যাকটিভিটি প্রথমে ধরা পড়েছিল, তা পুনর্গঠিত হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে অনেকটাই সরল হয়ে এসেছে।

মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ মাপবার আর-একটি পদ্ধতি হল ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম বা ইইজি। মস্তিষ্কের মধ্যে হয়ে চলা বিভিন্ন ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে নিউরোনের মাধ্যমে সৃষ্ট তরঙ্গের মধ্যে। খুলির সঙ্গে লাগানো ইলেকট্রোডের মাধ্যমে ইইজি এই তরঙ্গগুলিকে চিত্রায়িত করে। যখন ইইজি-র মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্কের এই তরঙ্গকে মাপা হচ্ছে, তখন কমপিউটারের প্রযুক্তির মাধ্যমে খুব অল্প সময়েই টাস্কের নিয়মিত বদল ঘটিয়ে ঘটিয়ে মস্তিষ্কের প্রতিটি ক্রিয়ার ক্রমাগত পরিবর্তনকে পৃথক করে দেখানো সম্ভব। অর্থাৎ গবেষকরা এটি মাপতেই পারেন যে, কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রেসপন্স বা ইউনিক ভোল্টেজ পরিবর্তন কতটা ঘটল। এই ভোল্টেজের পরিবর্তনকে বলা হয় 'ইভোকড পোটেনশিয়ালস' আর পরীক্ষা চলাকালীন প্রদত্ত টাস্কের সঙ্গে এই পোটেনশিয়ালের পরিবর্তনকে বলা হয় 'ইভেন্ট রিলেটেড পোটেনশিয়ালস' বা ইআরপি। এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন মেধা রাজাধ্যক্ষ, তাঁর 'এক্সপ্লোরিং স্পিচ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ' বইতে— "Computerised averaging techniques were used to record specific waves generated for each so-called cognitive event. Attention, perception, recognition are events that are required to understand meaning in language and generate 'Event Related Potentials' or ERPs. Language processing could now be studied by making real time recordings of ERPs."

তবে একথা বলা প্রয়োজন যে এই প্রত্যেকটি প্রযুক্তির কিছু নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন ইআরপি দিয়ে বোঝা যায় যে কেমনভাবে মস্তিষ্কের কোনো বিশেষ অঞ্চলের ক্রিয়াকলাপের ধরন বদলে যেতে পারে। কিন্তু পেট স্ক্যান বা এফএমআরআই দিয়ে চেনা যায় মস্তিষ্কের মধ্যে কোন্ অঞ্চলটি বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। তাই গবেষকরা কোনো একটি প্রযুক্তি বা পদ্ধতির ওপরে নির্ভর করেন না, বরং 'মাল্টি-মডেল ইমেজিং'-এর সাহায্য নেন। দুটি বা তার বেশি এ ধরনের প্রযুক্তির যৌথ ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক বেশি নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়।

তবে এতরকমের প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ভাষা ও মস্তিষ্কের সম্পর্ক যে খুব সহজেই ভেদ করে ফেলা গেল, এমনটা কিন্তু নয়। বরং রসিকতা করে বলা যায়, 'হযবরল'-এর গেছোদাদার মতো সে ক্রমাগতই জায়গা বদল করে চলে। মস্তিষ্কের পিছন দিকে ভিস্যুয়াল কর্টেক্স অঞ্চল সক্রিয় হয়ে ওঠে যখন মানুষ কোনো শব্দ শোনার চেষ্টা করে। কথা বলা বা 'স্পিচ'-এর ক্ষেত্রে মোটর অঞ্চল অংশগ্রহণ করে, অথচ এক্ষেত্রে যে সবসময়ে ব্রোকার অঞ্চলটিই সক্রিয় থাকবে, এমনটা নয়। আবার ভেরনিকের অঞ্চল এবং ব্রোকার অঞ্চল উভয়ই সক্রিয় হয়ে ওঠে যখন কোনো শব্দের অর্থ বোঝার প্রয়োজন হয়, বা কোনো ঠিক শব্দ বেছে নেওয়ার সময় আসে। আবার অদ্ভুতভাবে দেখা যায় যে, কোনো একটি টাস্ক যখন অনুশীলিত হয়, তখন আবার নতুন

কিছু নিউরোন এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে এবং নতুন ধরনের সার্কিট তৈরি হতে থাকে। যে সার্কিট বিশেষ্য চেনার কাজটি করল, দেখা গেল ক্রিয়াপদ তৈরি করার প্রসেসিং-এর সময়েও সেই একই সার্কিট ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল। তাই মস্তিষ্কের সংগঠন আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি নমনীয়।

আসলে, গল্পকথার গোয়েন্দারা যেমন গল্পের শুরুর দিকে রহস্যের আশপাশে ঘুরে বেড়ানো কোনো চরিত্রকেই তাঁদের সন্দেহের আওতার বাইরে যেতে দেন না, ঠিক তেমনই প্রযুক্তিও সেই একই পথ বেছে নিয়েছে ভাষা-মস্তিষ্কের রহস্য ভেদ করার ক্ষেত্রে। তাই হিউম্যান জিনোম প্রোজেক্ট-এর ওপরে নির্ভর করে ব্রেন অ্যাক্টিভিটি ম্যাপ প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছিল ২০১৩ সালে, যা আসলে মানবমস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরোনকে চোখে চোখে রাখবে এবং অনুসরণ করবে। এর সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে পরবর্তী দশ বছর পর্যন্ত। এই কাজে সম্ভাব্য খরচ তিন বিলিয়ন ডলার। এখন মানবমস্তিষ্কের সঙ্গে ভাষার সম্পর্কের এই রহস্য এতে উন্মোচিত হয় কিনা, বাস্তবে সেই অপেক্ষাই করবেন পরবর্তী স্তরের গবেষকরা।

সূত্রনির্দেশ

---

[১] Malcom Macmillan. *An Odd Kind of Fame: Stories of Phineas Gage*. Unites States. MIT Press. 2000. P 58

[২] Lindberg, David C. *The Beginnings of Western Science.* United States. Chicago University Press. 1993. P 822

[৩] Watkins, Alan. *Coherence: The Secret Science of Brilliant Leadership.* United Kingdom. KoganPage. 2014. P 40

[৪] Akmajian, Adrian & Deners, Richard A & Farmer, Ann K & Harnish Robert M. *Linguistics An Introduction to Language and Communication.* Cambridge. The MIT Press. Fifth Edition. 2001. P 69

[৫] Raichle, M E. 'Visualizing the Mind'. *Scientific American.* USA. Vol 270. Issue 4. 1994. P 58-64

পঞ্চম অধ্যায়

ভাষার বিন্যাস ও ভাষা অর্জনের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কয়েকজন ভাষাবিজ্ঞানীর কথা ও তাঁদের গবেষণা

৫. ভাষার বিন্যাস ও ভাষা অর্জনের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কয়েকজন ভাষাবিজ্ঞানীর কথা ও তাঁদের গবেষণা

ভাষা অর্জনের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটটি আলোচনার ক্ষেত্রে ধ্বনিতত্ত্বের যে গোড়ার প্রসঙ্গগুলি আলোচনার প্রয়োজন পড়ে, তার সূত্রে বেশ কয়েকজন ভাষাচিন্তক ও ভাষাবিজ্ঞানীর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এর আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা যে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলিকে পূর্বসূত্র হিসেবে হাজির করেছি, এই অধ্যায়ে সেই সূত্রগুলির উৎস, সূত্রগুলির প্রণেতা এবং সূত্রগুলি তাঁদের গবেষণায় কোন্ তাৎপর্যে নিহিত তা বোঝার চেষ্টা করব।

ভাষা এমনই একটি জটিল মাধ্যম যে, ভাষা অর্জন নিয়ে আলোচনা করতে বসলে শুধু মানবশিশুর ভাষা শেখার প্রক্রিয়াটি নিয়ে কথা বললেই চলে না, বরং ভাষার মতো একটি চিহ্ন ও সংকেতবিশিষ্ট কোডিং সিস্টেম কীভাবে নিয়মের বিন্যাসে আবদ্ধ হয় এবং সেই নিয়মগুলি ক্রমশ ভাষীদের দ্বারা আয়ত্ত হয়, সেই বিষয়টির আলোচনাও একইসঙ্গে প্রয়োজন। সেই নিরিখে এই অধ্যায়ে আলোচিত হল ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর, হেনরি সুইট, প্রাহা বৃত্তের ভাষাবিজ্ঞানীদের কথা এবং অবশ্যই নোয়াম চমস্কির কথা।

৫.১. ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর

সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর ছিলেন জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর পড়ানোর বিষয় ছিল তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত। কিন্তু সোস্যুরই বস্তুত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই ভাষার প্রকাশভঙ্গি, গঠন ও প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে যেভাবে উৎসাহ দানা বাঁধছে, তা মোটামুটি কাঁপিয়ে দিচ্ছিল সারা দুনিয়ার সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনাকেও। ভাষার কাঠামো নিয়ে এই স্ট্রাকচারালিস্ট বা আকরণবাদী ভাবনার জনক হলেন সোস্যুর। সেমিওটিকস বা চিহ্নবিজ্ঞানের অন্যতম রূপকার হিসেবেও তাঁর নাম স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে সোস্যুরের সঙ্গে তাঁর সমকালীন আরও যে দুজন-এর নাম অবশ্য-উচ্চার্য, তাঁরা হলেন এমিল দুর্খেইম এবং সিগমুন্ড ফ্রয়েড। এই তিনজনেরই মৌলিক বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনজনই বুঝেছিলেন, সাধারণভাবে জড়জগৎকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেভাবে ব্যাখ্যা করে, ঠিক সেই নিয়মনীতিগুলির দ্বারা কখনোই মানুষের চিন্তাজগৎকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ মানুষ কোনো ভৌত পদার্থের সমষ্টিমাত্র নয়, তার নিজস্ব একটি চিন্তাবিশ্ব রয়েছে, যা আসলে তার এতদিনকার অর্জিত সামাজিক ও ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবোধের ফসল। তাই, মানুষের যে-কোনো আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে তার পেছনে যে সামাজিক পটভূমিকা রয়েছে, তাকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না।

১৮৫৭ সালে যে পরিবারে সোস্যুরের জন্ম হয়, সেখানে অন্তত বিদ্যাচর্চার পরিবেশের অভাব ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই সোস্যুর ছিলেন মেধাবী। চোদ্দ বছর বয়স থেকেই জেনেভার মার্টিন ইন্সটিটিউশনে তাঁর যাতায়াত শুরু হয়। স্নাতকস্তরে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পাওয়ার পর জেনেভার জিমন্যাশিয়ামে ভরতি হওয়ার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও বাবার কথা মেনে তিনি জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভরতি হন। তখন তাঁর বয়স সতেরো। পারিবারিক ঘরানায় ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে সোস্যুর প্রাথমিকভাবে প্রকৃতিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু সে-সময়েই তাঁর আলাপ হয় এক পারিবারিক বন্ধু অ্যাডলফ পিকটেট ('Origines indo-europe´ennes-এর লেখক')-এর সঙ্গে। পিকটেটের সান্নিধ্য তাঁকে ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করে তোলে। তিনি জেনেভাতেই এক বছর ল্যাটিন, সংস্কৃত ও প্রাচীন গ্রিক অধ্যয়ন করেন। তবে জেনেভার পড়াশোনা সোস্যুরকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। এক বছর সেখানে পড়ার পর তাঁর মনে হয়, বছরটা যেন অনর্থক জলে যেতে বসেছে। ১৮৭৬ সালে তিনি এসে ভরতি হলেন লাইপৎজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে। লাইপৎজিগে আসার আগেই অবশ্য সোস্যুর প্যারিসের লিঙ্গুইস্টিক সোসাইটির সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন এবং সোসাইটির মুখপত্রে তাঁর লেখা ছাপা হতে শুরু করল। সে-বছরেই তিনি আরও দুটো প্রবন্ধ লেখেন এবং ঐতিহাসিক ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় আলোকপাতও করেন। তবে, তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি পঠিত হয় ১৮৭৭ সালের ১৩ জানুয়ারি, প্যারিস লিঙ্গুইস্টিক সোসাইটিতে। বিষয় ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির পারস্পরিক পার্থক্য। সেই মুহূর্তে ঠিক কারণনির্দেশ করতে না পারলেও সংস্কৃতের স্বরধ্বনির গঠন ও প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার স্বরধ্বনির গঠনে যে কিছু মৌলিক তফাত রয়েছে, তা তিনিই প্রথম বলেন এবং তালব্যধ্বনি সূত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃত হন।

লাইপৎজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সোস্যুর প্রথম যাঁর দেখা পেলেন, তিনি হলেন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বিশেষজ্ঞ হেনরিখ হবসমান (১৮৪৮-১৯০৮)। সোস্যুর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন সেমিনারে প্রাচীন ফারসি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য শুনতে যেতেন এবং ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলেন। এই হবসমানের কাছেই তিনি কার্ল ব্রুগম্যানের সঙ্গেও পরিচিত হলেন এবং ব্রুগম্যানের সেই বাঁকবদলকারী প্রবন্ধের কথা শুনলেন। প্রবন্ধের নাম ছিল 'Nasalis sonans in der indogermanischen grundprache'। এই প্রবন্ধে ব্রুগম্যান দেখিয়েছিলেন জার্মান ভাষার উৎস ভাষায় যে সিলেবল বা দলগুলিতে নাসিক্য দল রয়েছে, সেখানে স্বরধ্বনি ছাড়াও স্বাধীন দল বা সিলেবলের অস্তিত্ব রয়েছে। একই ঘটনা ঘটছে তরল ধ্বনিগুলির ক্ষেত্রেও। মনে রাখতে হবে, এই একই আবিষ্কার সোস্যুর নিজেও করেছিলেন, যখন তিনি জেনেভার স্কুলছাত্র, তখনই।

একবার দেখে নেওয়া যাক, সোস্যুর নিজে ঠিক কী কী পড়েছিলেন লাইৎপজিগে ছাত্র থাকাকালীন। তিনি লাইপৎজিগে চারটি সিমেস্টার (১৮৭৬-৭৭, ১৮৭৭-৭৮) কাটান। জর্জ কার্টিয়াসের (১৮২০-১৮৮৫) তুলনামূলক ব্যাকরণের কোর্সগুলি তিনি নিয়মিত করতেন, অগাস্ট লেসকিনের (১৮৪০-১৯১৬) কাছে পড়েন স্লেভনিক এবং লিথুয়ানিয়ান ভাষা, আর্নস্ট উইন্ডিশের (১৮৪৪-১৯১৮) কাছে কেলটিকের কোর্স করেন, হারমান

অসথফের (১৮৪৭-১৯০৯) কাছে প্রাথমিক সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং উইলহেলম ব্রনের (১৮৫০-১৯২৬) কাছে জার্মান ভাষার ইতিহাস চর্চা করেন। সোস্যুর নিজে বলেছেন, এই পর্যায়েই ব্রুগম্যানের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সে-সময় ব্রুগম্যান ছিলেন লাইপৎজিগের তরুণ তুর্কিদের অন্যতম মাথা।

১৮৭৬ সালে সোস্যুর যখন লাইপৎজিগে এলেন, তখন কার্ল ভার্নারের বয়স ৩০, ব্রুগম্যানের ২৭, অসথফের তখন ২৯, সিভার এবং ব্রনে দুজনেই তখন ২৬। সোস্যুর খুব শিগগিরই এই ভাষাতাত্ত্বিক দলের একজন হয়ে উঠলেন, এবং অনিবার্যভাবেই একসময় সোস্যুরের নিজের কাজ এঁদের সকলকেই ছাড়িয়ে গেল। কীভাবে, সে আলোচনায় আসছি একটু পরেই। ১৮৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে, ছাত্রাবস্থাতেই প্রকাশিত হল সোস্যুরের গবেষণাপত্র ‘Me´moire sur le syste´me primitive des voyelles dans les langues indo-europe´ennes’। এই কাজের বিষয় ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ভোকালিক সিস্টেম বা আদিম স্বরবিন্যাস। সমকালীন ভাষাতাত্ত্বিকরাও সোস্যুরের এই রচনাটিকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে সেযাবৎকালে রচিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের শিরোপা দিয়েছিলেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সোস্যুরের এই সাহসী থিসিসের বিষয়টি কিন্তু তাঁর সমকালীন ভাষাতাত্ত্বিকদের বেশিরভাগের কাছেই বোধগম্য হয়নি, ফলে তাঁর কাজের গুরুত্ব তাঁর মৃত্যুর পরেও বহুদিন পর্যন্ত অধরাই রয়ে গিয়েছিল। তিনি দাবি করেছিলেন যে, প্রোটো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার দীর্ঘ স্বরধ্বনিগুলি বিকাশ লাভ করেছে যথাক্রমে হ্রস্বস্বর এবং ঘোষ ধ্বনিগুলি থেকে। তাঁর এ বক্তব্যে প্রথম সায় দেন জার্জি কুরিলোউইকজ, ১৯২৭ সালে। সোস্যুরের পথ ধরে এগিয়েই তিনি হিত্তীয় ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেন। সোস্যুরের বলা ঘোষধ্বনির বিষয়টিকে পরবর্তীকালে সমর্থন জানান হারমান মোলার।

এর পরেই সোস্যুর চলে এলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানে দুটি সিমেস্টার (১৮৭৮-৭৯) জুড়ে তিনি হেনরিখ জিমার (১৮৫১-১৯১০) এবং হেনরিখ ওল্ডেনবার্গের (১৮৫৪-১৯২০) কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করলেন।

১৮৭৯-৮০তে সোস্যুর আবার লাইপৎজিগে ফিরে এসে তাঁর ডক্টরাল থিসিস জমা করেন। সে-বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লিথুয়ানিয়ায় পাড়ি জমান লিথুয়ানীয় ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্যে। লিথুয়ানীয় ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির মূল বিষয় অবশ্য আহৃত হয়েছিল লিথুয়ানীয় ভাষাগবেষক ফ্রেডরিখ কুরশ্যাটের গবেষণা থেকে। তবে, এই কাজটি কতদূর সোস্যুরের মৌলিক কাজ, সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারণ এর আগে লাইপৎজিগে থাকাকালীন লিথুয়ানীয় ভাষা শিখলেও, তা ছিল অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের ভাষাশিক্ষা। তা ছাড়া লিথুয়ানীয় ভাষা বলতে পারতেন না বলে সোস্যুর সে-বিষয়ে কুরশ্যাটের ওপরেই অনেকটা নির্ভরশীল ছিলেন। কুরশ্যাটের সঙ্গে তাঁর যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাও অজানা নয়। কুরশ্যাটের সঙ্গেই সোস্যুর ১৮৮০ সালের আগস্ট মাসে দুই সপ্তাহ ধরে লিথুয়ানিয়া ভ্রমণ করেন, কুরশ্যাটের বইও তিনি পড়েছিলেন জার্মান অনুবাদে।

১৮৮০ সালের শেষদিকে সোস্যুর প্যারিসে চলে আসেন এবং ১৮৮১ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত দশ বছর তিনি প্যারিসে সংস্কৃত, গথিক এবং ওল্ড হাই জার্মান পড়ান সুবিখ্যাত 'একোল প্রাতিক দে উতেজেকুদেস' নামক প্রতিষ্ঠানে। এসময় প্রচুর উৎসাহী ছাত্রের সংস্পর্শে তিনি আসেন, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আঁতোয়ান মিলেট (১৮৬৬-১৯৩৬), ল্যুই দ্যুভো (১৮৬৪-১৯০৩), হেনরি জর্জেস ডটিন (১৮৬৩-১৯২৮), মরিস গ্র্যামন্ট (১৮৬৬-১৯৪৬), পল পাসি (১৮৫৯-১৯৪০), পল বয়ার (১৮৬৪-১৯৪৯), জ্যাঁ সিচারি (১৮৫৪-১৯২৯) প্রমুখ। এর মধ্যে ল্যুই দ্যুভো পরবর্তীকালে প্যারিসে সোস্যুরের উত্তরসূরী হয়ে উঠেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আর্সেন ডারমেসটেটার-এর নামও উল্লেখ্য। বয়সে তিনি ছিলেন সোস্যুরের চাইতে দশ বছরের বড়ো, কিন্তু ১৮৮১-৮২ সাল জুড়ে তিনি সোস্যুরের ক্লাস করেছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে সোস্যুর এসময় বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এই পর্যায়েই তিনি প্যারিসের লিঙ্গুইস্টিক সোসাইটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন এবং সেখানেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৮৯১ সালের শেষ দিকে তিনি ফিরে আসেন জন্মভূমি জেনেভায়। ১৯০৬ সালে, সোস্যুর জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে জোসেফ ওয়ার্দেইমারের স্থানে পড়াতে আসেন। সেখানে সাধারণ ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে তিনি তিনটি কোর্স পড়িয়েছিলেন। প্রথমটি ১৯০৬-১৯০৭, দ্বিতীয়টি ১৯০৮-১৯০৯ এবং তৃতীয়টির মেয়াদ ছিল ১৯১০-১৯১১ সাল। সোস্যুর মূলত ছিলেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃতের অধ্যাপক। কিন্তু এই পর্যায়ে পড়াতে এসে সোস্যুর প্রায় বিপ্লব সৃষ্টি করলেন। এতদিন ধরে নিজের পড়াশোনা ও গবেষণার মাধ্যমে তিনি ভাষাতত্ত্বকে যেভাবে আত্মস্থ করেছিলেন, এবারে তার সুসংহত ও সজ্জিত একটি রূপ পেতে শুরু করলেন তাঁর ছাত্ররা। তবে, জীবিতাবস্থায় সোস্যুরের লিখিত প্রবন্ধ ও প্রকাশিত গবেষণার সংখ্যা এতটাই কম ছিল যে, তাঁর লেখাপত্র থেকে তাঁর আলোচনা কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির সিকিভাগের প্রতিফলনও পাওয়া যায় না। সোস্যুর মারা যান ১৯১৩ সালে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জেনেভার ছাত্ররা তাঁর মতামত ও বক্তব্যগুলির লিপিবদ্ধ একটি সংস্করণের অভাব অনুভব করেন। তখন, তাঁরই শ্রেণিকক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতাবলির নোটস সংগ্রহের কাজে অগ্রণী হয়ে ওঠেন তাঁর দুই ছাত্র শার্ল ব্যালি এবং অ্যালবার্ট সেশেহায়। অবশেষে তাঁর বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের নোট থেকে সাজিয়ে এই দুজন ১৯১৫ সালে প্রকাশ করেন বিশ্ববিখ্যাত 'Cours de Linguistique Generale' অর্থাৎ 'Course in General Linguistics' গ্রন্থটি। বইটি প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। আমূল পরিবর্তিত হতে থাকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের খোলনলচে। ১৯০৬-১৯১১ পর্যন্ত যাঁরা ছিলেন সোস্যুরের ক্লাসরুমের সরাসরি ছাত্র, তাঁরা সম্ভবত ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি যে তাঁরা কী প্রকাণ্ড যুগান্তকারী এক আবিষ্কারের সম্মুখীন হয়ে থাকার বিরল সৌভাগ্য তাঁরা অর্জন করেছেন। ফরাসি স্ট্রাকচারালিজমের জন্মই হয়েছিল সোস্যুরের মতবাদ থেকে সারবস্তু আহরণ করে। এমনকি আকরণবাদের পরবর্তী স্তরে চিহ্নতত্ত্ব বা চিহ্নবিজ্ঞানের যে যাত্রা শুরু হল, তার জনক হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেলেন সোস্যুর। আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব কিংবা বিজ্ঞানচর্চার ধারায় বিবিধ শাখাকে পুষ্ট করল সোস্যুরের চিহ্নবাদী স্ট্রাকচারালিজম। তাঁর মতবাদের উপরে দাঁড়িয়ে পুনর্বিন্যস্ত হল নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন।

সোস্যুর যে সময়টা জুড়ে পড়াশোনা করেছিলেন, তা ছিল মূলত ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব চর্চার যুগ। অর্থাৎ, ভাষার পরিবর্তনের রূপটি আলোচনার দিকেই সমকালীন পণ্ডিতবর্গের অনুসন্ধিৎসা জারি ছিল। কিন্তু এককালীন বা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা যেটুকু হত, তাও কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা নীতি মেনে হত না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই, এই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার কোনো সূত্রবদ্ধ আকার প্রতিষ্ঠা পায়নি তখনও। কিন্তু সোস্যুরের পূর্বাপর কাজগুলি খেয়াল করলেই দেখা যাবে, সোস্যুর নিজে কিন্তু ভাষাতত্ত্বের এই ঐতিহাসিক চর্চার ভাবধারা থেকে অনেকটাই সরে এসে একটি ভাষার ক্রমান্বয়িক বিকাশ ও রদবদল নিয়ে অনেক বেশি ভাবিত ছিলেন। এইবার পড়াতে এসে সোস্যুর প্রথমেই যেটা করলেন, তা হল এই ঐতিহাসিক বা কালক্রমিক (historical or diachronic) ভাষাতত্ত্ব এবং বর্ণনামূলক বা এককালীন (descriptive or synchronic) ভাষাতত্ত্বের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ। তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক অবশ্য ছিল বর্ণানামূলক ভাষাতত্ত্বের দিকেই এবং তিনি এই বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের নীতি ও চর্চাপদ্ধতিগুলি সুনির্দিষ্ট সূত্রের আকারে সংবদ্ধ করার প্রাথমিক কাজটি করেন। এজন্যই তাঁকে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি বুঝেছিলেন, একটি ভাষার পরিবর্তনের রূপরেখা নির্দেশ করা ছাড়াও ভাষা নিয়ে গবেষণার আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। ঠিক যেভাবে, একটি থেমে থাকা গাড়ি চলতে শুরু করল এবং ক্রমশ গতি বাড়িয়ে দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে গেল—এই ছবিটিকে যদি আমরা একটি ভিডিওচিত্রে রেকর্ড করে রাখি, তাহলে সেখানে ধরা পড়বে গাড়িটির স্থিতি থেকে গতিতে রূপান্তর ও ক্রমশ গতি পরিবর্তন করে ত্বরণসহ ধাবমান হওয়ার বিষয়টি। আবার, সেই গাড়িটিরই একটি স্থিরচিত্র যদি আমরা তুলি, তাহলে সেই চিত্রে ধরা পড়বে গাড়িটির খুঁটিনাটি গাঠনিক বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব কাজ করে দ্বি-কালীন কাঠামোর মধ্যে, ঠিক ওই ভিডিওচিত্রের মতো। 'ক' কাল থেকে 'খ' কাল কিংবা 'খ' কাল থেকে 'গ' কালে, অথবা 'ক' কাল থেকে 'গ' কালে ভাষা কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান সেই খতিয়ানকে তুলে ধরে। এজন্যই তার নাম 'diachronic'। কিন্তু এককালীন বা 'synchronic' ভাষাতত্ত্ব ভাষার এই কালিক পরিবর্তনকে গ্রাহ্য করে না। কোনো একটি নির্দিষ্ট কালের নিরিখে একটি ভাষার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তা-ই ধরা পড়ে তার আলোচনায়, পূর্বোক্ত উদাহরণের স্থিরচিত্রের মতো। সে একটি ভাষার 'ক' কাল, 'খ' কাল বা 'গ' কাল— যে-কোনো একটি কালের একটিই রূপকে বিশ্লেষণ করে। এই বিশ্লেষণ কিন্তু অপরাপর কালে ওই একই ভাষার রূপ নিরপেক্ষভাবে সাধিত হবে। ঠিক যেইমাত্র সোস্যুরের হাতে এই এককালীন ভাষাতত্ত্বের রূপটি সংজ্ঞায়িত হল, অমনি এককালীন ভাষাতত্ত্বের সূত্রনির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হল। তা হল, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে তার সংযোগ নির্মাণ। সোস্যুরের দেখানো পথ ধরে একটি ভাষার 'ক' এবং 'খ' সময়ের এককালীন রূপ দুটির বৈশিষ্ট্য একবার নিরূপণ করে ফেলতে পারলে তার নিরিখে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ব্যাখ্যার পথও সহজ হয়ে ওঠে। উপরন্তু, শুধু বিভিন্ন যুগে একটি ভাষার পরিবর্তনই নয়, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আলাদা আলাদা ভাষার মধ্যে পরস্পর মিল ও অমিলের জায়গাটিকেও

নিখুঁতভাবে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হতে পারে। ফলে, সোস্যুরের মতে, ভাষাতাত্ত্বিকের অন্বিষ্ট হওয়া উচিত ভাষার একটি বিশেষ পর্বের রূপ বা 'e´tat de langue'-এর আলোচনা করা।

সব মিলিয়ে, ভাষাতত্ত্বের যে আধুনিক রূপ, তার অনেকটাই গড়ে ওঠে সোস্যুরের হাত ধরে। তাঁর আগে পর্যন্ত ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা করতে গিয়ে কোনো একটি বা একাধিক ভাষার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি খণ্ডাকারে আলোচনা করার একটা প্রবণতা ছিল। অর্থাৎ, ভাষার ছোটো ছোটো উপাদানগুলিকে টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণ করে দেখানোটাই ছিল সেযুগের ভাষাতত্ত্ব চর্চার মূল ঝোঁক। কিন্তু সোস্যুর অনুধাবন করেন, এভাবে খণ্ডাকারে একটি ভাষার বিবিধ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার কোনো সার্থকতা নেই। তাতে সেই ভাষার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে কখনোই বুঝতে পারা যায় না এবং এমনকি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের কাজের ক্ষেত্রেও একটি ভাষার সামগ্রিক রূপ ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে অন্য ভাষার আলোচনার কাজটি অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। সোস্যুরের পূর্ববর্তী এই ভাষাতত্ত্ব চর্চার ধারাকে এইজন্যই খণ্ড ভাষাবিজ্ঞান বা অণু ভাষাবিজ্ঞান বা Micro Linguistics নামে অভিহিত করা হত। সোস্যুর প্রথম ভাষার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যের আলোচনার সমাহারে একটি ভাষার অখণ্ড পূর্ণরূপের আলোচনার কথা বললেন। তিনি দেখালেন, ভাষার এই ছোটো ছোটো বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করে তবেই একটি ভাষার সামগ্রিক আলোচনা সম্পূর্ণতা পেতে পারে। তাঁর প্রবর্তিত এই ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারাকে অখণ্ড ভাষাবিজ্ঞান বা সামগ্রিক ভাষাবিজ্ঞান বা Macro Linguistics নামে অভিহিত করা হয়। সেক্ষেত্রে, প্রশ্ন উঠতে পারে, শব্দভাণ্ডার সংক্রান্ত তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র কি ভাষাতাত্ত্বিকের পরিধি বহির্ভূত? ঠিক তা নয়, তবে এই আলোচনার যথার্থ স্থান হতে পারে ইতিহাসে। শব্দের মধ্যে দিয়ে ভাষিক রূপান্তর আসলে যে সামাজিক পটপরিবর্তনের আখ্যানকে ধরে রাখে, তা সমাজতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিকের আলোচনার জুতসই পরিসর হতে পারে। সোস্যুর এ বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছিলেন ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তিনি বলেছিলেন, ভাষার গঠন বা তার কাঠামোর বাইরে নিহিত যে ভাষাচর্চার পরিসর, তা হল বাহ্য ভাষাতত্ত্ব বা External Linguistics। আর আদ্যন্ত ভাষাতাত্ত্বিকেরই একান্ত আলোচনার যে পরিধি, তাকে তিনি বললেন অন্তর্ভাষাতত্ত্ব বা Internal Linguistics ।

বস্তুত সোস্যুরের এই মতবাদের ওপরে ভিত্তি করেই ভাষার আকরণবাদী (structuralist) চর্চার পথ চলা শুরু। সোস্যুর নিজে বহু ক্ষেত্রেই ভাষার অন্তরঙ্গ অর্থাৎ অর্থগত দিকটিকে সরিয়ে রেখে বহিরঙ্গের কাঠামো বিশ্লেষণের দিকে জোর দিয়েছিলেন। বস্তুত, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্যের জায়গাটাই হল ভাষার অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া বা না দেওয়া। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীদের প্রবণতা মূলত ভাষার অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে ভাষিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা। সেখানে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছেন ভাষার গঠনকাঠামোর উপরে। সোস্যুরের মতবাদকে বলা যায় এই গঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রস্তাবনা।

বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে সোস্যুরের আলোচনার বিষয় ছিল ভাষাতত্ত্বের প্রকৃত আলোচ্য বস্তু নির্দেশ করা। তা করতে গিয়ে সোস্যুর তিনটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। ল্যাংগুয়েজ, 'লাঙ্' ('La langue') এবং 'পারোল' ('La parole')। এই পরিভাষা তিনটির মাধ্যমে তিনি যথাক্রমে বুঝিয়েছেন ভাষা, সামূহিক বাচন ও একক বাচনকে। এর মধ্যে সবচাইতে বড়ো হল ভাষা, যা মানুষের যাবতীয় দেহগত এবং মানসিক প্রতিবেদনের প্রকাশরূপ। লাঙ্ হল মানুষের গোষ্ঠীগত ভাষিক প্রকাশ। তা একক মানুষের ভাষার ব্যবহারের থেকে পৃথক। আর এই ব্যষ্টি যখন সমষ্টির অন্তর্গত হয়ে ওঠে, তখন তার ভাষাব্যবহারে যে বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে ফুটে ওঠে, তা নিয়েই গড়ে ওঠে পারোল। অর্থাৎ, পারোল হল ব্যক্তিবিশেষে নির্দিষ্ট ভাষার রূপ। তবে, সোস্যুরের বক্তব্য থেকে এ বিষয়টা স্পষ্ট যে, পারোলকেই একমাত্র আমরা ব্যাবহারিক চেহারায় দেখতে পাই, বা বলা ভালো শুনতে পাই। লাঙ্ কিন্তু ভাষার বিমূর্ত রূপ। বাংলা ভাষার উদাহরণ টেনে বলা যেতে পারে, ঠিক কী কী উচ্চারণবৈশিষ্ট্য বা প্রয়োগের বিশেষত্ব থাকলে একটি ভাষাকে বাংলাভাষীরা বাংলা বলে শনাক্ত করতে পারবেন, সে বিষয়ে এই ভাষার প্রত্যেক ভাষীর মস্তিষ্কে একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে। ঠিক এই কারণেই, বাংলাভাষী বিভিন্ন মানুষ তাঁদের নিজস্ব স্বকীয়তার সঙ্গে এবং নিজস্ব মুদ্রাদোষ বা বিশেষত্ব আরোপ করে ভাষাটি বললেও অপর যে-কোনো বাংলাভাষী মানুষের কাছে সেটি বাংলা হিসেবে বোধগম্য হয়। একটি নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর সামান্য সম্পত্তি, ভাষাসংক্রান্ত এই সাধারণ ধারণাকেই সোস্যুর লাঙ্ হিসেবে চিহ্নিত করলেন। অন্যপক্ষে, লাঙ্ কিন্তু অপরিবর্তনীয়। তার কিছু অনড়, অচল, ধ্রুবক নিয়ম ও নীতি রয়েছে। সেখানে কোনো ব্যাবহারিক রদবদল ঘটানো সম্ভব নয়। ভাষাতত্ত্বের ভাষায়, ভাষা হল বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে এনকোডিং এবং ডিকোডিং-এর প্রক্রিয়ার মধ্যে বদ্ধ। সোস্যুরের বক্তব্য অনুসারে বলা যেতে পারে, বক্তা তাঁর নিজস্ব যে শৈলী প্রয়োগ করে একটি ভাষাকে এনকোডেড হিসেবে প্রকাশ করছেন, ভাষার সেই এনকোডেড রূপটি হল পারোল। আর বক্তা তাঁর মস্তিষ্কস্থিত যে ভাষিক ধারণার সাহায্যে সেই এনকোডেড বক্তব্যকে ডিকোড করে তার অর্থ গ্রহণে সমর্থ হচ্ছেন, সেই বিমূর্ত ধারণা হল লাঙ্। লাঙ্ স্থায়ী এবং এবং অপরিবর্তনীয় বলেই ভাষাতত্ত্বের আলোচনার বিষয় যে ভাষা, তা কিন্তু লাঙ্, তা পারোল নয়। কারণ, ব্যক্তিমানুষের ভাষাব্যবহারের বিশেষ চিহ্ন সাহিত্যের আলোচনার বিষয় হতে পারে, ভাষাতত্ত্বে বা ভাষিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। সোস্যুরের এই লাঙ্ ও পারোলের তত্ত্ব পরবর্তীকালে বিবিধ সমালোচনার মুখে পড়েছে, কিন্তু তার গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে ল্যুই হিয়েলমস্লেভ-এর 'স্কিমা-নর্ম-ইউসেজ-পারোল'-এর চতুর্বিন্যাসে কিংবা চমস্কির 'কমপিটেন্স-পারফরমেন্স'এর মধ্যেও সোস্যুরের এই লাঙ্-পারোল দ্বিবিন্যাসের ছায়াই দেখতে পাওয়া যায়।

সোস্যুরের আর-একটি বিশেষত্ব হল ভাষাকে চিহ্নের সমষ্টি রূপে দেখানো। তিনি লাঙ্কে বলেছিলেন যাবতীয় সংকেত বা চিহ্নের সমষ্টি। সোস্যুর যে সময়ে দাঁড়িয়ে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা করেছেন, তখনও চিহ্নবিজ্ঞান বা সেমিওটিকসের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু, তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, ভাষা আসলে একটি বাচিক প্রকাশ মাত্র, তাই চিহ্নতত্ত্বই ভাষা সংক্রান্ত আলোচনার প্রধান শাখা, ভাষাবিজ্ঞান তার উপশাখা হিসেবেই

একমাত্র মান্যতা পেতে পারে। এই সমগ্র চিহ্ন বা সংকেতের আলোচনা হয় যে শাস্ত্রে, তিনি তার নাম দিয়েছিলেন 'semiology' বা চিহ্নশাস্ত্র। গ্রিক শব্দ 'সেমিওন' (চিহ্ন বা সংকেত) থেকে এই নামটি গৃহীত।

তিনি বলেছিলেন, এই চিহ্নগুলি শুধুমাত্র শব্দের সমাহার নয়, এগুলির 'concept'। এ প্রসঙ্গে তিনি আবারও দুটি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন—সিগনিফায়ার আর সিগনিফায়েড, যাকে আমরা বাংলায় যথাক্রমে চিহ্নক বা দ্যোতক এবং চিহ্নিত বা দ্যোতিত বলতে পারি। ভাষার ধ্বনিপ্রতীকগুলিকে তিনি বলছেন, সিগনিফায়ার। সামাজিক বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের মনের মধ্যে যে স্মৃতিসমূহ এক-একটি প্রতীককে কেন্দ্র করে অর্জিত হয়েছে, সেই ধারণা বা ধারণার সমষ্টিকে চিহ্নিত করাই হল তাদের কাজ। সেজন্যই তাদের নাম চিহ্নক। আর এই প্রতীকগুলি যে ধারণা বা অভিজ্ঞতাজাত স্মৃতিকে সূচিত করে সেগুলি হল সিগনিফায়েড বা চিহ্নিত। তবে একটি ধ্বনিপ্রতীকের দ্বারা দ্যোতিত একাধিক সিগনিফায়েডকে কিন্তু স্বতন্ত্র বা পৃথক পরিসরে ফেলে ভেঙে আলোচনা করলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ এগুলি কোনো-না-কোনোভাবে পরস্পর সংলগ্ন। আবার, চিহ্নকের সঙ্গে চিহ্নিতের এই সম্পর্ক কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মজাত নয়। তাই এই ধ্বনিপ্রতীকগুলিকে সোস্যুর বলছেন আপতিক। অন্যদিকে, তাঁর মতে, 'The signifier, being auditory, is unfolded solely in time from which it gets the following characteristics: (a) it represents a span, and (b) the span is measurable in a single dimension; it is a line.'[১] অর্থাৎ, এই চিহ্নগুলি সময়ের সীমায় আবদ্ধ এবং রৈখিক। তা ছাড়া যেহেতু এই ভাষাপ্রতীকগুলির মধ্যে আপতিক গুণ রয়েছে, তাই এরা প্রত্যেকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরা কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়, যাকে সামাজিক ভালো বা মন্দের বোধ দিয়ে বেঁধে ফেলা যাবে। একটি অপেক্ষা অন্য প্রতীক কোনো অংশেই শ্রেষ্ঠতর বা নিকৃষ্টতর নয়। আর সেজন্যই ভাষাব্যবহারকারীদের মধ্যে এই চিহ্ন সংক্রান্ত কোনো পক্ষপাত বা নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। তার ফলে চিহ্নগুলির মধ্যে এক ধরনের স্থবিরত্ব দেখা যায়। এই স্থবিরত্বের অপর কারণ হল, ভাষাচিহ্নগুলি যে-কোনো ভাষারই সাংস্কৃতিক উপাদান ও সম্পদ। তাই ভাষা ব্যবহারকারীদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতাই থাকে চিহ্নগুলি সংরক্ষণ করে চলা। আবার একইসঙ্গে, এই চিহ্নগুলির মধ্যে জঙ্গমতার ধর্মও ক্রিয়াশীল। কারণ সংরক্ষণের তাগিদই এই ভাষাচিহ্নগুলিকে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বহন করে নিয়ে চলে। প্রজন্মান্তরে গতিশীল ভাষিক চিহ্নগুলির মধ্যে কালিক নিয়মেই কিছু পরিবর্তনের ছাপ পড়ে। ফলে ভাষিক চিহ্নের মধ্যে দুটি আপাতবিরোধী শক্তি সদাসর্বদাই ক্রিয়াশীল। এই আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ লিখছেন, 'মানুষ পূর্বপুরুষের কাছ থেকে এই প্রতীকগুলি পেয়েছে। আবার উত্তরপুরুষের হাতে তুলে দিচ্ছে। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাই যত সহজে বদলায়, ভাষা তত সহজে বদলায় না। পরিবর্তনে গতিও কোনো বৈপ্লবিক নীতিতে দ্রুততর করা যায় না। দ্য সোস্যুর বলেছেন, "যেহেতু প্রতীকগুলি আপতিক, সেজন্যই পরম্পরা ছাড়া আর কোনো নীতির দ্বারা এরা শাসিত নয়; আর যেহেতু এরা পরম্পরার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্যই এরা আপতিক।" '[২] এর উদাহরণ প্রসঙ্গে একটি সামাজিক প্রথার উদাহরণ টেনে তিনি বলেছিলেন, সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নিদর্শনস্বরূপ চিনারা সম্রাটের সামনে

মাটিতে ন-বার মাথা ঠেকিয়ে অভিবাদন জানায়। তাদের ক্ষেত্রে এটি সহবত প্রকাশের একটি চিহ্ন। এই চিহ্নটি মানুষের তৈরি, মানুষই একে বহন করে নিয়ে চলেছে এবং ক্রমশ একটি নিয়মের মর্যাদা দিয়েছে। মানুষ মর্যাদা দিয়েছে বলেই এই চিহ্নের মূল্য সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু আপাতভাবে সম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে এই আচরণের কোনো সম্পর্ক নেই। একইভাবে, প্রতীক ও তার সঙ্গে সংলগ্ন অর্থের সম্পর্কটিও আপতিক।

তা ছাড়াও, ধ্বনিপ্রতীক সম্পর্কে সোস্যুরের আর-একটি মতামতও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। সোস্যুর বলেছিলেন, এই ভাষিক চিহ্নগুলির গুরুত্ব নিহিত রয়েছে বহির্জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে মধ্যে, তাদের পারস্পরিক সজ্জার মধ্যে নয়। এই প্রসঙ্গে সোস্যুর ধ্বনিপ্রতীকগুলির 'একত্ব' এবং 'বাস্তবতা'-র উল্লেখ করেন। সোস্যুর দুটি বাক্যের উদাহরণ টেনে এনেছিলেন। প্রথম বাক্য, 'Je ne sais pas' আর দ্বিতীয় বাক্যটি হল 'No dites pas cela'। দুটি বাক্যেই যে সাধারণ পদটি রয়েছে, তা হল 'pas'। কিন্তু এই শব্দটি যে এক, তার কারণ কিন্তু নেহাত ব্যাকরণগত নয়। অর্থাৎ, দুটি শব্দেরই উচ্চারণ কিংবা অর্থ এক বলেই যে শব্দ দুটি এক, এমনটা নয়। শব্দ দুটি বহির্জগতের সবার কাছে একই প্রতীক বহন করছে বলেই শব্দ দুটি এক। বোঝানোর সুবিধার্থে ট্রেনের উদাহরণ দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ধরা যাক, যদি জেনেভা থেকে জুরিখে যাওয়ার জন্য আটটা পনেরোয় একটি ট্রেন রোজ আসে, তাহলে এক-একদিন এক-একরকম ট্রেন আটটা পনেরোয় এলেও আমরা তাকে একই ট্রেন বলব, হতে পারে, কোনোদিন সে ট্রেন কয়লাচালিত, কোনোদিন ডিজেল বা কোনোদিন ইলেকট্রিকচালিত। হতে পারে এক-একদিন তার বগির সংখ্যা এক-একরকম। কিন্তু, গন্তব্য ও সময় যদি এক থাকে, তাহলে তাকে আমরা একই ট্রেন বলব। আবার একই মডেলের ট্রেন যদি গন্তব্য ও সময় পালটে এসে হাজির হয়, তাহলে তাকে আমরা এক ট্রেন বলব না। আর ধ্বনিপ্রতীকের বাস্তবতা বলতে সোস্যুর বুঝিয়েছিলেন তাদের বিশেষত্ব ও সাদৃশ্যকে। সোস্যুরের মতে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাকরণগত মিল বা অমিল নির্দেশক বিভাজনগুলি অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ। ধ্বনিপ্রতীকের আসল মূল্য নিরূপিত হয় তাদের কাজ বা ভূমিকার মাধ্যমে। বিষয়টি প্রাঞ্জল করার জন্য সোস্যুর দাবার ঘুঁটির উদাহরণ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, দাবার কোনো একটি হারিয়ে যাওয়া ঘুঁটির বদলে আমরা যদি কাঠ বা পাথরের টুকরোও ব্যবহার করি, তাহলে সেই কাঠ বা পাথরের টুকরোটিই সেই মুহূর্তে ওই ঘুঁটিটির সমান মর্যাদা পায়। কারণ তার ওপরে সেই ঘুঁটিটির বদলে কাজ করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। অন্য ঘুঁটির সঙ্গে তার পার্থক্যের ওপরেই সেই মুহূর্তে তার মূল্য নির্ভর করছে। একইভাবে, উপাদানগুলি ব্যাকরণগতভাবে পৃথক কি না, সে প্রশ্ন অবান্তর, তারা ভাষিক অর্থ বহনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভূমিকা পালন করতে পারছে কি না সেটাই বড়ো কথা।

ভাষা বিষয়ে সোস্যুরের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল নিদর্শনী সম্পর্ক বা 'paradigmatic relation' এবং আন্বয়িক সম্পর্ক বা 'syntagmatic relation'-কে আলাদা করে চিহ্নিত করা। ভাষার মধ্যে একই জাতীয় যে উপাদানগুলি থাকে, তাদের মধ্যে অর্থগত বা রূপগত সাদৃশ্য নির্ণায়ক সম্পর্কটি হল নিদর্শনী সম্পর্ক। যেমন, 'অরূপবাবু শান্ত মানুষ।' এখানে এই বাক্যের পদগুলিকে আমরা একমাত্র সমধর্মী বা সমার্থক

পদ দ্বারাই প্রতিস্থাপিত করতে পারি। আমরা বলতে পারি 'শুভ্রা বুদ্ধিমান মেয়ে' , বা 'আনন্দবাবু ঘুষখোর লোক'। এখানে প্রতিস্থাপন হল সমধর্মী পদ দিয়ে। আবার আমরা এও বলতে পারি, 'অরূপবাবু ধীরস্থির লোক'। এখানে প্রতিস্থাপন হল প্রায় সমার্থক পদ দিয়ে। এখন এই পদগুলির মধ্যে যে সম্পর্ক, তা হল নিদর্শনী। প্রথমটির ক্ষেত্রে রূপগত এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অর্থগত সাদৃশ্যের বিচারে নিদর্শনী সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আবার, প্রথম বাক্যটিতে, 'অরূপবাবু শান্ত মানুষ' না বলে আমরা কখনোই 'শান্ত অরূপবাবু মানুষ' বলতে পারব না। কিন্তু, 'অরূপবাবু মানুষ শান্ত' বলতেও পারি। এই যে পদগুলিকে আমরা কিছু বিন্যাসের নিয়ম অনুসারে সাজিয়ে নিতে পারছি, এগুলি কিন্তু পরস্পর একেবারে সমধর্মী পদ নয়। অর্থাৎ বিন্যাসের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের বন্ধনে বাক্যটির পদগুলি পরস্পর গ্রন্থিত বা বাঁধা। এই পারম্পর্যের নিয়ম বা সম্পর্ককেই বলা হয় আন্বয়িক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক দুটি বোঝাতে গিয়ে সোস্যুর একটি বাড়ির সঙ্গে তার ধারক থামের উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, থামগুলির সঙ্গে বাড়িটির যে সংযোগ বা সম্পর্ক, তা হল আন্বয়িক। আর বাড়িটিতে যদি বিবিধ প্রকার ধারক থাম থেকে থাকে, তাহলে সেই থামগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি হল নিদর্শনী সম্পর্ক।

তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, সোস্যুরের এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পরে। উপরন্তু এ তাঁর শ্রেণিকক্ষের বক্তব্য ও আলোচনার সংকলন মাত্র। ফলে, এই বইয়ের বক্তব্যকেই যে সোস্যুরের চূড়ান্ত অভিমত হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, সেই বিষয়টির দিকে পাঠকের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ক্লাসনোটসের সংকলন বলেই হয়তো এই বইয়ের সম্পাদক ব্যালি ও সেশেহায়ও খেয়াল করেছিলেন যে, জায়গায় জায়গায় সোস্যুরের বক্তব্যের মধ্যেও কিছু অসম্পূর্ণতা, অস্পষ্টতা ও স্ববিরোধ রয়েছে। যদিও বইটি পড়তে গেলে এসব ভ্রান্তির জায়গা ততটা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে না। সম্ভবত, অধ্যাপকের অধরা কাজকে সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর সরাসরি ক্লাসরুমের ছাত্র হওয়ার খাতিরে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় থাকার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সম্পাদকদ্বয়ও এক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো সোস্যুরের বক্তব্য থেকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি বুঝে নিয়ে তাকে যথাযথভাবে সাজিয়েছেন। মিসিং লিঙ্কগুলি যাতে পাঠককে পীড়িত না করে, সেই বিষয়ে যত্নবান হতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে হয়তো মূল ক্লাসনোটের ওপরে কলম চালাতেও তাঁরা বিরত ছিলেন না। সেই হিসেবে বলা যেতে পারে, এখানে পাঠক একটি ত্রিস্তরীয় ভাষ্যের সন্ধান পেতে পারেন। প্রথমটি সোস্যুরের নিজস্ব বক্তব্য, দ্বিতীয়টি হল সেই বক্তব্যকে নিজের মতো অধিগ্রহণ করে তাঁর ছাত্রদের পুনর্লিখন (এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, এই পুনর্লিখনের সময় কেউই একে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার কথা ভাবেননি, ফলে সেখানেও যথেষ্ট অস্পষ্টতা, খণ্ডত্বের দোষ এবং ইঙ্গিতবহ আকারে বড়ো বিষয়কে লিখে রাখার সমস্যা ছিলই।) এবং তৃতীয় স্তরে সেই পুনর্লিখিত টেক্সটগুলি সম্পাদনা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য সম্পাদকদ্বয়ের আর-এক প্রস্থ পরিমার্জনা। ফলে, একথা ভুলে গেলে কখনোই চলবে না, এই বইতে সোস্যুর একা উপস্থিত নন, উপস্থিত রয়েছেন তাঁর ছাত্ররাও। এ বই আসলে সোস্যুরের ভাষাচিন্তার নিরবচ্ছিন্ন খতিয়ান নয়, তাঁর

ছাত্রশ্রোতাদের কাছে সোস্যুরের মতামত ঠিক কীভাবে অধিগৃহীত হয়েছিল, এ বই তারই লিখিত রূপ, বা বলা যেতে পারে শ্রোতাসমাজে সোস্যুরের প্রতিক্রিয়ার একটি দলিল।

৫.২. হেনরি সুইট

ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে একটা মজার কথা প্রচলিত আছে, 'ইউরোপকে কেউ যদি ধ্বনিতত্ত্ব শিখিয়ে থাকেন, তবে তিনি হলেন হেনরি সুইট'। সুইটের প্রথম দিকের আলোচনা ও আগ্রহের বিষয় অবশ্য ছিল মূলত বাঙমীমাংসা বা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান। কিন্তু ভাষা ও তার উচ্চারণ নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়েই ধ্বনিতত্ত্বের গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করেন এবং ক্রমশ ভাষার উচ্চারণগত বহির্প্রকাশ এবং সেই সূত্রে ধ্বনি সংক্রান্ত আলোচনা তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা এবং ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রগুলি নির্ধারণ করে তার মাধ্যমে ভাষাতত্ত্বের গোড়ার রূপটি তৈরি করার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল, তার অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে ইংরেজ ভাষাতাত্ত্বিক হেনরি সুইটের (১৮৪৫-১৯১২) নাম অগ্রগণ্য।

সুইটের জন্ম হয় লন্ডনের সেন্ট প্যানকাসে। ব্রুস ক্যাসল স্কুল এবং কিংস কলেজ স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ১৮৬৪ সালে খুব অল্প কিছুদিনের জন্য হাইডেলবার্গে তিনি পড়াশোনা করেন। এর বছর পাঁচেক পরে অবশ্য অক্সফোর্ডের ব্যালিওল কলেজে আবার তিনি জার্মান নিয়ে পড়াশোনা করতে আসেন। যদিও এবারেও প্রথাগত পড়াশোনার বাইরে নিজস্ব গবেষণা ও ভাষাসংক্রান্ত বিবিধ অনুসন্ধিৎসাই ছিল তাঁর জগৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে কোনোদিনই বিশেষ ভাবিত ছিলেন না সুইট। এমনকি, জানলে আশ্চর্য হতে হয়, অসম্ভব কৃতী এই মানুষটি অক্সফোর্ডে আসার বছর ছয়েক পরে যখন স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পুর্ণ করে বেরোচ্ছেন, তখন তিনি পাস করেছিলেন চতুর্থ বিভাগে! তার ওপরে স্বভাবের দিক থেকে যথেষ্ট দুর্মুখ ছিলেন সুইট। ফলে, অক্সফোর্ডের বেশ তালেবর কিছু গণ্যমান্যকে খুবই চটিয়েও রেখেছিলেন। খারাপ ফলাফল আর জনসংযোগের এই অভাব তাঁকে ভুগিয়েছিল সারাজীবন। তাঁর দেখানো তত্ত্ব যখন সারা দুনিয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছে, সেই সময়েও বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অক্সফোর্ডে অধ্যাপকের চাকরি জোটাতে পারেননি তিনি, সারাজীবন রিডার হয়েই ছিলেন। শেষদিকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক বেশ খারাপ হয়ে পড়ে। একুশ শতকের বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী রবার্ট হেনরি রবিনস তাঁর গ্রন্থে সুইট সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : 'He was temperamentally inclined towards the synchronic, descriptive aspects of linguistics, in part by his rather intense nationalism and his hostility towards the dominant historical linguistic scholarship which he rightly associated with Germany. As it happened, in the perversity of human affairs, recognition for being the outstanding scholar that he was came more readily abroad, and notably in Germany, than in this country, where his outspokenly critical bearing, suspiciousness, and in later years, his

justified resentment prevented him from ever attaining professional rank in a British university.'[৩]

কিন্তু এই অক্সফোর্ডের ছাত্রাবস্থা থেকেই হেনরি সুইটের বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে শুরু করে। অক্সফোর্ডের বিশ্ববিখ্যাত ফিলোলজিকাল সোসাইটি, পরবর্তীকালে তিনি যার প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করবেন, তার সুবাদেই 'ওল্ড ইংলিশ' বিষয়ে সুইটের লেখা একটি প্রবন্ধ ছাপা হয় এবং অত্যন্ত সমাদৃত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুইট 'লিটেরা হিউম্যানিওরেস' শীর্ষক যে বিভাগের ছাত্র ছিলেন, সেখানে মূলত প্রাচীন ও ধ্রুপদী সাহিত্যই পড়ানো হত। প্রাচীন গ্রিক, রোমান, লাতিন সাহিত্য পড়ার সুবাদে প্রাচীন ইউরোপীয় সাহিত্যরূপ হয়ে ওঠে সুইটের বিশেষ আগ্রহের বিষয় এবং এই সময় ক্রমশ প্রাচীন সাহিত্য ও ভাষারূপ সংক্রান্ত তাঁর বিবিধ লেখালিখির মধ্যে তাঁর অসামান্য দক্ষতা প্রকাশ পাচ্ছিল। সেইজন্যই, ছাত্রাবস্থাতেই তিনি যখন গ্রেগরি রচিত লাতিন 'কিউরা প্যাস্টোরালিস'-এর কিং অ্যালফ্রেড অনূদিত সংস্করণটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন, তখন তাঁর রচিত টীকা, ভাষ্য, টিপ্পনি, সংযোজনী শুধু যে বইটিকেই একটি ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল, তা নয়, বরং তাঁর সংযোজিত অংশটি প্রাচীন ইংরেজি ভাষার ঔপভাষিক তত্ত্ব বিচারের বনিয়াদ তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। ধ্রুপদী সাহিত্য ও প্রাচীন ভাষার টেক্সট নিয়ে ছাত্রাবস্থা থেকেই শুরু হওয়া এই লেখালেখির অব্যাহত ধারায় একে একে সুইট লিখলেন, 'অ্যান অ্যাংলো-স্যাক্সন রিডার' (১৮৭৬), 'দ্য ওল্ডেস্ট ইংলিশ টেক্সটস' (১৮৮৫), 'অ্যান আইসল্যান্ডিক প্রাইমার উইথ গ্রামার, নোটস অ্যান্ড গ্লসারি' (১৮৮৬) এবং 'আ স্টুডেন্টস ডিকশনারি অফ অ্যাংলো-স্যাক্সন' (১৮৯৬)।

তবে, যে বইটি সুইটকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল, তা হল 'আ হ্যান্ডবুক অফ ফোনেটিক্স' (১৮৭৭)। আসলে এই বইটি লেখার পিছনেও পরোক্ষে কাজ করেছিল মধ্যযুগের বিবিধ সাহিত্য নিয়ে সুইটের বিশদ পড়াশোনা। তিনি খেয়াল করেছিলেন, ভাষাচর্চার আধুনিক বিশ্লেষণী পদ্ধতি মধ্যযুগের সংশ্লেষণী পদ্ধতির সাপেক্ষে অনেকটাই অসম্পূর্ণ। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রতি নিজের পক্ষপাত প্রকাশ করে তিনি বলেওছিলেন, 'I, for one, am strongly of the opinion that our present exaggeratedly analytical methods, which are the fruit not only of scientific philology, but also of the elaboration of grammars and dictionaries, are a failure when compared with the synthetic methods of the Middle Ages...' সুইট তাঁর ধ্বনিতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রাথমিক তত্ত্বের কাঠামো আহরণ করেছিলেন আলেকজান্ডার মেলভিল বেলের 'ভিজিবল স্পিচ' তত্ত্ব থেকে। ব্রিটিশ ভাষাতাত্ত্বিক মেলভিল বেল মূলত উচ্চারণ এবং ধ্বনিসংস্থান নিয়ে কাজ করতেন। বধিরদের ভাষাশিক্ষা বিষয়ে প্রতিকূলতা কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে, সেই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে করতে ১৮৬৭ সালে বেল আবিষ্কার করেন তাঁর বিখ্যাত 'ভিজিবল স্পিচ' তত্ত্ব, যেখানে তিনি ভাষিক উচ্চারণকে দুটি ছোটো লিখিত আকারে প্রকাশ করেন। তিনি যাবতীয় উচ্চারণগত একককে ২৯টি মডিফায়ার এবং টোন, ৫২টি ব্যঞ্জনধ্বনি, ৩৬টি স্বরধ্বনি এবং ১২টি যুগ্মস্বরে ভেঙে

দেখিয়েছিলেন। এ ছাড়া সুইট প্রভাবিত হয়েছিলেন সিভারের দ্বারাও। লাইপৎজিগ স্কুলের খ্যাতনামা ভাষাতাত্ত্বিক এডুয়ার্ড সিভার ১৮৭৬ সালে দেখিয়েছিলেন কাব্যপঙ্‌ক্তিকে কীভাবে পড়া যেতে পারে। জার্মানিক ভাষার প্রাচীন কাব্যগ্রন্থগুলিতে পঙ্‌ক্তিবিভাজনের কোনো সুনির্দিষ্ট ধরন না থাকায় তার পাঠপ্রক্রিয়া নিয়ে ইতিপূর্বে বিস্তর মতান্তর তৈরি হয়েছিল। তার সমাধান হিসেবেই সিভার পাঁচরকম বিভাজনে কাব্যপঙ্‌ক্তি ভেঙে পড়ার কথা বলেছিলেন। শ্বাসাঘাতের রকমফেরের ওপরে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল তাঁর এই বিভাজন— স্ট্রেসড-আনস্ট্রেসড-স্ট্রেসড-আনস্ট্রেসড বা আনস্ট্রেসড-স্ট্রেসড-আনস্ট্রেসড-স্ট্রেসড ইত্যাদি। তবে, মেলভিল বেল এবং সিভার ছাড়া আর যাঁর দ্বারা সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন সুইট, তিনি হলেন আলেকজান্ডার জন এলিস। গণিতজ্ঞ এলিস ভাষায় ধ্বনির উপস্থিতিকে বিচার করেছিলেন প্রায় গাণিতিক সূত্রবদ্ধ এক-একটি রূপ হিসেবে। 'দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার' (১৮৪৫) এবং 'আ প্লি ফর ফোনেটিক স্পেলিং : অর, দ্য নেসেসিটি অফ অর্থোগ্রাফিক রিফর্ম' (১৮৪৮) গ্রন্থে তিনি ধ্বনিতত্ত্বকে অর্থোগ্রাফ দিয়ে প্রকাশ করার কথা বলেছিলেন। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত বই 'অন আর্লি ইংলিশ প্রোনানসিয়েশন'। বইটির বিষয় ছিল শেকসপিয়র এবং চসারের সাহিত্য থেকে তুলে আনা রেফারেন্সের ভিত্তিতে লিখিত ভাষায় বাক্‌ধ্বনির ব্যবহারকে খতিয়ে দেখা। তাঁর আলোচনার পরিধি শুরু হয়েছিল অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগ থেকে। সুইটের প্রারম্ভিক পড়াশোনা এবং লেখালিখি ও আগ্রহের বিষয়ের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় এলিস স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন।

ধ্বনিতত্ত্ব সংক্রান্ত এমনই নানা বিষয়ের নির্যাসকে নিজের মতো করে নিয়ে সুইট লিখলেন 'হ্যান্ডবুক অফ ফোনেটিক্স'। ভাষাকে বিভিন্ন আলাদা আলাদা ধ্বনির সমষ্টি বা ধ্বনিসমূহের যুক্ত রূপ হিসেবে শব্দের সমষ্টি না বলে তিনি বারবার জোর দিয়েছিলেন 'ধ্বনিসমূহ' বা 'উচ্চারণের প্রবাহ'-র ওপরে, যাকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন 'স্ট্রিম অফ স্পিচ' নামে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধ্বনিতত্ত্বের এই প্রাথমিক খসড়া প্রস্তাবে সুইট নিজে থেকেই কিন্তু নানাবিধ পরিভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনার সূত্রে বিবিধ পারিভাষিক প্রসঙ্গের অবতারণা করে তিনি বিশ্লেষণ (analysis) অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন সংশ্লেষণ (synthesis)-এর ওপর। তাঁর এই সংশ্লেষণ তত্ত্বের মূল কথা ছিল, ভাষার মূলগত একক হওয়া উচিত স্বতস্ফূর্ত প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্য, শব্দ নয়। তাঁর মতে, বাক্যকে শব্দে ভেঙে দেখানোর প্রচেষ্টা আসলে অনেকটাই কৃত্রিম। যদিও, অনেকেরই ধারণা, মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার একক শব্দ, কিন্তু মুখের ভাষার একক হিসেবে শব্দকে চিহ্নিত করা যায় না। লেখার ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এইভাবে হয়তো ভাবা যেতে পারে। কিন্তু মানুষ কথা বলার সময় কখনোই প্রতিটি শব্দের পরে একটু করে থামে না, যাতে শব্দগুলির পারস্পরিক পার্থক্য স্পষ্টত বোঝা যেতে পারে। অর্থাৎ, শব্দ কোনোভাবেই বাচনের একক হয়ে উঠতে পারে না। বরং, সুইট প্রস্তাব করলেন, শ্বাসের একক প্রচেষ্টায় উচ্চারিত অংশকে বাচনের একক হিসেবে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ এক দমে মানুষ যতটা কথা বলে, তাকেই তিনি উচ্চারণের একক বলতে চাইলেন, এই এককগুলিকে সুইট বললেন 'ব্রেথগ্রুপস' বা 'আটারেন্সেস'। এই এক-একটি ব্রেথগ্রুপ বা একক শ্বাসপ্রচেষ্টার মধ্যে শব্দ অবশ্যই থাকে, কিন্তু

কটি শব্দ থাকবে তা নির্ভর করে উচ্চারণের দৈর্ঘ্যের ওপরে এবং শব্দগুলিকে একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে রাখে শ্বাসাঘাত, সুরের ওঠাপড়া (intonation)। একেই তিনি চিহ্নিত করলেন 'উচ্চারণের প্রবাহ' (stream of speech) হিসেবে। এভাবেই সংশ্লেষণ তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়ে ১৮৯৯ সালে 'দ্য প্র্যাকটিকাল স্টাডি অফ ল্যাংগুয়েজেস' গ্রন্থে সুইট বললেন, শুধু ধ্বনিতত্ত্বের হিসেবে নয়, বাক্যতত্ত্বের সূত্র ধরেও যদি অগ্রসর হওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে, শব্দের কোনো অস্তিত্বই নেই! যা আছে, তা অবশ্যই বাক্য (আধুনিক ধারণা অনুসারে আমরা একে শব্দগুচ্ছও বলতে পারি) এবং সেই বাক্যই বিভাজিত হতে হতে তুলনামূলক ছোটো এককের দিকে অগ্রসর হয়। ভাষা কী, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অভূতপূর্বভাবে ভাষাকে সংজ্ঞায়িত করলেন তিনি, বললেন, 'Language is the expression of ideas by means of speech-sounds combined into words. Words are combined into sentences, this combination answering to that of ideas into thoughts.'

আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে সুইটের আর-একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল 'Elementarbuch des gesprochenen Englisch' (*১৮৮৫*), যা পরবর্তীকালে 'আ প্রাইমার অফ স্পোকেন ইংলিশ' (১৮৯০) নামে একটি বইয়ের রূপ পায়। এর বিশেষ গুরুত্ব হল, এতেই সুইট প্রথম 'এজুকেটেড লন্ডন স্পিচ'-কে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ তুলে ধরেন। সেই হিসেবে বলা যায়, একটি ভাষার মান্য রূপকে প্রমিত উচ্চারণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রথম কারিগর ছিলেন হেনরি সুইট। একটি বিশেষ ভাষার প্রচলিত প্রামাণ্য রূপকে দেখাতে গিয়ে সুইট তার পাশাপাশি ওই ভাষার অন্যান্য প্রচলিত রূপগুলিকেও ধ্বনিলিপি বা 'ফোনেটিক স্ক্রিপ্ট'-এর মাধ্যমে চিহ্নিত করে দেখিয়েছিলেন। সেই সূত্রে তিনি শর্টহ্যান্ডের একটি বিশেষ পদ্ধতিও ব্যবহার করেছিলেন, যাকে আধুনিক শর্টহ্যান্ডের সূত্রপাত বলা যেতে পারে। ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ ও তার ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে সুইটের শেষতম বই 'দ্য সাউন্ডস অফ ইংলিশ' (১৯০৮)।

ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে আজ যদি হেনরি সুইটের বিশ্লেষণ করতে হয়, তাহলে তাঁর সমকালের ভাষাবিজ্ঞানচর্চার আবহটি বোঝা জরুরি। গোটা উনিশ শতক জুড়েই ইউরোপে ধ্বনিতত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তবে, তখনও পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ডিসকোর্স হওয়ার মতো উপাদান জড়ো না হওয়ায়, সাধারণত একে কখনও শারীরবিদ্যা (অডিটরি ফিজিওলজি), কখনও বা অ্যাকাউস্টিকসের (অ্যাকাউস্টিক ফিজিকস) সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার প্রবণতা তৈরি হচ্ছিল। এই শতকের শেষের দিকেই আমরা দেখব বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষামূলক গবেষণা ফোনেটিক রিসার্চের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নেবে। বিশেষত, বানান সংস্কার ও ভাষাশিক্ষার দিকটিই এক্ষেত্রে গুরুত্ব পাচ্ছিল। কিন্তু, সুইটের ঠিক সমসাময়িক যুগে ফোনেটিকসের চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল বানান সংস্কার, ব্যঞ্জনধ্বনি নির্ণায়ক চিহ্ন সংযোজন ও সর্বজনীন ধ্বনিপ্রতীক বা ইউনিভার্সাল ফোনেটিক সিম্বল-এর প্রয়োগের মধ্যেই। তবে এই গবেষণা এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশ একটি বিপজ্জনক দিকে বাঁক নিচ্ছিল। ধ্বনি উচ্চারণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলিকে অর্থোগ্রাফির মাধ্যমে প্রকাশ করার ক্রমাগত

প্রয়াসের মধ্যে বিজ্ঞানীরা যতই সংস্কারপন্থী হয়ে উঠছিলেন, ততই অতিরিক্ত সাধারণীকরণ তাঁদের একটু হলেও আবদ্ধ করে ফেলছিল ভ্রান্তির সম্ভাবনায়। বহু ছোটো ছোটো চোখে পড়ার মতো ধ্বনিগত ফারাক কিন্তু তাঁদের অনেকেরই চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিল। একটি ধ্বনিপ্রতীক দিয়ে একটিই ধ্বনিকে প্রকাশ করার এই চেষ্টা যেহেতু প্রত্যেকেই তাঁদের নিজস্ব উচ্চারণসংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা বা ধারণা থেকেই করে চলেছিলেন, আরও বিশেষ করে বলতে গেলে, কোনো ধ্বনিমাপক যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই বিবিধ ভাষার এবং তাদের বিবিধ ঔপভাষিক বৈচিত্র্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে ধ্বনিপিছু প্রচুর ধ্বনিপ্রতীকের ব্যবহার সেসময় উঠে আসছিল, ফলে হাতেকলমে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধ্বনিপ্রতীক দিয়ে ধ্বনি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াটি অহেতুক জটিলতায় পর্যবসিত হয়েছিল। সুইটের প্রথম দিকের লেখাও কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ছিল না। তাঁর 'হ্যান্ডবুক অফ ফোনেটিকস' গ্রন্থে সুইট এমন কিছু ধ্বনিকে পরস্পরের থেকে আলাদা বলে চিহ্নিত করেছিলেন, যাদের পার্থক্য শুধুই উচ্চারণগত পরিবেশের ওপরে নির্ভর করে, অর্থাৎ, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের লব্জ ধার করে বললে, যেগুলি আদতে অ্যালোফোন বা সহস্বনিম মাত্র, সেগুলিকেও তিনি আলাদা স্বনিম হিসেবে গণ্য করে ফেলেছিলেন। আদর্শ ধ্বনিতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কিন্তু একই ধ্বনিগত পার্থক্য বা ফোনেটিক ডিফারেন্স কোনো একটি ভাষার ক্ষেত্রে এক ধ্বনি থেকে অন্য ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য তৈরি করলেও, অন্য ভাষায় সেই স্বাতন্ত্র্য নাও দেখাতে পারে। সেজন্যই এই পার্থক্য নিরূপক ধ্বনিবৈচিত্র্যকে নির্দিষ্ট একটি ভাষার নিরিখেই আলাদা চিহ্ন বা নোটেশনের মাধ্যমে বিশিষ্টভাবে দেখানো উচিত। যাই হোক, এই পারস্পরিক পার্থক্য নির্ণায়ক চিহ্নগুলির অধিকাংশই সুইট রোমান হরফে দেখাতে সমর্থ হলেও, কিছু চিহ্নের জন্য তাঁকে অন্য হরফের সাহায্য নিতে হয়েছিল। তাই তাঁর প্রচলিত এই উচ্চারণবৈশিষ্ট্য নির্ণায়ক চিহ্নের হরফগুলিকে তিনি 'ব্রড রোমিক' বলে অভিহিত করেছিলেন। যদিও, প্রচুর পার্থক্য ও সেই সংক্রান্ত বৈচিত্র্য তাঁর পর্যবেক্ষণের বাইরে রয়ে গিয়েছিল।

সুইটের ধ্বনিতাত্ত্বিক গবেষণার আর-একটি বিশেষ সীমাবদ্ধতার জায়গা হল, তিনি ধ্বনি নিয়ে কাজ করার সময় স্পষ্টতই স্বনিম সংক্রান্ত আলোচনা করছেন, কিন্তু তাঁর লেখায় কোথাও 'ফোনিম' পরিভাষাটির ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। যে-কোনো ধ্বনি বা সাউন্ড এবং বাক্‌ধ্বনি বা ফোনের সূক্ষ্ম পরিভাষাগত তফাতের দিকটি নির্দেশ করে পোলিশ ভাষাবিজ্ঞানী বোদ্যুয়াঁ দ্য ক্যুর্তনেই প্রথম 'ফোনিম' শব্দটি ব্যবহার করেন। যদিও তাঁর ফোনিমের তত্ত্ব প্রকাশ পায় ১৮৯৩ সালে, কিন্তু তার অনেক আগেই, এমনকি সুইটের সমকালেই তাঁর 'ফোনিম' সংক্রান্ত আলোচনা তৎকালীন ভাষাবিজ্ঞানীদের গোচরে এসেছিল। বস্তুত, সুইটের যাবতীয় গবেষণামূলক কাজ এবং লেখালিখির ধারা খেয়াল করলে এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি থাকে না যে, সুইট প্রাচীন ভাষা ও তার উচ্চারণ, ধ্বনিবৈশিষ্ট্য, তার ব্যাকরণ ও পূর্ববর্তী ভাষাবিজ্ঞানীদের সেই সংক্রান্ত কাজ নিয়ে যতটা মাথা ঘামিয়েছিলেন, তাঁর সমকালীন ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে তিনি ততটা সচেতন ছিলেন না। তাই সেই অর্থে প্রগতিশীল ভাষাবিজ্ঞানের আলো থেকে হেনরি সুইট আজও রয়ে গেছেন অনেকটাই অন্ধকারে। সমকালে, তাঁর নিজস্ব পরিধিতে সুইটের কাজের গুরুত্ব অনস্বীকার্য হলেও, খুব শিগগিরই তাঁর তত্ত্ব প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছিল এবং তার জায়গা নিয়েছিল পরবর্তী ভাষাবিজ্ঞানীদের দেওয়া আধুনিকতম ভাষাতত্ত্বের নতুন নজির ও হদিশ।

৫.৩. প্রাহাবৃত্তের ভাষাবিজ্ঞানী

১৯১০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত মধ্য ইউরোপে সাইকোঅ্যানালিসিস, নিও-পজিটিভিজম, ফেনোমেনোলজি, ওয়ারশ স্কুল অফ লজিক সহ বিবিধ তাত্ত্বিক পরিসরের চর্চা চলছিল বেশ জোরকদমে। ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুর ভাষাবিজ্ঞানে যে গঠনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছিলেন, এই সময়েই, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে ওঠে 'প্রাহা স্কুল অফ থট' বা 'প্রাহা সার্কল'। এই প্রাহা গোষ্ঠীর সূত্রপাত হয় ১৯২০ সালে। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাহা শহরে ডার্বি ক্যাফের মজলিশকে কেন্দ্র করে জমে ওঠা এই আলোচনাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিখ্যাত চেক ভাষাতাত্ত্বিক ভিলেম ম্যাথিসিউস। তাঁর সঙ্গে প্রাহা গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী নিকোলাই ত্রুবেৎস্কয়, রোমান জেকবসন, সের্গেই কারৎসেভস্কি, জ্যাঁ মুকারোভস্কি, খ্যাতনামা সাহিত্য সমালোচক রেনে ওয়েলেক প্রমুখ। প্রাহা গোষ্ঠীর বক্তব্য বা তত্ত্ব, সবের মধ্যেই যে আন্তর্জাতিকতার ছাপ ছিল, তার কারণ সম্ভবত বিভিন্ন ভৌগোলিক কেন্দ্র থেকে উঠে আসা বিচিত্র সদস্যদল, যাঁদের মধ্যে আটজন ছিলেন চেক, দুজন ছিলেন ফরাসি, একজন জার্মান আর এ ছাড়া বার্নো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইংরেজ অধ্যাপক, যিনি অবশ্য খুব বেশি যুক্ত ছিলেন না এই দলটির সঙ্গে। তবে, পরবর্তী কালে গোটা বিশ্বের কাছে প্রাহা গোষ্ঠী ভাষাবিজ্ঞানে প্রথম ফাংশনালিজমের প্রবক্তা হিসেবে যে পরিচিত হল, তার মূল কাণ্ডারী ছিলেন অবশ্যই ত্রুবেৎস্কয় এবং জেকবসন। ত্রুবেৎস্কয়ের আলোচনার মূল বিষয় ছিল ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞান, ম্যাথিসিউস মূলত কথা বলেছিলেন অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে, জেকবসনের বিষয় ছিল কাব্যতত্ত্ব এবং জ্যাঁ মুকারোভস্কি ভাষাতত্ত্বের নিরিখে কাব্যভাষার তাত্ত্বিক প্রয়োগ সংক্রান্ত অভিমুখ যোগ করেছিলেন। আমরা এই অধ্যায়ের শেষে প্রাহা গোষ্ঠীর বিশেষ কয়েকজনের অবদান বিষয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করব।

১৯২০ সালে রোমান জেকবসন তাঁর গবেষণার কাজে মস্কো থেকে প্রাহায় আসার পর, সেখানেই তাঁর দেখা হয় বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ভিলেম ম্যাথিসিউস এবং তাঁর সহকর্মী নিকোলাই ত্রুবেৎস্কয়ের। সের্গেই কারৎসেভস্কি তখন রাশিয়ান পড়াচ্ছেন জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সুইস ভাষাতাত্ত্বিক স্যোসুরের তত্ত্ব তাঁর সূত্রেই একটু একটু করে পরিচিত হচ্ছে প্রাহায়। এঁদের সবার সঙ্গে খুব শিগগিরই পরিচয় হল জ্যাঁ মুকারোভস্কি সহ প্রাহা গোষ্ঠীর অন্যান্য হবু সদস্যদের। ১৯২৬ সালের ২৬ অক্টোবর তাঁরা হেনরিক বেকার-এর 'Der europaische Sprachgeist' *শীর্ষক একটি বক্তৃতার মাধ্যমে* আনুষ্ঠানিকভাবে *তাঁদের আলোচনাচক্রটি প্রতিষ্ঠা করলেন*।

এই যে একদল সম্ভাবনাময় বুদ্ধিজীবী মিলে ভাষাবিজ্ঞানের নতুনরকম ভাবনার নজির নিয়ে একটি বিশেষ চিন্তকগোষ্ঠী তৈরি করলেন, যা সেযুগের আলোড়ন তো বটেই, এমনকি আজও সাহিত্য সমালোচনা ও ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে অকাট্যরূপে প্রাসঙ্গিক, এই গড়ে ওঠার পিছনে কিন্তু অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিল প্রাহার তৎকালীন পরিস্থিতি। বিশ শতকের কুড়ি থেকে তিরিশের দশকের যে সময়টা জুড়ে প্রাহা গোষ্ঠীর ভাষাচিন্তকরা তুফান তুলছেন ডার্বি ক্যাফের পেয়ালায়, ১৯২৬-এর মাঝামাঝি যখন আনুষ্ঠানিকভাবেই

তাঁদের গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, গোটা বিশ্ব তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচ পোয়াচ্ছে আর প্রাহার শিল্পী সাহিত্যিকরা মধ্য ইউরোপের দেশগুলিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। তাঁদের সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপ, শিল্পবোধজাত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুক্তচিন্তাজাত সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রভাবিত করেছিল এই গোষ্ঠীর সদস্যদের। প্রাহাকে এই কারণেই বলা হত 'আইলস অফ ফ্রিডম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ইন সেন্ট্রাল ইউরোপ'। প্রাহা গোষ্ঠীর ভাবনাচিন্তা বৈপ্লবিক ত্বরণে ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতেও। ১৯৬২ সালে লেখা 'দ্য এথনোগ্রাফিক স্পিকিং' শীর্ষক গবেষণাপত্রে ডেল হাইমস প্রাহা গোষ্ঠীর ক্রিয়াবাদী তত্ত্বকে আমেরিকান লিঙ্গুইস্টিক অ্যানথ্রোপলজির প্রাথমিক গোড়াপত্তন হিসেবে চিহ্নিত করেন[৪]। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ক্রমশ এই একটি গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে ভাষাতাত্ত্বিকদের জড়ো হওয়া ও পারস্পরিক আদানপ্রদানের অভ্যস্ত পরিসরটি বিবিধ কারণে সংকুচিত হয়ে আসে। যুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া দখল হয়ে যাওয়ার পরপরই এই গোষ্ঠীতে ভাঙন ধরে। জেকবসনকে অভিবাসন নিয়ে চলে যেতে হয় আমেরিকায়, ক্রুবেৎস্কয়ের মৃত্যু হয় ১৯৪২ সালে, ম্যাথিসিউস মারা যান ১৯৫২য়। এই গোষ্ঠীর শেষ জমায়েত হয়েছিল ১৯৫২ সালের ১২ মে। কিন্তু জে আর ফার্থ ও মাইকেল হ্যালিডের নেতৃত্বে তৈরি হওয়া ইংরেজ ভাষাতাত্ত্বিকদের গোষ্ঠী কোপেনহেগেন স্কুল থেকে প্রাহা স্কুল নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ফাংশনালিস্ট লিঙ্গুইস্টিকস বা ক্রিয়াবাদী ভাষাতত্ত্বের নিরিখে গোটা ইউরোপেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৯২৯ সালের প্রথম স্লাভিস্ট কংগ্রেসে প্রাহা গোষ্ঠীর ভাষাতাত্ত্বিকরা তাঁদের ভাষা বিষয়ক প্রথম গবেষণাপত্র পেশ করেন। এই গবেষণপত্র প্রসঙ্গে ফিলিপ লুয়েলসডর্ফ বলেছিলেন, 'The programmatic 1929 Prague Theses, surely one of the most imposing linguistic edifices of the 20th century, incapsulated the functionalist credo.'[৫] চেক ভাষায় এই গোষ্ঠীর যাবতীয় লেখালিখি প্রকাশিত হত 'Slovo a slovesnost' ('*শব্দ ও সাহিত্য*) *পত্রিকায়*। পরবর্তীকালে জার্মান দার্শনিক এডমুন্ড হাসার্ল ও রুডলফ কার্নাপ সহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তিরাও বক্তৃতা পেশ করে গিয়েছেন এই গোষ্ঠী আয়োজিত বিভিন্ন আলোচনাচক্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রুডলফ কার্নাপ এবং আলফ্রেড টারস্কি মিলে শব্দার্থতত্ত্ব এবং যুক্তিবিদ্যার পরিসরে 'মেটাল্যাংগুয়েজ'-এর বিপরীতার্থে 'অবজেক্ট ল্যাংগুয়েজ' পরিভাষাটি প্রণয়ন করেন। 'অবজেক্ট ল্যাংগুয়েজ' ভলতে সেই ভাষাকে বোঝানো হয়, যে ভাষায় বিভিন্ন বিষয় বা বস্তু (অবজেক্ট) সংক্রান্ত আলোচনা হয়। আর 'মেটাল্যাংগুয়েজ' একটি কৃত্রিম ভাষা, যে ভাষায় 'অবজেক্ট ল্যাংগুয়েজ'-এর বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণ বা ভূমিকা নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা আলোচনা করে থাকেন। **যাই হোক,** বিশ শতকের শেষ দিক থেকে চেক ভাষাতাত্ত্বিক জোসেফ ভাচেক-এর উদ্যোগে প্রাহা গোষ্ঠীর গবেষণামূলক লেখালিখিগুলি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে বিবিধ সংকলনে গৃহীত হতে শুরু করে। ১৯২৯-এই প্রকাশিত হয় এই গোষ্ঠীর মুখপত্র 'Travaux du Cercle Linguistique de Prague'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আকস্মিক কিছু প্রভাবের জের সামলাতে না পেরে এই পত্রিকার প্রকাশ তখন ব্যাহত হলেও, পরবর্তীকালে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চলে পত্রিকার প্রথম দফার পুনঃপ্রকাশ, পত্রিকাটি ১৯৯৫ সালে দ্বিতীয় দফায় আরও একবার ফিরে এসেছিল।

শুরুতেই বলেছিলাম, স্যোসুরের আকরণবাদী ভাবনাচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন প্রাহা গোষ্ঠী। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশুদ্ধ গঠনবাদী বা আকরণবাদী না বলে কেন এঁদের আমরা আলাদা করে ক্রিয়াবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রাহা গোষ্ঠীর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার মূল বিষয় কিন্তু ছিল ধ্বনিতত্ত্ব বা ফোনোলজি। এই আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা ভাষায় বাক্‌ধ্বনির ভূমিকা বা 'ফাংশন অফ স্পিচ সাউন্ডস'-এর ওপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাষিক উপাদান সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথমত সেই উপাদানগুলির কাজ বা ভূমিকা এবং দ্বিতীয়ত তার সামাজিক প্রভাব—এই দুই ধরনের ফাংশনকে (বাক্‌ধ্বনির ফাংশন এবং তার সামাজিক ফাংশন) মাথায় রেখে তাত্ত্বিক আলোচনার এই পরিসরকে তাই ক্রিয়াবাদী ধরন বা 'ফাংশনালিস্ট অ্যাপ্রোচ' বলে চিহ্নিত করা হয়। স্পষ্টতই, স্যোসুরের অনুপ্রেরণা থাকলেও স্যোসুরের চিন্তাভাবনার ওপরে ভিত্তি করে সেখান থেকে আরও প্রগতিশীল এবং বাঁকবদলকারী তত্ত্বের কথা বলেছিলেন তাঁরা। দেখিয়েছিলেন, তাঁদের ক্রিয়াবাদী তত্ত্বকে সিনক্রনিক বা এককালীন এবং ডায়াক্রনিক বা ঐতিহাসিক দুইরকম ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের নিরিখেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। ভাষার যে-কোনো একটি রূপের ক্ষেত্রে সেই ভাষার উচ্চারণবৈশিষ্ট্য এবং তার ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনা একদিকে যেমন সিনক্রনিক বিচারের উদাহরণ রাখে, তেমনই আবার ভাষারূপের পরিবর্তনের সূত্রে বাক্‌ধ্বনির উচ্চারণগত ভূমিকার কোনো বদল হয় কি না, সেই বিচারটি নিঃসন্দেহেই ডায়াক্রনিক। অর্থাৎ, সিনক্রনিক ও ডায়াক্রনিক ভাষাতত্ত্ব এখানে পরস্পর আন্তঃসম্পর্কে যুক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক হয়ে প্রতি মুহূর্তে একে অন্যকে প্রভাবিত করে চলেছে।

এই গোষ্ঠীর ভাষাতাত্ত্বিকরা যে শুধু ভাষিক উপাদানগুলির কাজ এবং ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, তাই-ই নয়, সেই সঙ্গে ভাষিক উপাদানগুলির পারস্পরিক পার্থক্য এবং এই পার্থক্য ভাষিক সিস্টেমে যে বৈচিত্র্য ও বিন্যাস তৈরি করে, সে বিষয়েও সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছিলেন। বাক্‌ধ্বনির পার্থক্য নিরূপক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণই (distinctive feature analysis) ছিল এই প্রাহা গোষ্ঠীর মূল অবদান। এই বিশ্লেষণী তত্ত্বের মূল কথা হল, একটি ভাষায় পরস্পরের থেকে পৃথক যে ধ্বনিগুলি রয়েছে, সেই প্রত্যেকটি ধ্বনিকে তাদের স্বাতন্ত্র্য নির্ণায়ক কয়েকটি উচ্চারণগত এবং ধ্বনিতরঙ্গগত বৈশিষ্ট্যের সমাহার হিসেবে দেখানো হয়। ধরা যাক, দুটি বাক্‌ধ্বনি রয়েছে। এখন, তারা যদি পরস্পরের থেকে পৃথক হয়, তবে তারা প্রত্যেকে যে যে উচ্চারণগত এবং তরঙ্গগত বৈশিষ্ট্যের সমাহারে গঠিত, তার অন্ততপক্ষে একটি বৈশিষ্ট্য পরস্পরের থেকে আলাদা হবেই। এইভাবে ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বাক্‌ধ্বনিকে দেখার বিষয়টি পরবর্তীকালে ট্রান্সফরমেশনাল গ্রামার বা সংবর্তনী ব্যাকরণের স্ট্যান্ডার্ড মডেল হিসেবেই গৃহীত হয়েছিল। আসলে, প্রাহা স্কুলের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিটিকে মোটের উপর নানারকম ক্রিয়াবাদী ভাবনাচিন্তার একটা সমষ্টি হিসেবে দেখা চলে। ভাষার যাবতীয় উপাদান—স্বনিম, রূপিম, রূপ, বাক্য এই সব কিছুই আদতে একটি নির্দিষ্ট ফাংশন বা ভূমিকা পালন করে চলে। আর এই প্রসঙ্গে গঠনবাদ এসেছে এই ক্রিয়াবাদের একটি তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট হিসেবে, যেখানে কোনো ভাষিক উপাদানই একে অন্যের চেয়ে কম বা বেশি গুরুত্বের দাবিদার হতে পারে না।

তাঁরা আসলে ভাষাকে মোটেই কোনো স্থির বা স্থিতাবস্থাসম্পন্ন বিষয় হিসেবে দেখতে রাজি ছিলেন না, তাঁদের মতে, ভাষার নানাবিধ বাঁক আর বৈচিত্র্য রয়েছে। এই বৈচিত্র্যই ভাষার বিকাশের মূল সূত্র, এই কারণেই ভাষা একটি প্রবহমান জীবন্ত সিস্টেম হিসেবে পরিগণিত হয়। আসলে ভাষার জ্ঞানমূলক যে তিনটি দিক—কগনিশন, এক্সপ্রেশন এবং কোনেশন, এই তিনটি ধারাতেই প্রাহা গোষ্ঠীর তত্ত্ব ক্রিয়াশীল হওয়ায় বাক্যতত্ত্বের ধারণাতেও এই তত্ত্ব সফল। চিহ্নবিজ্ঞানের দিক থেকেও ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে প্রাহা স্কুলের চিন্তাভাবনা। শুধু ভাষাতত্ত্ব নয়, নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ও সংগীতবিদ্যার আলোচনাতেও এই তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে ভাবিত হয়েছিল প্রাহা গোষ্ঠী। এমনকি, জেকবসন ভাষাকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহনকারী একটি বিশেষ সংযোগমাধ্যম হিসেবে দেখতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। ভাষা নিয়ে, বিশেষত বাক্‌ধ্বনি নিয়ে তাঁদের মতামত ছিল সমকালীন ভাষাতাত্ত্বিকদের তুলনায় অনেকটাই স্বতন্ত্র।

৫.৩.১. ভিলেম ম্যাথিসিউস

চেক ভাষাতাত্ত্বিক ভিলেম ম্যাথিসিউস (১৮৮২-১৯৪৫) বিশ শতকের গোড়ার দিকের যে সময়টায় প্রাহা শহরে ছিলেন, তখন মধ্য ইউরোপের বাকি অঞ্চলগুলির সাপেক্ষে চেকোস্লোভাকিয়াকে বলা যেতে পারে বুদ্ধিজীবীদের স্বর্গ। আগেই বলেছি, বৌদ্ধিক প্রসারের কেন্দ্র প্রাহায় স্যোসুর পরিচিত হয়েছিলেন ম্যাথিসিউস-এরই হাত ধরে। স্যোসুর কথিত সিনক্রনিক এবং ডায়াক্রনিক, দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গিকেই কাজে লাগিয়ে কীভাবে একটি নির্দিষ্ট কালবিন্দুর নিরিখে ও ভাষার ঐতিহাসিক বিচারের সাপেক্ষে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করা যেতে পারে, তার দিশা দিয়েছিলেন ম্যাথিসিউস। একইসঙ্গে কেবল স্যোসুরের আকরণবাদী তত্ত্বে আটকে না থেকে ভাষিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষাগত উপাদানের ভূমিকা বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছিলেন। ক্রুবেৎস্কয়, জেকবসন এবং ম্যাথিসিউস, এই ত্রয়ীই ভাষাতত্ত্বের ডিসকোর্সে বাক্য এবং অন্যান্য ভাষিক উপাদানের মধ্যে শব্দার্থগত সম্পর্কের বিন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'টপিকাল স্ট্রাকচার অ্যানালিসিস'-এর কথা বলেছিলেন। একজন শ্রোতা বা পাঠক কীভাবে তাঁর শোনা বা পড়া টেক্সটের সঙ্গে বোঝাপড়া করেন, কীভাবে প্রতিটি স্বতন্ত্র বাক্য এবং সেই সূত্রে একটি গোটা টেক্সটের প্রেক্ষাপট তাঁর কাছে একটি ডিসকোর্সকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়, সেই বিষয়ে ম্যাথিসিউসের মতামতকে বিশেষভাবে প্রগতিশীল বলা যেতে পারে, কারণ তিনিই প্রথম এই টেক্সট বনাম পাঠকের সম্পর্ককে পরস্পরসাপেক্ষ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন।

৫.৩.২. রেনে ওয়েলেক

মধ্য ইউরোপের বাঙ্‌মীমাংসার ইতিহাসে চেক-আমেরিকান তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচক রেনে ওয়েলেক (১৯০৩-১৯৯৫) এবং এরিক অয়রবাক-এর নাম একইসঙ্গে করা হয়। প্রাহার চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করতে এসে তিনি প্রাহার ভাষাতাত্ত্বিক দলটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩৫ সালে লন্ডনের

ইউনিভার্সিটি কলেজে স্কুল অফ স্লাভোনিক অ্যান্ড ইউরোপিয়ান স্টাডিজ-এ পড়াতে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রাহা স্কুলের প্রধান সদস্যদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন।

৫.৩.৩. জ্যাঁ মুকারোভস্কি

জ্যাঁ মুকারোভস্কি (১৮৯১-১৯৭৫) বিখ্যাত চেক তাত্ত্বিক, বিশেষত, নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রাহার চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সূত্রে গঠনবাদের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক পরিচয় হয়। রাশিয়ান ফর্মালিজমের প্রবক্তা হিসেবেই তাঁর আলাপ হয় প্রাহার ভাষাতাত্ত্বিক দলটির সঙ্গে। সাহিত্যে গঠনবাদী তত্ত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে রোমান জেকবসনের সঙ্গে যুগ্মভাবে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

৫.৩.৪. নিকোলাই সের্গেইভিচ ক্রুবেৎস্কয়

প্রাহা স্কুলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম বলতে যে দুজনের কথা উঠে আসে, তাঁদেরই একজন ক্রুবেৎস্কয়। সারাজীবন ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯১৫ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত পড়িয়েছেন রাশিয়ার মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯১৮ সালে পড়িয়েছেন রোস্তভ-অন-ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯২০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছেন সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শেষপর্যন্ত, ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল অবধি, জীবনের শেষ বছরগুলোয় ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লাভিক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপকের পদ সামলেছেন।

প্রিন্স নিকোলাই সের্গেইভিচ ক্রুবেৎস্কয় ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ও এথনোলজিস্ট। প্রাহা স্কুলের কেন্দ্রে ছিলেন তিনিই। সোস্যুর যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সূচনা করেছিলেন, তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে এই প্রাহা স্কুলের ভাষাবিজ্ঞানীদের অবদান ছিল অগ্রগণ্য। ভাষাতত্ত্বের দুনিয়ায় প্রাহা স্কুলের অবদান হল স্ট্রাকচারাল লিঙ্গুইস্টিকসের প্রতিষ্ঠা। আর ভাষার কাঠামো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা ও ভাষার এই ফর্মভিত্তিক আলোচনা শুরু হয় ক্রুবেৎস্কয়ের হাত ধরেই। মরফোফোনোলজি বা রূপধ্বনিতত্ত্বের জনক হিসেবেও তাঁকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইউরেশিয়ানিস্টদের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল এবং তাঁকেও ইউরেশিয়ানিজমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে ধরা হয়।

ক্রুবেৎস্কয়ের জন্ম হয়েছিল অত্যন্ত অভিজাত একটি পরিবারে। তাঁর পিতা সের্গেই নিকোলেভিচ ক্রুবেৎস্কয় নিজে ছিলেন রাজকীয় পরিবারের সন্তান। তিনি পেশায় ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর। রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা ছিল।

ক্রুবেৎস্কয় বেড়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল একটি পরিবারে। ধর্মীয় অনুষঙ্গ ছিল তাঁর শৈশবের সঙ্গী। পিতা ও পুত্র দুজনেই তথাকথিত ক্রিশ্চিয়ানিটির প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন আজীবন। তবে, তাতে গোঁড়ামির কোনো অবকাশ ছিল না। খ্রিস্টধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল উল্লেখযোগ্য। সব মিলিয়ে বলা যায়, পারিবারিক পরম্পরা অনুযায়ী, ক্রুবেৎস্কয় একই সঙ্গে অত্যন্ত সংস্কৃতিবান

ও ধর্মকেন্দ্রিক একটি আবহে বেড়ে উঠেছিলেন, সেই সঙ্গে তাঁকে ঘিরে ছিল রাশিয়ার ইতিহাস ও সমাজচেতনা নিয়ে দিকদর্শী ভাবনাচিন্তা। ছোটোবেলা থেকেই ক্রুবেৎস্কয় ছিলেন আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী। সেই সঙ্গে পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর জ্ঞানের বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। ১৯০৫ সালে, যখন ক্রুবেৎস্কয়ের বয়স মাত্র পনেরো বছর, তখনই তাঁর লেখা প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় বিখ্যাত পত্রিকা 'Etnograficheskoe obozrenie'-তে। যদিও লেখাটি অবশ্য ১৯০৩ সালেই তিনি লিখেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত নিয়মিত এই পত্রিকাতেই ক্রুবেৎস্কয়ের বহুবিধ লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। ক্রুবেৎস্কয় কিন্তু সেই অর্থে প্রথাগত ঘরানায় কোনোদিন কোনো বিদ্যালয়ে যাননি। বাড়িতেই ব্যক্তিগত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রাথমিক বিদ্যাচর্চা সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯০৮ সালে ক্রুবেৎস্কয় মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হন। সেই অর্থে, এই প্রথম পড়াশোনার জন্য কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে তাঁর আসা হল। মস্কোয় তিনি প্রাথমিকভাবে পড়াশোনা শুরু করলেন দর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিভাগে। যদিও কিছুদিনের মধ্যেই পাঠ্যসূচির প্রতি বেশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন ক্রুবেৎস্কয়। ফলস্বরূপ, মাত্র দুটি সিমেস্টার কাটানোর পরেই দর্শন ও মনস্তত্ত্বের পাট চুকিয়ে তিনি চলে এলেন ভাষাতত্ত্ব বিভাগে। আজীবন ভাষাতত্ত্বের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ বজায় ছিল। এই পর্যায়ে ক্রুবেৎস্কয় অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েন হেগেলীয় দর্শনের প্রতি। হেগেলের প্রতি আনুগত্য এবং সেই সঙ্গে বাঙ্‌মীমাংসা বা ফিলোলজির পড়াশোনার এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে। এই পর্যায়ে ক্রুবেৎস্কয়ের পড়াশনার বিষয় ছিল মূলত দুটি—প্রাচীন ভাষাসমূহ এবং ভাষাচর্চার তুলনামূলক পদ্ধতিতন্ত্র। এ ছাড়া ইন্দো-ইউরোপীয় ব্যতিরেকে অন্যান্য ভাষা, বিশেষত ফিন্নো-আর্জিক এবং ককেশীয় ভাষা ও সেই ভাষায় প্রচলিত লোককাহিনিও ছিল তাঁর চর্চার বিষয়।

ক্রমশ ক্রুবেৎস্কয় হয়ে উঠলেন এক অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ফিলোলজিস্ট। ১৯১৩ সালে ক্রুবেৎস্কয় এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। তাঁর কাজের বিষয় ছিল 'Expression of the Future in Indo-European Languages'। স্নাতক হওয়ার পরেও ক্রুবেৎস্কয় কিন্তু মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চতর পরীক্ষা ও পড়াশোনার জন্য থেকে গেলেন এবং সেখানকার শিক্ষকমণ্ডলীতে যোগ দিলেন। পরের বছর তিনি চলে যান লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে। লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি শিক্ষক হিসেবে পান পৃথিবীবিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক অগাস্ট লেসকিনকে, ধ্বনিসূত্র বিষয়ে লেসকিনের কাজ ভাষাতত্ত্বের দুনিয়ায় নতুন পথের দিশা দিয়েছিল। শুধু তাই-ই নয়, সেই সময় লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন তৎকালীন তাবড় সব তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিকের দল। ক্রুবেৎস্কয়ের ভাবনাবিশ্বে এঁদের প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য ও প্রশ্নাতীত।

লাইপজিগের সংক্ষিপ্ত পর্ব শেষ করে মস্কোতে ফিরে ক্রুবেৎস্কয় বিয়ে করেন ভেরা পেত্রোভনা বাজিলেভস্কি-কে। ১৯১৫ সালে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে অ্যাডজাংক্ট প্রফেসর পদে যোগ দান করেন। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত ক্রুবেৎস্কয় মস্কোতেই বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এই বলশেভিক আন্দোলন-পরবর্তী কালে ক্রুবেৎস্কয় আর জীবনে কখনোই মস্কোয় ফিরতে

পারেননি। হোয়াইট আর্মির সঙ্গে তিনি পাড়ি জমালেন দক্ষিণে, কনস্ট্যানটিনোপলে এসে থিতু হলেন। যাই হোক, বিপ্লবের পর তিনি প্রথমে রোস্তভ বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। সোফিয়ায় বছর দুয়েক অস্থায়ী পদে চাকরি করার পর, ১৯২০ সালে এখান থেকেই তাঁর বিখ্যাত বই 'Rossiia i Chelovechestvo' (Russia and Mankind) প্রকাশিত হয়। এই বইতেই তাঁর ইউরেশিয়ানিজম সংক্রান্ত মতামত লিপিবদ্ধ হয়েছিল। ইউরেশিয়ানিজমের মূল ভিত্তি যে ধারণাটিকে ঘিরে, তা হল, পূর্ব বনাম পশ্চিম বিতর্ক। ইউরেশিয়ানিস্টদের স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল প্রাচ্যের প্রতি। রোমান জার্মান যুদ্ধ বিষয়েও তাঁদের খুব একটা মাথাব্যথাও ছিল না। ত্রুবেৎস্কয় নিজে যেরকম রক্ষণশীল ও ধ্রুপদী ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, তাতে তাঁর পক্ষে পাশ্চাত্যের বিরোধিতা করে প্রাচ্যপন্থী হওয়াটা একটু আশ্চর্য বই কী! কিন্তু এই প্রভাব আসলে এসেছিল ত্রুবেৎস্কয়ের ভাষাতত্ত্ব চর্চার হাত ধরে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ব্যতিরেকে অন্যান্য ভাষা এবং তাদের মৌখিক উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর গভীর পড়াশোনা তাঁকে প্রাচ্যের প্রতি উৎসাহী করে তোলে। সেই সঙ্গে যোগ হয় যাযাবর জাতির নীতিগত প্রশ্নে তাদের প্রতি ত্রুবেৎস্কয়ের বিশেষ পক্ষপাত। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন ত্রুবেৎস্কয়ের তথাকথিত রাজনৈতিক চেতনার দিকটি ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার নিরিখে হঠাৎ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। আসলে, ইউরেশিয়ানিজম বা প্রাচ্যের প্রতি ত্রুবেৎস্কয়ের এই পক্ষপাতের কারণটি কিন্তু ছিল তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক পড়াশোনা ও তৎসংক্রান্ত চিন্তাভাবনার দরজা খুলে যাওয়া। সেজন্যই ত্রুবেৎস্কয়ের ভাষাচিন্তার সঙ্গেই তাঁর রাজনৈতিক পক্ষাবলম্বন বিচার্য, পৃথকভাবে নয়।

খুব শিগগিরই ত্রুবেৎস্কয় রাজনীতি বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থটিও লিখে ফেললেন। এই বইটি হল 'The Legacy of Genghis khan : A Perspective on Russian History Not from the West but from the East'। এসময় ত্রুবেৎস্কয় বলা চলে, ইউরেশিয়ানিস্টদের মধ্যে রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে যেমন ভক্তের ভিড় হল প্রচুর, বিপক্ষেও জনসংখ্যা বড়ো কম হল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তাঁর ইউরেশিয়া সংক্রান্ত তত্ত্ব আবার একীভূত হয়ে যায় উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে। তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্ব ও গবেষণার বিষয় নিয়ে বহু দেশে বিশদে চর্চা শুরু হয়। বিবিধ রোমানো-জার্মানিক ভাষায় প্রভূত মাত্রায় অনূদিত হতে শুরু করে তাঁর রচনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি সাধনের পর তাঁর লেখা রাশিয়াতেও প্রকাশিত হয়।

১৯২০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত তিনি এই বুলগেরিয়াতেই পড়ান। তারপর স্লেভিক ফিলোলজি-র (বাঙ্‌মীমাংসা) অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সুযোগ বলা চলে তাঁর প্রায় জীবন বদলে দেয়। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভাবনাচিন্তা, গবেষণা ও লেখালিখি শুরু হয় এই সময় থেকেই। ফোনোলজি বা ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে দিকদর্শী কিছু তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তিনি, যে-কারণে তাঁকে আধুনিক ধ্বনিতত্ত্বের জনক বলে অভিহিত করা হয়। তিনি এবং তাঁর সঙ্গী রোমান জেকবসন (এঁর কথা পরে বিশদে বলা হবে), দুজন হয়ে উঠলেন একটি ভাষাতাত্ত্বিক দলের মাথা, যাকে সারা পৃথিবী চিনল প্রাহা স্কুল নামে।

তবে, ক্রুবেৎস্কয়ের জীবনের শেষ পরিণতি ছিল অত্যন্ত শোকাবহ। ১৯৩৮ সালের ১৩ মার্চ, জার্মান সেনাবাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করে নেয়। ক্রুবেৎস্কয় সারাজীবনই অল্পবিস্তর নানাবিধ শারীরিক সমস্যায় ভুগতেন। বিশেষ করে সেই সময়টায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত অসুস্থ। উপরন্তু, হিটলারের জনবিরোধী বর্ণবিদ্বেষী নীতির তীব্র সমালোচনা করে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। এর ফলে তাঁকে কুখ্যাত গেস্টাপোদের ভয়াবহ জেরার মুখে পড়তে হয়। তাঁর লেখাপত্রও বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনা তীব্র অভিঘাত তৈরি করে ক্রুবেৎস্কয়ের মনে। নাৎসি বাহিনীর হাতে এই পর্যায়ে যে নৃশংস অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হয়, তার ফলেই হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে ২৫ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

ক্রুবেৎস্কয় নিজে ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুরের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভাষাতত্ত্বের দুনিয়ায় ক্রুবেৎস্কয়ের সবচাইতে বড়ো অবদান ছিল ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে, বিশেষত পৃথক পৃথক ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। সেই সঙ্গে তিনি সমস্ত ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে, এমন বেশ কিছু সাধারণ ধ্বনিসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, যেগুলো বলা যেতে পারে বিশ্বজনীনভাবে সত্য। তাঁর বিখ্যাত বই 'গ্রুন্‌ৎস্যুগে দ্যের্‌ ফোনোলগি' ('Grundzüge der Phonologie') বা 'Priciples of Phonology' প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। এই বইতে, তিনি ভাষিক কাঠামোর বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একক হিসেবে স্বনিমকে (phoneme) সংজ্ঞায়িত করেছেন। আমেরিকান ধ্বনিতাত্ত্বিকদের সঙ্গে এই ক্রুবেৎস্কয় ও ক্রুবেৎস্কয়পন্থী প্রাহা স্কুলের অন্যান্য ধ্বনিতাত্ত্বিকদের বিশেষ পার্থক্য ছিল এই যে, তাঁরা স্বনিমকে শুধুমাত্র ভাষার ক্ষুদ্রতম ধ্বনি-একক হিসেবেই বর্ণনা করেননি, বরং সেই সঙ্গে স্বনিমগুলির 'distinctive feature' বা স্বনিমীয় স্বলক্ষণের কথাও বলেন। তাঁর মতে, স্বনিম আসলে এইসব বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সমাহারমাত্র। স্বনিমীয় স্বলক্ষণ বা স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে, যার মাধ্যমে একটি স্বনিম অন্য স্বনিম থেকে পৃথক হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাঁর মতে, প্রত্যেকটি ধ্বনি বা স্বনিম আসলে একাধিক বৈশিষ্ট্যের সমাহারে গঠিত। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই আসলে একটি স্বনিম অন্যটির থেকে পৃথক হয়ে যায়। যেমন ধরা যাক, বাংলায় একটি মহাপ্রাণ ঘোষ ধ্বনি হল 'ঘ'। অর্থৎ, এর বৈশিষ্ট্য হল ঘোষবত্তা (voicing) এবং মহাপ্রাণতা (aspiration)। এই কারণেই সে অন্যান্য ধ্বনির চেয়ে পৃথক। আবার, বাংলায় 'গ'-ও একটি ধ্বনি। উচ্চারণস্থানের বিচারে দেখতে গেলে, 'গ' এবং 'ঘ' একই স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। কিন্তু যদি 'গ'-এর স্বনিমীয় স্বলক্ষণের দিকে নজর করি, তাহলে দেখা যাবে, 'গ' ঘোষ হলেও মহাপ্রাণ নয়, অল্পপ্রাণ। ফলে, এই মহাপ্রাণতাই কিন্তু 'ঘ'-কে 'গ'-এর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। বা, উলটো করে বলা যায়, অল্পপ্রাণতা আছে বলেই 'গ' নিজেও 'ঘ'-এর থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে। সোজা কথায়, এইরকম নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের এদিক-ওদিক হলেই, তার তফাতের কারণে স্বনিমগুলি একে অন্যের থেকে পৃথক হয়ে যায়। প্রতিটি স্বনিমই এরকম কিছু উচ্চারণনির্ভর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সমাহারে গঠিত। এই স্বাতন্ত্র্যসূচক লক্ষণই স্বনিমীয় গঠনগত দ্বিত্বের সূচক। অর্থাৎ, ধরা যাক, ঘোষবত্তাকে যদি আমরা একটি স্বনিমীয় লক্ষণ হিসেবে ধরি, তাহলে সেটি যে দুই বৈশিষ্ট্যের সূচক, সেই দুটি হল ঘোষ ও অঘোষ। একইভাবে, আমরা যদি আবার শ্বাসবায়ুর

আধিক্যকে আর-একটি স্বনিমীয় লক্ষণ হিসেবে বিচার করি, তবে সেই খাতিরে যে দুটি সূচক বৈশিষ্ট্য আমরা পাব, তা হল মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ। ত্রুবেৎস্কয়ের আর-একটি বিশেষ অবদান হল রূপস্বনিম বা 'morphophoneme'-এর আবিষ্কার। ত্রুবেৎস্কয়ের নেতৃত্বেই প্রাহা স্কুলের ভাষাবিজ্ঞানীরা শৈলীবিজ্ঞান বা stylistics নিয়েও কাজ শুরু করেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাতেই। বলা যেতে পারে, ত্রুবেৎস্কয়ের কাজের মাধ্যমেই প্রথম ধ্বনিতত্ত্ব (phonology) ও ধ্বনিবিজ্ঞানের (phonetics) মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নিরূপিত হয়।

ত্রুবেৎস্কয়ের সঙ্গেই যাঁর নাম আলোচনা করা উচিত, তিনি হলেন ত্রুবেৎস্কয়ের বন্ধু রোমান জেকবসন। ত্রুবেৎস্কয়ের মৃত্যুর পর রোমান জেকবসনই তাঁর পরম্পরাকে বহন করে নিয়ে চলেন ও প্রাহা স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখেন। বহুক্ষেত্রেই এমনকি এই দুজনের কাজকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করাও খুব মুশকিল হয়ে পড়ে।

৫.৩.৫. রোমান জেকবসন

প্রাহা স্কুলের কথা বলতে গেলে ত্রুবেৎস্কয়ের পরেই যাঁর নামটি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে, তিনি হলেন রোমান জেকবসন, পুরো নাম রোমান অসিপোভিচ জেকবসন। ত্রুবেৎস্কয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উত্তরসূরী জেকবসন একাধারে ছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যতাত্ত্বিক। গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয়। বিশ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী ভাষাতাত্ত্বিক জেকবসন ত্রুবেৎস্কয়ের সঙ্গেই ভাষার একক হিসেবে ধ্বনির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পুরোধা ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই দুজনের কাজের ওপরে দাঁড়িয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আধুনিক ধ্বনিতত্ত্ব বা ফোনোলজি। তবে ত্রুবেৎস্কয়ের চেয়ে জেকবসনের কাজের স্বাতন্ত্র্য হল এই যে, তিনি ত্রুবেৎস্কয় কথিত ধ্বনি বিশ্লেষণের গঠনমূলক কাঠামোটিকে ভাষার অন্যান্য উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সফলভাবে প্রয়োগ করেন। রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব বা অন্বয়তত্ত্ব এবং শব্দার্থতত্ত্বের কাঠামো নির্ধারিত হয় তাঁর হাতেই। বিশেষত স্লাভিক ভাষার বিশ্লেষণী চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। রুশ ভাষার কারক সম্বন্ধ এবং ক্রিয়াপদের গঠনগত বিশ্লেষণ ছিল এই কাজের দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা। কমিউনিকেশন থিওরি, সাইবারনেটিকস এবং চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্সের চিহ্নতত্ত্ব থেকে উপাদান আহরণ করে জেকবসন গান, কবিতা, দৃশ্যকলা শিল্প এবং চলচ্চিত্রের সারস্বত চর্চার একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রণয়ন করেন।

জেকবসনের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য এই যে, তাঁর বিশ্লেষণী পদ্ধতির প্রভাব কিন্তু শুধু ভাষাতত্ত্বের জগতে আটকে থাকেনি। তাঁর দেখানো পথেই পরবর্তী কালে দর্শন, নৃতত্ত্ব এবং সাহিত্যতত্ত্বের কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। ক্লদ লেভি স্ত্রস এবং রোলাঁ বার্তের ওপরেও তাঁর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ত্রুবেৎস্কয়ের মতোই, তিনিও সোস্যুরের গঠনবাদী চিন্তাভাবনার পথেই হাঁটা শুরু করেছিলেন। আসলে সে-সময়ে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জমানায়, সোস্যুর কথিত স্ট্রাকচারালিজম বা গঠনবাদই ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবথেকে

গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের ভূমিকা নিয়েছিল। ইতিমধ্যে, ১৯৭০ সাল নাগাদ ক্রমশ গঠনবাদের দাবি বিভিন্ন কারণে খারিজ হতে শুরু করে। কিন্তু ততদিনে ভাষা-নৃতত্ত্বের জগতে জেকবসনের কাজ গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে দিয়েছে। বিশেষত ডেল হাইমসের এথনোগ্রাফি অফ কমিউনিকেশন কিংবা ইভা সিলভারস্টেইনের সাংস্কৃতিক চিহ্নতত্ত্বের হাত ধরে জেকবসনের তত্ত্ব ও বক্তব্য প্রতিষ্ঠা পায়। বিশেষ করে, জেকবসন ও ত্রুবেৎস্কয়ের যে বিশ্ববিখ্যাত স্বনিমীয় স্বলক্ষণের তত্ত্ব, তা কিন্তু আদতে বৈশ্বিকভাবে যাবতীয় ভাষার অন্তর্গত একটি ব্যাকরণগত কাঠামোর কথাই বলে। এই বৈশ্বিক ব্যাকরণের আভাস থেকেই চমস্কি পরবর্তী তাঁর সাড়াজাগানো ইউনিভার্সাল গ্রামার বা বিশ্বজনীন ব্যাকরণের প্রথম প্রণোদনা পেয়েছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে।

রাশিয়ার এক সম্ভ্রান্ত ইহুদি পরিবারে ১৮৯৬ সালের ১১ অক্টোবর জেকবসনের জন্ম হয়। তাঁর বাবা অসিপ জেকবসন ছিলেন একজন শিল্পপতি। অন্যদিকে তাঁর মা আনা ভোলপার্ট জেকবসন ছিলেন পেশায় রসায়নবিদ। খুব ছোটো বয়স থেকেই জেকবসনের মধ্যে ভাষা নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়। তিনি প্রাথমিকভাবে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন লাজারেভ ইন্সটিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ। এরপর তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বাঙ্‌মীমাংসা (historical-philological) বিভাগে ভরতি হন। ছাত্রাবস্থাতেই মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতাত্ত্বিক বৃত্তে তিনি পুরোধা ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে শিল্প ও কাব্যকলায় মস্কোর খ্যাতি ছিল আকাশছোঁয়া। সেখানেও পথপ্রদর্শকের স্থান নিলেন জেকবসন। ভাষাতত্ত্বে তখন চলছে নিওগ্রামারিয়ান বা নব্য ব্যাকরণবাদীদের যুগ। সোস্যুর যাকে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ডায়াক্রনিক বা ঐতিহাসিক রীতি বলেছিলেন, তখন তারই রমরমা। ভাষায় শব্দের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিবর্তনই ভাষা নিয়ে একমাত্র বৈজ্ঞানিক চর্চার বিষয় বলেই ছিল এই নব্য ব্যাকরণবাদীদের ধারণা। সেখান থেকে সরে এসে জেকবসন সোস্যুরীয় ধারা মেনে ভাষার গঠন ও মূলগত কার্যনীতির দিকে জোর দিলেন, অর্থাৎ সিনক্রনিক বা এককালীন বিচারের আকরণবাদী (structuralist) দিকে ঝুঁকলেন। চলচ্চিত্রে ধ্বনির ভূমিকা নিয়েও জেকবসনের বক্তব্য ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯১৮ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর পাস করেন তিনি।

প্রাথমিকভাবে রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন থাকলেও খুব দ্রুতই জেকবসন বুঝতে পারছিলেন যে, শিল্পকলার প্রসার সম্পর্কে যে উচ্চাশা তিনি এই আন্দোলনের মাধ্যমে পোষণ করতে শুরু করেছিলেন, তা নিছকই বিভ্রম। যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে তিনি মস্কো ছেড়ে পাড়ি জমালেন প্রাহার দিকে। সেখানে নিজের ডক্টরাল থিসিসের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সোভিয়েত ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের সদস্য পদ গ্রহণ করায় বেশ গুরুদায়িত্ব সামলাতে হচ্ছিল তাঁকে। ১৯৩০ সালে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেকবসন পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর, ১৯৩৩ সালে বর্নোর মাসারিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দেন তিনি। ফলে, কর্মসূত্রে চেক প্রজাতন্ত্রের বর্নোতে চলে আসতে হল তাঁকে। এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, চেকোস্লোভাকিয়ায় চলে আসার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ, জেকবসন এমন কয়েকজন

ভাষাতাত্ত্বিকের নিকটতম সংস্পর্শে চলে এলেন, ১৯২০ থেকে শুরু করে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত যাঁদের কাজ তাঁকে প্রভাবিত করেছে, অবশ্য, অনেক সময়েই, তাঁদের সঙ্গে যুগ্মভাবেই ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক দিকদর্শী ভাবনাচিন্তা করে চলেছিলেন তিনি। এঁদের মধ্যে অবশ্যই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন ত্রুবেৎস্কয়, বিপ্লব সমকালীন রাশিয়ায় যিনি নতুন ভাবনাচিন্তার জোয়ার এনে দিয়েছিলেন। ১৯২২ সাল থেকেই এই ত্রুবেৎস্কয় ভিয়েনায় বসবাস করছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিকদের এই আশ্চর্য সমাবেশের অনিবার্য ফল হিসেবেই ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্ববিখ্যাত প্রাহা স্কুল অফ লিঙ্গুইস্টিকস। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যেই একজন হলেও, আসলে জেকবসনই ছিলেন এই প্রাগ স্কুলের মূল প্রাণকেন্দ্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী চেকোস্লোভাকিয়ার যাবতীয় সারস্বত এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্যে ক্রমশ ডুবে গেলেন জেকবসন। এসময় প্রচুর চেক কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। চেক কাব্য নিয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের জন্যও তিনি চেক সাহিত্যজগতে আজও স্মরণীয়।

কিন্তু এই স্থিতাবস্থা বেশিদিন রইল না। জার্মান গেস্টাপোর হাত থেকে বাঁচতে ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে প্রাহা থেকে পালিয়ে যেতে হল জেকবসনকে। বার্লিন হয়ে তিনি চলে এলেন ডেনমার্কে। সেখানে ছিলেন তাঁর বন্ধু, আর-এক তাবড় ভাষাতাত্ত্বিক, লুই ইয়েমস্লেভ। তা ছাড়া কোপেনহেগেনের ভাষাতাত্ত্বিক বৃত্তের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। কিন্তু এখানেও বেশিদিন নিরাপদ আশ্রয় মিলল না। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জেকবসন আবার পালিয়ে চললেন নরওয়ের উদ্দেশে, ১৯৪০ সালে সুইডেনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে পায়ে হেঁটেই এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে ক্রমাগত ঠিকানা বদল করে চলতে হল তাঁকে। এই পর্যায়েও, সুইডেনের কারোলিনস্কা হাসপাতালে বসে, অ্যাফেজিয়া (বাক্‌বিকার) ও ল্যাংগুয়েজ কমপিটেন্স (ভাষাগত পারঙ্গমতা) নিয়ে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু ক্রমশই, তাঁর সুইডেনের হিতৈষী বন্ধুরাও বুঝতে পারছিলেন যে, সুইডেনও আর বেশিদিন জেকবসনের পক্ষে নিরাপদ আশ্রয় হয়ে থাকতে পারবে না। তাঁদেরই পরামর্শে, হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর আর্নস্ট ক্যাসিরারের সঙ্গে একদিন গোপনে একটি মালবাহী জাহাজে চড়ে পালিয়ে গেলেন তিনি, সোজা এসে উঠলেন নিউ ইয়র্ক শহরে। সেখানে সেসময় আরও বহু দেশ থেকে এভাবেই প্রচুর বুদ্ধিজীবী পালিয়ে এসে জড়ো হয়েছিলেন। ক্রমশ এই বিপুল বুদ্ধিজীবী বৃত্তের একজন হয়ে উঠলেন জেকবসন।

নিউ ইয়র্কে এসে তিনি পড়াতে শুরু করলেন দ্য নিউ স্কুলে। এই পর্যায়ে চেক অভিবাসী বৃত্তের সঙ্গেও তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ বজায় ছিল। এসময় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় লেভি স্ত্রসের। লেভি স্ত্রস নিজেও আকরণবাদের চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। ফ্রাঞ্জ বোয়াজ, বেঞ্জামিন হোর্ফ, লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড প্রমুখ দিকপাল কয়েকজন মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিকের সঙ্গেও তাঁর ক্রমশ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ সেসময় জেকবসনকে ইউরোপে ফেরত পাঠাতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে স্বং

বোয়াজ এগিয়ে আসেন এবং তাঁর সক্রিয় হস্তক্ষেপেই জেকবসনের প্রাণরক্ষা হয়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জেকবসন ইন্টারন্যাশনাল অক্সিলিয়ারি ল্যাংগুয়েজ অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৯৪৯ সালে জেকবসন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। ১৯৬৭ সালে অবসর গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। স্বনিমীয় স্বলক্ষণের ভিত্তিতে ধ্বনিতত্ত্বকে চিহ্নিত করার যে প্রয়াস তিনি করেছিলেন, এই পর্যায়েই তাঁর সেই বৈশ্বিক তত্ত্বটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত এই বইটিতে জেকবসনের সহকারী লেখক হিসেবে ছিলেন সি গুন্নার ফান্ট এবং মরিস হ্যালে। জেকবসনের এই স্বনিমীয় স্বলক্ষণ বা ডিসটিংটিভ ফিচারের তত্ত্ব সেসময় চমস্কির ওপরেও অত্যন্ত প্রভাব ফেলে। চমস্কির হাত ধরেই এই তত্ত্ব বিশ শতকের বাকী দশকগুলি জুড়ে ভাষাতত্ত্বের দুনিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের সূচনা করে।

জীবনের শেষ পর্যায়ে জেকবসন ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির সাম্মানিক এমেরিটাস প্রফেসর পদে নির্বাচিত হন। ষাটের দশকে তাঁর চিন্তাভাবনার বিষয় ওঠে ভাষার বোধমূলক ক্ষেত্র। কমিউনিকেশন সায়েন্স বিষয়েই তিনি লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৮২ সালের ১৮ জুলাই ম্যাসাচুসেটসের কেমব্রিজেই জেকবসনের মৃত্যু হয়।

জেকবসনের নিজের কথায়, তাঁর জীবনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য পর্যায় ছিল ১৯১২ থেকে ১৯২০ সালের মাঝামাঝি সময়কাল, রাশিয়ার তখন টালমাটাল অবস্থা। কিন্তু তরুণ ছাত্র হিসেবে জেকবসন সেসময়েই রাশিয়ান ভাষাতাত্ত্বিক ভেলিমির ক্লেভনিকোভ-এর সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর সারাজীবনের শিক্ষাক্ষেত্রে এই যোগাযোগকেই জেকবসন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অর্জন বলে মনে করতেন। আবার, লিন্ডা ওয়াঘ-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখা জেকবসনের বই *The Sound Shape of Language*-এর দ্বিতীয় সংস্করণে জেকবসনের কাজের চতুর্থ পর্যায়টি ধরা পড়েছে। এই পর্যায়ে তাঁর কাজের বিষয় ছিল ভাষায় ধ্বনিপ্রতীকের কার্যনীতি ও গঠন নিয়ে গবেষণা। তাঁর সারাজীবনের কাজকে মোটামুটিভাবে চারটি পর্যায়ে ভাগ করে ফেলা যায়। প্রথম পর্যায়ের সময়কাল ধরে নেওয়া যেতে পারে মোটের ওপরে ১৯২০ থেক ১৯৩০ সাল পর্যন্ত, যেসময়ে তিনি ত্রুবেৎস্কয়ের সঙ্গে যোগদান করছেন এবং তাঁরা দুজন মিলে স্বনিমের ধারণা নিয়ে কথা বলছেন, ধ্বনির কাঠামো বিশ্লেষণ করছেন। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হচ্ছে ১৯৩০ সালের শেষ দিক থেকে, চলছে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত। এই পর্যায়ে জেকবসন স্বনিমীয় দ্বিত্ব ও দুটি স্বনিমের পারস্পরিক পার্থক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা নিয়ে কাজ করছেন, পালটে দিচ্ছেন ধ্বনিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা। দুটি ধ্বনির সাদৃশ্য নয়, বরং বৈসাদৃশ্যই হয়ে উঠছে স্বনিমীয় চিহ্ন নির্ধারণের মূল মাত্রা। আর ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে জেকবসনের কাজের চতুর্থ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই পর্যায়ে তিনি শ্রুতিবিদ (acoustician) সি গুন্নার ফ্যান্ট এবং তাঁর ছাত্র মরিস হ্যালের সঙ্গে স্বনিমীয় স্বলক্ষণগুলির শ্রাব্যতা নিয়ে কাজ করছেন।

কার্ল ব্যুহলার-এর অর্গানন মডেল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জেকবসন ভাষিক মাধ্যমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে মোট ছয়টি কার্যনীতিতে ভাগ করেছিলেন। এর প্রতিটি কার্যনীতিই যোগাযোগের কোনো-না-কোনো মাত্রা বা উপাদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ব্যুহলারের তত্ত্বে প্রাথমিকভাবে ভাষিক যোগাযোগকে তিনটি মাত্রায় ভাগ করা হয়েছিল। এর সূচনাপ্রান্তে থাকে প্রেরক (sender), এবং অন্ত্যপ্রান্তে থাকে গ্রাহক (receiver)। এদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হয় প্রেরক কর্তৃক প্রেরিত বার্তা-র (message) দ্বারা। জেকবসন এর সঙ্গে যোগ করলেন আরও তিনটি ধারণা—ভাষিক প্রেক্ষাপট (context), ভাষিক সরণি (channel) এবং ভাষিক সংকেত (code)। এই ছয়টি উপাদানের সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাঁদের কার্যনীতির প্রসঙ্গটি। এই ছয়টি ফাংশনকে জেকবসন ছয়টি নাম দেন। কনটেক্সটের সঙ্গে জড়িত ফাংশনের নাম দেন রেফারেনশিয়াল ফাংশন, যা যুক্ত থাকে প্রেক্ষাপট থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে। মেসেজের সঙ্গে জড়িত ফাংশনের নাম দেন অ্যাস্থেটিক বা পোয়েটিক ফাংশন, যা যুক্ত থাকে স্বতস্ফূর্ত প্রণোদনার সঙ্গে, জেকবসন এই প্রণোদনাকেই বলেছিলেন অটো রিফলেকশন। সেন্ডারের সঙ্গে জড়িত ফাংশনের নাম দেন ইমোটিভ ফাংশন, যা যুক্ত থাকে ভাষীর স্বাভাবিক ভাষিক প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে, একে জেকবসন সেলফ-এক্সপ্রেশন নামে চিহ্নিত করেন। এ ছাড়া, রিসিভারের সঙ্গে জড়িত ফাংশন হল কোনেটিভ ফাংশন, চ্যানেলের সঙ্গে জড়িত ফাংশনের নাম দেন ফ্যাটিক ফাংশন এবং কোড বা সংকেতের সঙ্গে জড়িত ফাংশনের নাম দেন মেটালিঙ্গুয়াল ফাংশন। গোটা ছকটার চেহারা নিম্নরূপ :

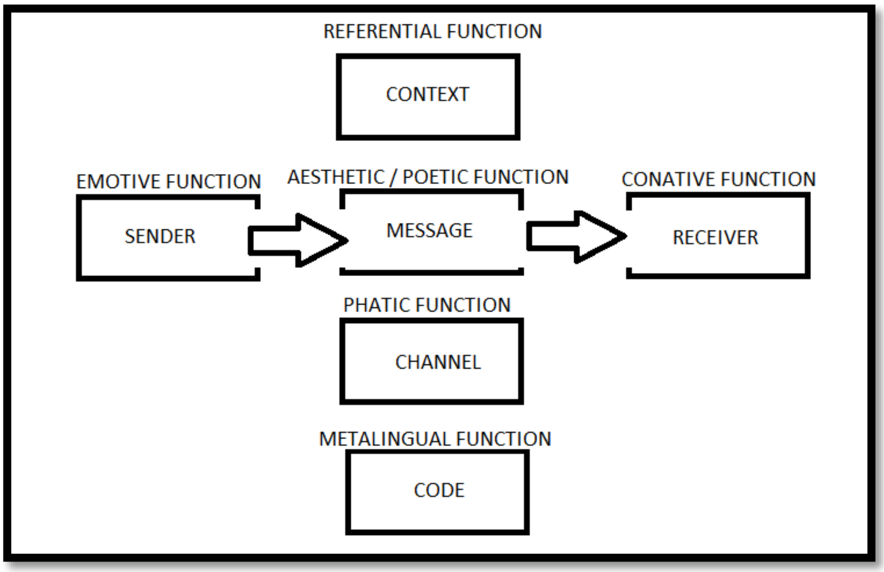

জেকবসনের বহুমুখী প্রতিভা শুধু ভাষাতত্ত্ব নয়, সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন ধারায়, এমনকি সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসেবেও সারা পৃথিবীর কাছে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। সত্যিই তাঁকে একটি অভিধার পরিধিতে ধরা যায় না, সেজন্যই তাঁর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এডওয়ার্ড জে ব্রাউন বলেছিলেন, 'Roman Jakobson was one of the great minds of the modern world and the effects of his genius have been felt in many fields: linguistics, semiotics, art, structural

anthropology, and, of course, literature.' জেকবসনের সম্পর্কে বলতে গেলে এর চেয়ে বড়ো কথা আর হয় না।

৫.৩.৬. আজকের প্রাহা স্কুল

১৯৮৯ সালে ওল্ডরিক লেসকার নেতৃত্বে প্রাহা স্কুল পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে, যার ফলে ১৯৯৫ সালে নতুন করে প্রাহা গোষ্ঠীর মুখপত্র 'Travaux du Cercle Linguistique de Prague'-এর দ্বিতীয় দফার পুনঃপ্রকাশ সম্ভব হয় এবং ১৯৯৬ সালে প্রাহা ভাষাতাত্ত্বিক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার ৭০ বছর পূর্তি এবং রোমান জ্যাকবসনের ১০০তম জন্মবার্ষিকী স্মরণ করে একটি সফল সম্মেলনের আয়োজন হয়।

সেই সঙ্গে প্রাহা ক্রমশ বিবিধ ভাষাতাত্ত্বিক সম্মেলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, বিশেষত চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট ফর অ্যাপ্লাইড অ্যান্ড ফর্মাল লিঙ্গুইস্টিক্স (ইউএফএএল) কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে ইউএফএএল-র তৎকালীন ডিরেক্টর ইভা হাজিকোভা-ও দীর্ঘদিন ট্র্যাভাক্সের সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গোটা পৃথিবী জুড়ে ভাষাতত্ত্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে-চলা এই প্রাহা গোষ্ঠীর নবায়িত দলটির অবদানও ভাষাবিজ্ঞানে বড়ো কম নয়। বিশেষ করে বিংশ শতকের শেষদিকে ইউরোপের বেশিরভাগ অঞ্চলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ ও পত্রিকা প্রকাশের নতুন সুযোগ এসেছিল যা গোটা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হতে শুরু করে। মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন কেন্দ্রের ভাষাতাত্ত্বিকরা এককভাবে এবং সমষ্টিগত প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে এককালে যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই স্রোত যে তখনও শুকিয়ে যায়নি, তা প্রমাণ করে দিয়েছিল ইউরোপ জুড়ে এই নতুন প্রাহা গোষ্ঠীর বিপুল স্বীকৃতি। প্রায় চল্লিশ বছরের প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপ সহ্য করেও ইউরোপে ভাষাতত্ত্বের চর্চা তখনও টিকে ছিল, বিশেষ করে প্রাহা গোষ্ঠীর নবায়নের সূত্র ধরে ইউরোপের ভাষাতাত্ত্বিক দলগুলি আবার একত্রিত হতে শুরু করে।

৫.৪. নোয়াম চমস্কির ভূমিকা

নোয়াম চমস্কি। বলা হয়, বিশ্বের সর্বকালের সেরা দশ লেখককে যদি বেছে নেওয়া যায়, যাঁদের কথা সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়ে চলেছে উদ্ধৃতি হিসেবে, তবে তার মধ্যে চমস্কি একজন। চমস্কির পরিচয় বর্তমানে আর শুধু ভাষাবিজ্ঞানী বা ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে নয়, বরং এক অতি সমাজসচেতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই আজ তাঁকে বেশি চোখে পড়ে। তাঁর বইয়ের সংখ্যা প্রায় দেড়শো ছাড়িয়ে গেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশের ওপরে প্রথম বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, বাজার অর্থনীতি ও পণ্যায়িত ভোগবাদী দুনিয়া নিয়ে তাঁর সোজাসাপটা বক্তব্য

মুগ্ধ করেছে বিশ্ববাসীকে। কিন্তু আমাদের আলোচনার নিরিখে আমরা ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর অবদান নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকব।

পেনসিলভিনিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় এক ইহুদি পরিবারে ১৯২৮ সালের ৭ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা, ইউক্রেননিবাসী উইলিয়াম চমস্কি জারের সৈন্যবাহিনিতে যোগ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা এড়াতে চেয়ে ১৯১৩ সালে আমেরিকায় চলে আসেন। তাঁর মা এলসি সাইমোনোফস্কি ছিলেন আদতে বেলারুশের বাসিন্দা, যদিও তাঁর জন্মকর্ম সবই ছিল নিউ ইয়র্কে। চমস্কির বাবা-মা দুজনেই ছিলেন হিব্রু ভাষার অধ্যাপক। বাবা পড়াতেন প্রথমে গ্র্যাটজ কলেজে ও পরে ড্রপসি কলেজে। হিব্রু ভাষার ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁর কাজ ছিল উল্লেখযোগ্য। 'Hebrew : The Eternal Language' নামে তাঁর একটি বিখ্যাত বইও রয়েছে। ছোটোবেলা থেকেই ইহুদি সংস্কৃতির রসদ নিয়ে বেড়ে উথছিলেন চমস্কি। আর সেসময় ইহুদি সংস্কৃতি হয়ে উঠেছিল বেশ রক্ষণশীল, সাবধানী ও ঘেরাটোপে বন্দি একটি বৃত্তে আবদ্ধ। কারণ আর্যামির মোহে উন্মাদ হিটলার চালিত জার্মানদের হাতে সদ্য সদ্য যে বীভৎস অত্যাচার হয়েছিল ইহুদিদের ওপরে, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলির সেই ভয়াবহ স্মৃতি তাঁদের কাছে তখনও ছিল টাটকা। খুব ছোটোখাটো বিষয় নিয়েই তাই চমস্কির শৈশব আলোড়িত হয়েছিল। একটা ছোট্ট উদাহরণ তাঁর নিজের স্মৃতিচারণাতেই পাওয়া যায়। তাঁর বাবা-মা দুজনেরই মাতৃভাষা কিন্তু ছিল ইডিশ। অথচ তাঁর পরিবারে ইডিশ বলাই নিষিদ্ধ ছিল! এর কারণ হয়তো জার্মান ভাষার সঙ্গে ইডিশের যোগাযোগ, ইডিশ তো জার্মান ভাষারই একটি উপভাষা! তাই জার্মান ঘৃণা যে ভাষার প্রতি সংক্রমিত হয়েছিল, এমনটা ভেবে নেওয়াই যেতে পারে। কিন্তু তাঁরা থাকতেন এমন একটি পাড়ায়, যার চারপাশে ছিল অ্যান্টি সেমিটিক আইরিশ এবং জার্মান ক্যাথলিক বসতি। ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে অবধি নাৎসিদের প্রতি খুল্লমখুল্লা সমর্থনের হাওয়া ছিল সেখানকার স্বাভাবিক ঘটনা। ছোটোবেলায় ইহুদি হওয়ার কারণে তাঁকে বেশ হেনস্থা হতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল পৃথিবী কাঁপান বিভিন্ন সামাজিক তত্ত্ব। আর এর মূল কারিগর ছিলেন চমস্কির মেসো। নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়েতে তাঁর এই মেসোর একটি ছোট্ট ম্যাগাজিন কিয়স্ক ছিল। সেখানে ভিড় জমাতেন তৎকালীন তাবড় বুদ্ধিজীবী ও সমাজচিন্তকের দল। এই আড্ডায় প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন চমস্কি। খুব ছোটোবেলা থেকেই ফ্রয়েডের তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিতির সুযোগ হয় তাঁর। এমনকি এই সময় থেকেই ক্রমশ বামপন্থী, কিছুটা নৈরাজ্যবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন তিনি। চমস্কির প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল ওক লেন কান্ট্রি ডে স্কুলে। এই স্কুলটির পড়াশোনার ধরন ছিল একটু নিরীক্ষামূলক ও প্রগতিপন্থী। কপ্রতিযোগিতার আবহাওয়া কিংবা গ্রেড দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে ভালোমন্দের কৃত্রিম বিভাজনের চেষ্টা সে স্কুলে হত না। সেখানেই মাত্র দশ বছর বয়সে স্কুলের পত্রিকায় জীবনের প্রথম প্রবন্ধটি লেখেন তিনি, যার বিষয় ছিল স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রীদের পরাজয় ও ফ্র্যাংকোর হাতে বার্সেলোনার পতন, ফ্যাসিবিরোধী বয়ান ফুটে উঠেছিল তার প্রতি ছত্রে। এরপর, বারো বছর বয়সে চমস্কি চলে গেলেন ফিলাডেলফিয়ার সেন্ট্রাল হাই স্কুলে। সেখানে গিয়ে তিনি প্রচুর অন্যান্য ক্লাব এবং সোসাইটিতেও যোগ দিলেন, পড়াশোনায় উল্লেখযোগ্য রকম ভালো ফল করতে থাকলেন। যদিও এসময়

থেমেই গতে বাঁধা পড়ানোর পদ্ধতির ওপরে ক্রমশ তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মাতে শুরু করে। সেই সঙ্গে চমস্কির মধ্যে এসময় থেকেই নাৎসিবিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক নীতির প্রতি গভীর আস্থার দিকটিও ফুটে উঠেছিল বারবার। তাঁর এই হাইস্কুলের খুব কাছেই ছিল জার্মান বন্দিদের শিবির। সেখানে ঠুঁটো দেশপ্রেমের নামে যে ভয়াবহ জিঘাংসার প্রকাশ তিনি প্রতি মুহূর্তে দেখেছিলেন, টা তাঁকে উগ্র জাতীয়তাবাদের ভেতরে নিহিত অন্তঃসারশূন্যতার স্বরূপটি দ্বর্থ্যহীনভাবে চিনতে সাহায্য করেছিল। এমনকি হিরোশিমায় মার্কিন পরমাণু বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় তিনি আন্তরিকভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, “On the day of the Hiroshima bombing, I literally couldn’t talk to anyone. There was nobody. I just walked off by myself... I could never talk to anyone about it and never understood anyone’s reaction.” এসময়, চমস্কি ফিলাডেলফিয়ার স্কুলে পড়ার পাশাপাশি গ্র্যাটজ কলেজে হিব্রু হাই স্কুলেও ভরতি হন এবং জোরদার হিব্রু চর্চা শুরু করেন।

সেন্ট্রাল স্কুল থেকে পাস করে বেরোনোর পর তিনি পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভরতি হন। তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর। এখানে তাঁর পড়ার বিষয় ছিল দর্শন, ভাষা ও যুক্তিশাস্ত্র। এখানে পড়তে এসেই আরবি ভাষার প্রতি তাঁর বেশ আগ্রহ জন্মায়। কিন্তু তাঁর বাড়ি থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব ছিল বেশ বেশি। কিন্তু খরচ বাঁচানোর জন্য তিনি বাড়িতেই থেকে যাতায়াত করার চেষ্টা করতেন। ফলে পথেঘাটে বিপুল সময় নষ্ট হত তাঁর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসার খরচ জোগানো সেসময় তাঁর একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সন্ধেবেলাগুলো আর রবিবার দিনটা তাঁর কাটত হিব্রু শিক্ষকতা করে। কিন্তু খুব শিগগিরই যাবতীয় পাঠ্য বিষএর দিক থেকে তাঁর মনোযোগ উঠে গেল। বছর দুয়েক পরে, পরাশনা অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় রেখেই তিনি কলেজ ছেড়ে দিলেন। সে-সময়ে আরব-ইহুদি সমঝোতার মাধ্যমে যে সমাজতন্ত্রী কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল, তিনি ঠিক করলেন প্যালেস্টাইনে গিয়ে সেই কাজে সাহায্য করবেন। কিন্তু ইহুদি রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক পরিবেশ সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সেখান থেকেও ফিরে এলেন।

পেনসিলভ্যানিয়ায় পড়াতে গিয়ে তাঁর আলাপ হয়েছিল বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী জেলিগ হ্যারিসের সঙ্গে। ব্লুমফিল্ড ঘরানার বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অত্যন্ত তাবড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন হ্যারিস। এই ডেসক্রিপটিভ লিঙ্গুইস্টিকসের প্রায় অআকখ ছিল তাঁর লেখা ‘Methods of Structural Linguistics’ বইটি। এ বইটির প্রুফ দেখে দেওয়ার সূত্রেই চমস্কির সঙ্গে ভাষাতত্ত্ব বিষয়টির প্রথম পরিচয় ঘটে। বাংলায় লেখা ভাষাবিজ্ঞানের বইতে একথাটির উল্লেখ করা অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলা ভাষার রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে আমেরিকায় যে প্রথম গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করে চার্লস ফার্গুসন ১৯৪৫ সালে পিএইচ ডি ডিগ্রি পেয়েছিলেন, তা কিন্তু হ্যারিসের অধীনেই সম্পন্ন হয়। এমনকি, হ্যারিসের বইটিতেও এই কারণেই বাংলা ভাষা থেকেও কিছু উদাহরণ গৃহীত হয়েছে। যাই হোক, অন্যান্য বহু ছাত্রের মতোই, চমস্কিও হ্যারিসের ব্যক্তিত্বের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষিত হন। বিবিধ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে হ্যারিসের সোচ্চার মতামত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চমস্কির সঙ্গে

মিলে যেত। হ্যারিস নিজেও চমস্কির মতোই ছিলেন ইহুদি, ইজরায়েলপন্থী অথচ গোঁড়ামির তীব্র বিরোধী। ফলে হ্যারিসের কাছে শুরু হল চমস্কির প্রথাগত বামপন্থার পাঠ। হ্যারিসের পরামর্শেই চমস্কি দর্শনের পাশাপাশি গণিতের কোর্সও করা শুরু করলেন। চমস্কির কাছে সম্পূর্ণ আনকোরা অথচ দারুণ এক পাঠজগতের দরজা খুলে গেল। হ্যারিসের কথাতেই চমস্কি আবার কলেজে এসে ভরতি হলেন। এবারে তাঁর বিষয় হল ভাষাবিজ্ঞান। সেই সময়ে পেনসিলভ্যানিয়ার ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের পড়াশোনার দস্তুর ছিল অদ্ভুত। স্নাতক স্তরের ছাত্রদের একটা ছোটো দল ছিল, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে তাদের নাম লেখানো থাকলেও রাজনীতি ও চিন্তাজগতের হেন কোনো বিষয় ছিল না যা তাদের আলোচনার পরিধির বাইরে। তাদের এই আড্ডার ঠিকানা ছিল বিভিন্ন রেস্তোরাঁ কিংবা হ্যারিসের বাড়ি। আর হ্যারিসেরও জোরদার মদত ছিল এই তরুণ তুর্কিদের প্রতি। তিনি সপ্তাহে গোটা দুয়েক ভাষাবিজ্ঞানের ক্লাস নিতেন, বাকি সময়টা মশগুল হয়ে থাকতেন এইসব আলোচনাচক্রে। চমস্কিও এই দলে ভিড়ে গেলেন। এমনকি, পরবর্তী কালে তিনি স্বীকার করেছেন যে, হ্যারিসের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতি অমোঘ আকর্ষণই তাঁকে ভাষাবিজ্ঞানের ক্লাসে ভরতি হতে প্রণোদিত করে।

যথাসময়ে পেনসিলভ্যানিয়া থেকে বি এ এবং এম এ পাস করেন চমস্কি, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর কেতাবি যোগাযোগ ছিল অতি ক্ষীণ। ১৯৫১ সালে এম এ পাস করার সময় তাঁর গবেষণাপত্রের বিষয় ছিল ‘Morphophonemics of Hebrew Verbs’। বলা বাহুল্য যে, ছেলেবেলা থেকে হিব্রু ভাষা চর্চা ও পরবর্তীকালে হিব্রু শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা তাঁর এই কাজে সহায়তা করেছিল। হিব্রু ভাষার সাধারণ জ্ঞানের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছিল হ্যারিসের কাছে নতুন করে ভাষাবিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ। সব মিলিয়ে ভাষাতত্ত্বের কাঠামোয় তিনি হিব্রু ভাষার মুল ছাঁচটিকে ফেলে একটি নিরীক্ষামূলক প্রস্তাব রাখলেন সাফল্যের সঙ্গে। ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে চমস্কির প্রথম কাজ ছিল এই গবেষণাপত্র। এই গবেষণাপত্রের গুরুত্ব কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে অপরিসীম। কারণ এখানেই চমস্কির সংবর্তনী ব্যাকরণ বা ‘Transformational Grammar’-এর প্রথম দেখা মেলে। ১৯৪৯ সালে তিনি বিয়ে করেন ভাষাবিজ্ঞানী ক্যারল শ্যাটজকে। তাঁদের এক ছেলে আর দুই মেয়েও হয়।

পেনসিলভ্যানিয়ার দর্শন বিভাগে এসে যে দুই বিখ্যাত দার্শনিকের ছাত্র হওয়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁরা ছিলেন নেলসন গুডম্যান আর চার্লস ওয়েস্ট চার্টম্যান। এর মধ্যে গুডম্যানের সূত্রেই হার্ভার্ডের সোসাইটি অফ ফেলোজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯৫১ সালে তিনি সোসাইটিতে যোগদান করেন ও মাসিক বৃত্তি পাওয়া শুরু করেন। জীবনে সেই প্রথমবার গবেষণার পাসাপাশি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বাইরের কাজ করার চাপ থেকে মুক্ত হলেন তিনি। হার্ভার্ডে থেকেই হ্যারিসের অধীনে চমস্কি তাঁর পিএইচ ডির কাজ শুরু করেন। তাঁর এই স্তরের গবেষণাতেই ক্রমশ তাঁর ভবিষ্যতের তত্ত্বগুলির আভাস মিলতে থাকে।

১৯৫৩ সালে সোসাইটি অফ ফেলোজ-এর সদস্য থাকাকালীনই চমস্কি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ইজরায়েলের একটি কিব্বুৎজে থাকতে চলে আসেন। কিব্বুৎজ হল সমাজবাদী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ সমবায়ী গোষ্ঠী দ্বারা

পরিচালিত এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিখামার। 'দশে মিলি করি কাজ'-এর দর্শন চলে সেখানে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েলের সাহায্যার্থে স্বেচ্ছায় এমন একটি কিব্বুৎজে যোগদান করেন চমস্কি। সেখানে খাদ্যের যথেষ্ট অভাব ছিল, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পরিশ্রমও করতে হত প্রচুর। উদারপন্থী সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রাষ্ট্রকাঠামোর স্বপ্নে বিভোর চমস্কি আনন্দের সঙ্গেই সেসব মেনে নিয়েছিলেন। কারণ সেসময় আমেরিকায় নিজের অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার নিয়েও চমস্কি বিন্দুমাত্র আশা রাখতেন না, তাঁর কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। কিন্তু অচিরেই কিব্বুৎজের মতো প্রতিষ্ঠানের তলে তলে চলতে থাকা বিদ্বেষ ও অন্ধতার আবহ তাঁর মোহভঙ্গ করে। তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন।

১৯৫৫ সালে পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন চমস্কি। সেসময় তিনি যে বইটি লিখছিলেন, তারই একটি অধ্যায় তিনি জমা দেন পিএইচ ডির থিসিস হিসেবে। বইটি যদিও ১৯৫৬ সালেই লেখার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবুও সেসময় সেই বইটি এতই প্রথাবিরোধী ছিল যে, সহজে কোনো প্রকাশক সেটি ছাপতে তখন রাজি হননি। এর বহু বছর পরে, ১৯৭৫ সালে এই বইটিরই কিয়দংশ 'Logical Structure of Linguistic Theory' নামে প্রকাশিত হয়। পিএইচ ডি শেষ করার পর তাঁর হাতে সেসময় প্রায় কোনো কাজ ছিল না। তিনি বাধ্য হয়েই সোসাইটির সদস্যপদের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদন করেন। কিন্তু তার আর দরকার পড়ে না। কারণ এর পরেই মরিস হ্যালির সহায়তায় চমস্কি এমআইটি অর্থাৎ ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে এই মরিস হ্যালির সঙ্গেই যুগ্মভাবে চমস্কি 'the sound Pattern of English' নামে বিখ্যাত বইটি লেখেন। ১৯৬১ সালে চমস্কি আধুনিক ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের পূর্ণ অধ্যাপকের পদ পান। এই বিভাগেওই বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অফ লিঙ্গুইস্টিকস অ্যান্ড ফিলোজফি নামে প্রসিদ্ধ। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই বিভাগে ফেরারি পি ওয়ার্ড অধ্যাপক হিসেবে পড়িয়েছেন ১৯৭৬ সালের পর থেকে তাঁর অলংকৃত এই পদটির নামকরণ হয় 'ইন্সটিটিউট প্রফেসর এমেরিটাস' হিসেবে। বর্তমানে এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের লরিয়েট প্রফেসর হিসেবেও তিনি পড়িয়ে চলেছেন।

ম্যাসাচুসেটসে যোগ দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন চমস্কি। ১৯৬০ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে একটি স্পষ্ট পক্ষ গ্রহণ করাটাকে তিনি তাঁর নৈতিক দায় বলে মনে করেন। ফলে, তাঁর বন্দি হওয়ার আশঙ্কা আছে জেনেও, নির্ভয়ে তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করেন। এই ঝুঁকি যে তিনি কেন নিয়েছিলেন, তার কারণ হিসেবে পরে তিনি বলেছিলেন, "It has to do with being able to look yourself in the eye in the morning." এরই মধ্যে, ১৯৬৬ সালে 'দ্য নিউ ইয়র্ক রিভিউ অফ বুকস'-এ তিনি একটি রাজনৈতিক নিবন্ধ লেখেন, নাম 'The Responsibility of Intellectuals'। নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ামাত্র গোটা বুদ্ধিজীবী সমাজ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য, চমস্কির বিপক্ষ দিকেই পাল্লা ছিল ভারী। কারণ, এই ভয়াবহ বিপদের দিনে রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে

আমজনতার কাছে ফাঁস করে দেওয়ার জদাবি নিয়ে চমস্কি গোটা বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে মুখ খোলার আবেদন রেখেছিলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নৈঃশব্দ্য যে আসলে ঐতিহাসিক পাপ, সেকথা বলে বুদ্ধিজীবী সমাজকে খোলা লেখায় আহ্বান করেছিলেন। নিবন্ধটি প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'দ্য নিউ ইয়র্ক রিভিউ অফ বুকস' চমস্কির লেখা ছাপানো বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে আরও অনেকের সঙ্গে তিনিও কারারুদ্ধ হন। আজও চমস্কির রাজনৈতিক জীবন একই রকমের বর্ণময়। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, ভোগবাদী পণ্যসর্বস্বতা ও বাজারি অর্থনীতির চটুল ফাঁদের বিরুদ্ধে বারংবার মুখ খুলে তিনি বহুজনের বিরাগভাজন হয়েছেন, নিন্দা ও প্রশংসার ঢেউ বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। কিন্তু নির্মম সত্যের প্রতি তাঁর পক্ষপাত চিরকাল অটল থেকেছে। বিশ শতকের সেরা মনীষী হিসেবে স্থান পেয়েছেন তিনি, তাঁকে নিয়ে আলোচনা, প্রকাশনা ও তর্কবিতর্কের অন্ত নেই। তাঁর চিন্তাভাবনা ও কাজের পরিসর বিচার করলে বলা যায়, তিনি চিন্তাজগতের দিক থেকে প্লেটো, দেকার্ত, রুশো, হুমবোল্ট, কার্ল মার্কস, জর্জ অরওয়েল, জেলিগ হ্যারিস প্রমুখের উত্তরসূরী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা পৃথিবীর তিরিশটিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় চমস্কিকে সাম্মানিক ডক্টরেট দিয়েছে। সারা বিশ্বের কাছে চমস্কি আজ জীবিত কিংবদন্তীই বলা যায়। আমরা একনজরে দেখে নেব, ভাষাবিজ্ঞানের দুনিয়ায় চমস্কির অবদান ঠিক কী।

চমস্কির মতে, বিজ্ঞান আসলে কিছু প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা ছাড়া নতুন কোনো কিছুই করে না। তাই এই বিজ্ঞানকে নিয়ে কোনো যান্ত্রিক বা জীবনবিচ্ছিন্ন তত্ত্ব প্রণয়নের বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর মতে, তিনি কিছু প্রকল্প সাজিয়ে তুলে এনেছেন মাত্র, যার মাধ্যমে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি সহজে প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠে। তবে, তিনি এ প্রসঙ্গে বারংবার চেতাবনি দিয়েছেন যে, নতুন করে কোনো কিছুর আবিষ্কার তিনি করেননি। যা করেছেন, তা আসলে প্রাকৃতিক নিয়মের যান্ত্রিকতা ঘুচিয়ে মানবপ্রকৃতির নিরিখে তার বিচার। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের একটি ভাবানুবাদ তুলে ধরা হল :

"আমি যে পদ্ধতিতন্ত্র শিখেছি তাই দিয়ে আমি সারাজীবন চেষ্টা করেছি কিছু কাজ করতে, কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে, যা 'বিজ্ঞান', 'যুক্তিবিচারবোধ', 'তর্কশাস্ত্রসম্মত' ইত্যাদি নামে বাতিল করা হয়েছে। এই বিষয়ে গবেষণাপত্রগুলি আমি মন দিয়ে পড়ি কারণ, আমার মনে হয়েছে, আমি এর মাধ্যমে আমার সীমাবদ্ধতাগুলি অতিক্রম করতে পারব, বা আমি হয়তো অন্য কোনো পদ্ধতিতন্ত্র খুঁজে পাব। বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি হতাশ হয়েছি। হতে পারে, তা আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। নিয়মিত আমি কাগজের পাতায় উত্তর আধুনিকতাবাদ, উত্তর গঠনবাদ ইত্যাদি বিষয়ে নানা ধরনের লেখা দেখতে পাই, এসব পড়িও। কিন্তু আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে এর খুব সামান্যই আমার বোধগম্য হয়। এটা ঠিক যে, এমন বহু জিনিসই আছে, যার অর্থ গ্রহণে আমি অক্ষম। যেমন কিনা আধুনিক পদার্থবিদ্যা বা গণিত সম্বন্ধীয় লেখাপত্র। কিন্তু এগুলির মধ্যে একটা বিশেষ তফাতও আছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমি অন্তত বুঝতে পারি যে ঠিক কী ব্যবস্থা নিলে পদার্থবিদ্যা বা গণিত বোঝা সম্ভব হতে পারে। তা ছাড়া এইসব লেখকরা তাঁদের এই জটিল বিষয়গুলি সহজ ও সরল করে, আমার

জ্ঞানের মাত্রার স্তরে নেমে এসে এই বিষয়গুলি আমাকে বোঝাতে সক্ষম হতে পারেন। তাই, বিষয়গুলি পড়ে, প্রতি ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু জ্ঞান অন্তত লাভ করা সম্ভব হয়। অথচ, প্রথমটির ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে আমি প্রায় কিছুই উদ্ধার করে উঠতে পারি না। ফলে, কীভাবে এগুলিকে পড়লে এগুলি বোঝা সম্ভবপর হতে পারে, সে বিষয়েও আমার কোনো ধারণা তৈরি হয় না।" আসলে চমস্কি যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ ও কার্যকারণবাদী হওয়া সত্ত্বেও, চমস্কির একটি অত্যন্ত প্রিয় বিশ্বাস যে, মানবিক বিবিধ বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে গেলে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলির ভূমিকা বহুক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ এবং সেই কারণেই তা সীমাবদ্ধও বটে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "বিজ্ঞান খুব সহজ সরল বিষয়গুলি নিয়েও তাত্ত্বিক মতামত দেয় এবং সেসব বিষয়ে জটিলতর প্রশ্ন ও প্রসঙ্গের উত্থাপন করে। কিন্তু যে মুহূর্তে এই প্রশ্নগুলি বিশেষভাবে জটিল ও কঠিন হয়ে পড়ে, তখনই বিজ্ঞান আর সেগুলিকে সামলাতে পারে না।... বিজ্ঞান সাধারণত কিছু উপরিতলের প্রান্তীয় বিষয় নিয়ে চর্চা করে, নাড়াচাড়া করে, কিন্তু সেগুলির গভীরে প্রবেশ করে সেগুলিকে সম্পূর্ণত আয়ত্ত করার ক্ষমতা তার নেই। যেমন মানবিকী বিষয়গুলিতে বিজ্ঞান সাধারণত নিরুত্তর, এ বিষয়ে সে কোনো কথারই উত্তর দিতে পারে না। এর প্রধান অ মূল কারণ হল, মানবিকী বিষয়গুলির জটিলতা, কাঠিন্য ও সূক্ষ্মতাকে করায়ত্ত করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অক্ষমতা।"

আদতে চমস্কি মানবিকী বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যেটুকু অবদান স্বীকার করেছেন, সেখানে তিনি কখনোই মানুষকে ভৌত বিজ্ঞানের উপাদান হিসেবে দেখতে চাননি। বরং মানুষের যুক্তি ও ব্যাখ্যার জগতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

নিজস্ব তত্ত্ব ও নীতিগুলির ক্ষেত্রে চমস্কি বরাবরই ভাষিক পার্থক্যের চাইতে বেশি জোর দিয়েছেন ভাষিক সাদৃশ্যগুলির দিকে। তা ছাড়া নিজের আলোচনার পরিসরকে অনেক বেশি সংহত করে তলার জন্য তিনি সাধারণত ইংরেজিসহ অন্যান্য আর যে ভাষাগুলিতে তিনি দক্ষ, সেগুলির মধ্যেই নিজের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অযথা ভাষার অজস্র শাখাপ্রশাখায় বিভাজিত রূপগুলি টেনে এনে কিংবা অচেনা ও অনির্দিষ্ট ভাষিক রূপগুলির ভিড় বাড়িয়ে নিজের বিষয়কে ভারাক্রান্ত করতে তিনি চাননি। চমস্কি অনুভব করেছিলেন, কেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে, শুধু সেটুকু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া বিজ্ঞানের আর কোনো দায় নেই। যদিও, মানুষের আচরণ ও মন যে বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে প্রচুর বিজ্ঞানী যথেষ্ট দ্বিমত পোষণ করেছেন, চমস্কি সেখানে মানবিকী বিদ্যাচর্চার বহুবিধ পরিসরে, এমনকি মানুষের ব্যবহার ও প্রবৃত্তি সংক্রান্ত বহু প্রশ্নের খোঁজে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছেন শুধুমাত্র কার্যকারণ অনুসন্ধানের নিয়ামক হিসেবে। তবে, চমস্কির বক্তব্য ও কাজ কিন্তু বরাবরই বৈজ্ঞানিক যুক্তিকাঠামোয় বাঁধা। তিনিই প্রথম ভাষাতত্ত্ব বিষয়টিকে সাবালক করে তুলেছেন। এককালে শুধু নমুনা সংগ্রহ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য বিচার করাই ছিল ভাষাতত্ত্বের একমাত্র কাজ। সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে চমস্কি বিষয়টিকে একটি পরিপূর্ণ ডিসিপ্লিনের মর্যাদা দিয়েছেন, যেখানে ভাষাতত্ত্ব কেবলমাত্র অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক ডিসিপ্লিনগুলিকে সহায়তা করা ছাড়াও

নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে। ভাষাকে তিনি শুধু একটি যান্ত্রিক সিস্টেম হিসেবে দেখলেন না। বরং, মানুষের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে একজন ভাষীর ভাষিক দক্ষতার নিরিখে মানুষের অন্তর্প্রকৃতি নিয়েও আলোচনা করলেন, ভাষাতত্ত্ব হয়ে উঠল হিউম্যান সায়েন্স।

চমস্কি নিজে পদার্থবিদ্যার মডেল সামনে রেখে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের নতুন রূপ নির্মাণ করলেন। এই মডেলের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

- কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা বা বিষয়ের শুধুমাত্র বর্ণনা বা শ্রেণিবিভাগ করে ছেড়ে দিলে চলবে না, বরং তার কারণ সন্ধান করাটা জরুরি।
- কাজের ক্ষেত্র ও পরিসরকে ছোটো করে আনলে বহু ক্ষেত্রে যে-কোনো তত্ত্ব বা সূত্রকে জোরদার ও সংহতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সুবিধা হয়।
- মানবিক বিষয়গুলি নিয়ে যখন কোনো তত্ত্ব বা সূত্র কথা বলে, তখন সেখানে মানবপ্রকৃতির বিমূর্ত বিষয়গুলিকে বিমূর্তভাবেই জায়গা দেওয়া জরুরি। এর ফলে মডেলগুলি অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হয় এবং তার সীমাবদ্ধতার পরিসর অনেক কমে আসে। শুধুমাত্র কিছু কাগুজে তথ্যের সাহায্যে মানুষের যাবতীয় বিষয়ের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা নয়তো সম্ভব হয়ে ওঠে না।

চমস্কির মতে, মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও কর্টেক্স শুধুমাত্র শারীরবৃত্তীয় কাজগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্যই যে জৈবিকভাবে নির্ধারিত (চমস্কি এ প্রসঙ্গে 'biologically programmed' শব্দটি ব্যবহার করেছেন) হয়ে আছে তা নয়, বরং ভাষা ব্যবহার পরিচালনা করাও তার অন্যতম কাজ। আহৃত শব্দসমষ্টি একজায়গায় জড়ো করা থেকে শুরু করে, তার বিন্যাস ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই মস্তিষ্কের ভূমিকা আছে এবং প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতা জন্মগত।

ভাষা অর্জনের নিরিখে প্রাসঙ্গিকতা বস্তুত, ভাষা শুধুই কয়েকটি শব্দ বা বাক্যবন্ধকে শুনে বা মনে রেখে আয়ত্ত করার বিষয় নয়, ভাষা অর্জনের পদ্ধতির মধ্যে লুকিয়ে আছে, ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম, রূপতাত্ত্বিক সংঘটন এবং অন্বয়তাত্ত্বিক অনুবন্ধের রীতিগুলি বিধি অনুসারে আয়ত্ত করা। সেই নিয়মগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক কী হতে পারে, তা বোঝার জন্য এই ভাষাবিজ্ঞানীদের গবেষণা ও কাজের পদ্ধতির আলোচনা সেজন্যই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

সূত্রনির্দেশ

---

[১] Saussure, Ferdinand De. 'General Principles: Nature of the Linguistic Sign'. *Course in General Linguistics*, Ed. by Charles Bally & Albert Sechehaye, Tr. by Wade Baskin, New York, Philosophical Library, Page 70

[২] শিশিরকুমার দাশ, *ভাষা জিজ্ঞাসা*, তৃতীয় সংস্করণ, ১লা বৈশাখ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, প্যাপিরাস, পৃষ্ঠা ২১

[৩] Robins, R. H. , A Short History of Linguistics, Fourth Edition 1997, London & New York, Longman , Page 226

[৪] Hymes, Dell (1982). "Prague Functionalism". *American Anthropologist*. page 398–399

[৫] Luelsdorf, Philip A. (1983). On Praguian functionalism and some extensions. In Josef Vachek, Libuše Dušková, (eds.). *Praguiana: Some Basic and Less Known Aspects of The Prague Linguistic School*. John Benjamins. Linguistic and literary studies in Eastern Europe; page 16

[১] Saussure, Ferdinand De. 'General Principles: Nature of the Linguistic Sign'. *Course in General Linguistics*, Ed. by Charles Bally & Albert Sechehaye, Tr. by Wade Baskin, New York, Philosophical Library, Page 70

[২] শিশিরকুমার দাশ, *ভাষা জিজ্ঞাসা*, তৃতীয় সংস্করণ, ১লা বৈশাখ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, প্যাপিরাস, পৃষ্ঠা ২১

[৩] Robins, R. H. , A Short History of Linguistics, Fourth Edition 1997, London & New York, Longman , Page 226

[৪] Hymes, Dell (1982). "Prague Functionalism". *American Anthropologist*. page 398–399

[৫] Luelsdorf, Philip A. (1983). On Praguian functionalism and some extensions. In Josef Vachek, Libuše Dušková, (eds.). *Praguiana: Some Basic and Less Known Aspects of The Prague Linguistic School*. John Benjamins. Linguistic and literary studies in Eastern Europe; page 16

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্বাচিত আধুনিক বাংলা প্রাইমারের সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন ও মনোভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে তার প্রয়োগসার্থকতা

নির্বাচিত আধুনিক বাংলা প্রাইমারের সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন ও মনোভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে তার প্রয়োগসার্থকতা

৬.১. প্রাইমারের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের গোড়ার কথা: মেয়েদের প্রাইমার বনাম ছেলেদের প্রাইমার

জন্মানোর পর থেকে কীভাবে শিশুরা ভাষা অর্জন করে, সে নিয়ে জ্যাঁ অ্যাচিসন তাঁর *দ্য আর্টিকুলেট ম্যামাল* বইয়ে একটি পথ নির্দেশ করেছিলেন। মনোভাষাবিজ্ঞান (Psycholinguistics) যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা প্রায় সবাই মানুষের প্রারম্ভিকতম জীবনপর্যায়ের অ্যাচিসন কথিত পর্বগুলোকে মেনে নিয়েছেন। এ বিষয়ে আলোচনার সময়ে মনোভাষাবিজ্ঞানী বা স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানীরা সবসময়েই 'চাইল্ড' বা 'শিশু'— এই লিঙ্গনিরপেক্ষ শব্দটিই ব্যবহার করেন। অর্থাৎ 'শিশু' ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক, জীবনের শুরুতে, ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে, একই রকম সময়পর্বে একই রকম বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। ছেলে বা মেয়ে 'প্রকৃতিগতভাবে আলাদা' হতে পারে, কিন্তু ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে 'আলাদা' হয় না। পাশাপাশি আর-একটি বিষয়েও পাঠককে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। বাংলা ভাষায় প্রাইমার রচনা করার প্রস্তুতি হিসেবে কোনো প্রাইমার-লেখক এ নিয়ে কোনো রকম সমীক্ষা চালিয়েছেন বলে উল্লেখ করেননি। মোটামুটি পাঁচ-ছয় বছরের কোনো শিশু ধ্বনিগত স্তরে, শব্দ ও অর্থগত স্তরে এবং বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে কোন্ সক্ষমতায় রয়েছে, এমন কোনো সমীক্ষার ভিত্তিতে আমাদের প্রাইমারগুলি রচিত হয়েছে বলে মনে হয় না। তা যদি হত, তাহলে 'অজ', 'কুজ্ঝটিকা', 'তেজোময়', 'অখিল', 'প্রগল্‌ভতা' ইত্যাদি শব্দ শিশুপাঠ্য প্রাইমারে অনায়াসে জায়গা পেত না। এখন প্রশ্ন হল, মনোভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে ভাষা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ভাষাশিক্ষার সম্পর্ক স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু ভাষা অর্জনের সহজাত ক্ষমতার ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদ না থাকলে কেমন করে লিঙ্গনির্দিষ্ট প্রাইমারের নির্মাণ সম্ভব?

উনিশ শতকের বাংলায় নারীশিক্ষার উদ্যোগে একদিকে যেমন ছিল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষায় মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস, অন্যদিকে এর বেশ কিছু মিঠেকড়া সামাজিক প্রতিরোধও একের পর এক সামনে আসছিল। সরাসরি প্রতিরোধ হিসেবে চিহ্নিত করা না গেলেও, সে-সময় মেয়েদের জন্য আলাদা, একেবারে পৃথক প্রাইমার লেখার হিড়িক কিন্তু আদতে মেয়েদের জন্য কোনো বিশেষ বন্দোবস্ত বা সুবিধার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং ছেলেদের একচেটিয়া পাঠসাম্রাজ্য থেকে মেয়েদের পড়ার বিষয়কে আলাদা করে দেওয়ার সেই ছিল সূত্রপাত। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে মত-দেওয়া বা স্ত্রীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষণাকারী অনেকেই মনে করতেন, ছেলেদের ও মেয়েদের পড়ার বিষয় এক হতে পারে না। কেশবচন্দ্র সেনের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *পরিচারিকা* পত্রিকা ছিল স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসারকামী। এই পত্রিকায় মেয়েদের ইংরেজি-সহ নানা বিষয় শেখানো হত; জীবনী, দেশকাল, ভ্রমণ, ইতিহাস বিবিধ বিষয়ে একাদশতম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হচ্ছে,

> আমরা কেবল স্ত্রী ও পুরুষের বাহ্যিক শরীরগত ভিন্নতা স্বীকার করি, তদ্রূপ আন্তরিক প্রকৃতিগত ভিন্নতাকে মানিয়া থাকি, ঈশ্বর স্ত্রী প্রকৃতিকে স্নেহ-প্রেম-কোমলতা প্রধান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, পুরুষ প্রকৃতিকে উৎসাহ অধ্যবসায় দৃঢ়তা প্রদান করিয়া সৃজন করিয়াছেন। এই প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে উভয়ের শিক্ষাও বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী শিক্ষা হয়।[১]

এখন প্রশ্ন হল, এই যে 'প্রকৃতির বিভিন্নতা', যাকে 'ঈশ্বরের অভিপ্রায়' বলে চিহ্নিত করছেন নারীশিক্ষার পক্ষে থাকা তথাকথিত প্রগতিশীল কিছু শিক্ষাবিদ, তা আদৌ 'ভাষাশিক্ষার অভিপ্রায়'-টির পরিপূরক হয়ে উঠতে পারছে কি? যদিও, এঁরা কিন্তু মনে করছেন, প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী শিক্ষা দিলে, তবেই সেই শিক্ষা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিজে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সদস্য। ব্রাহ্মসমাজ ছিল সে-যুগের নারীপ্রগতির অন্যতম সহায়ক। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্রাহ্ম মেয়েরা অনেকাংশেই ছিলেন শিক্ষিত বাঙালি নারীর আদর্শ। সেই ব্রাহ্মসমাজেরই মুখপত্র *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি ছাপা হত। তা এহেন প্রগতিশীল *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় বলা হয়,

> বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি স্ত্রীলোকগণের পক্ষে কোন ক্রমেই উন্নতিকর ও শুভফলপ্রদ নহে। স্ত্রী ও পুরুষ জাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে একপ্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব।[২]

এখানেও সেই একই 'প্রকৃতির বিভিন্নতা'-র প্রসঙ্গের অবতারণা করা হল। কিন্তু এই প্রকৃতিগত ভিন্নতা ঠিক কোথায়? কী সেই ভিন্নতা, যার কারণে নারীকে শিক্ষাদানের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক একটি মাধ্যমের সন্ধান করছেন শিক্ষাবিদ্‌রা? এমন কোন্ শর্ত প্রচলিত প্রাইমারগুলি পূরণ করতে পারছিল না, যা মেয়েদের শেখানোর জন্য একান্ত প্রয়োজন?

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'-এ যে ১৬জন এগিয়ে আসা বাঙালি তাঁদের মেয়েদের পাঠাতে শুরু করলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই এই বিদ্যালয়ে পড়াতে শুরু করলেন তিনি, সেই সঙ্গে লিখলেন বিখ্যাত প্রাইমার সিরিজ *শিশুশিক্ষা*-র প্রথম তিনটি ভাগ। ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত হল এর প্রথম ভাগ এবং ১৮৫০ সালে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। বাংলা ভাষায় শুধুই মেয়েদের জন্য লেখা প্রথম প্রাইমার কিন্তু *শিশুশিক্ষা*। এর আখ্যাপত্রে পুস্তকনামের তলাতেই লেখা থাকত 'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ'। তা ছাড়া, *শিশুশিক্ষা* প্রথম ভাগের সঙ্গেই ছাপা হত বেথুনকে উদ্দেশ্য করে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের লেখা দ্বিভাষিক চিঠি। সেখানে তিনি লিখছেন, 'আপনি... বিশেষতঃ এদেশের হতভাগ্য নারীগণের দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অজ্ঞানান্ধকূপ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার মানসে যে অশেষ প্রয়াস পাইতেছেন, আমি আপনকার সেই সমস্ত বিশুদ্ধ গুণে মুগ্ধ হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আপনকার সুপ্রতিষ্ঠিত নাম সংযোজন সাহসে প্রবৃত্ত হইলাম।'

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের পর একে একে অনেকেই মেয়েদের কথা মাথায় রেখে আলাদা করে প্রাইমার রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। অনেকক্ষেত্রেই, নামকরণের বিশেষত্ব ছিল চোখে-পড়ার মতো। মদনমোহন যদিও 'শিশু' শব্দটিকে তাঁর গ্রন্থের নামকরণে বেছে নিয়েছেন, কিন্তু অনেকেই, 'বালিকা', 'বালা', 'নারী' প্রভৃতি স্ত্রী-বাচক শব্দ সরাসরি প্রাইমারের নামকরণে অঙ্গীভূত করে প্রাইমারগুলিকে মেয়েদের ব্যবহার্য বলে চিহ্নিত করতে শুরু করলেন। আশিস খাস্তগীর তাঁর *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ* বইয়ের ভূমিকায় জানিয়েছেন:

> ১৮৬৩-তে অজ্ঞাত লেখকের *বালিকা বান্ধব* বইটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ (অর্থাৎ ভূমিকায়) লেখক বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই বালকগণের প্রথম পাঠোপযোগী অনেক পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু বালিকাগণের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না।... যাহাতে সুকুমারমতি বালিকাগণের চিত্তক্ষেত্রে প্রথমাবস্থা হইতেই ধর্ম্মের বীজ রোপিত, পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্দীপিত এবং তাহাদের চিরপরিচিত কুসংস্কারসকল নিরাকৃত হয় তাহাও ইহার এক প্রধান লক্ষ্য।' বইটি বর্ণমালা দিয়ে শুরু। এরপর রয়েছে নীতিশিক্ষা। 'বালিকা' বা 'বালা' শব্দযুক্ত আরও কয়েকটি প্রাইমার— ১৮৭৪-এ ঢাকার গিরিশ প্রেস থেকে বেরিয়েছে অজ্ঞাত লেখকের *বালাবোধ* ১। মাত্র ১২ পৃষ্ঠার এই প্রাইমার ১০০০ কপি ছাপা হয়েছিল। ১৮৭৯ সালে আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাল্মীকি প্রেস ছাপিয়েছিল দ্বারকানাথ বসুর *বালিকাশিক্ষা* ১। স্ত্রীশিক্ষার জন্য লেখক বইটি লিখেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। ২৯ পৃষ্ঠার বইটি ১০০০ কপি ছাপা হয়।[৩]

কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু মেয়েদের জন্য আলাদা করে প্রাইমার লেখার হিড়িক পড়ে যায় এবং বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিষয়টি হল, মহিলারাও অনেকে উদ্যোগী হয়ে মেয়েদের জন্য প্রাইমার লিখতে শুরু করেন। মেয়েদের জন্য মহিলাদের লিখিত প্রথম প্রাইমার *বালাবোধিকা*। এর লেখক কামিনীসুন্দরী দেবী। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল উনিশ শতকে। মেয়েদের জন্য লেখা এই প্রাইমারগুলির নাম যেটুকু পাওয়া যায়, তার একটি সম্ভাব্য তালিকা পেশ করছি:

বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশসাল	
শিশুশিক্ষা ১,২,৩	মদনমোহন তর্কালঙ্কার	১৮৪৯-৫০	পুরুষদের রচিত
বালিকা বান্ধব	অজ্ঞাত	১৮৬৩	
বালাবোধ ১	অজ্ঞাত	১৮৭৪	
বালিকাশিক্ষা ১	দ্বারকানাথ বসু	১৮৭৯	
নারীচরিত	মার্থা সৌদামিনী সিংহ	১৮৬৫	মহিলাদের রচিত
বালাবোধিকা	কামিনীসুন্দরী দেবী	১৮৬৮	
বালিকা বোধক ১	প্রতুলকুমারী দাসী	১৮৭৭	
সরলনীতি পাঠ	রাধারানি লাহিড়ি	১৮৮২	
বর্ণবোধ	ব্রহ্মময়ী রায়	১৮৮৪	
গল্প স্বল্প	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮৯	
সরল আদিশিক্ষা	হালিমন্নেষা খাতুন	১৮৯৫	
নীহারমালা	বিনোদিনী দেবী	১৮৯৭	
বালিকা শিক্ষা সোপান ১, ২	সরোজিনী দেবী	১৮৯৮	
ভারতবর্ষের ইতিহাস	হেমলতা দেবী	১৮৯৮	
টুক্‌টুকে বই	চারুশীলা দেবী	১৯০০	

এ ছাড়া, জনৈকা উমা দেবী প্রণীত *বালিকা জীবন* নামে একটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। বইটির সংশোধিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ বিশ শতকে প্রকাশিত হলেও সম্ভবত এর প্রথম সংস্করণটি উনিশ শতকেই প্রকাশিত হয়েছিল।

অবলাবান্ধব, পরিচারিকা ও *বামাবোধিনী* পত্রিকায় মূলত মেয়েদের জন্য যে কবিতা ও প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হত, তারই একটি নির্বাচিত সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন রাধারানি লাহিড়ি।

এখন, এই বইগুলি দেখলে বোঝা যাবে, এগুলি দু-ভাবে প্রাইমার হয়ে ওঠার শর্ত পূরণ করতে চেয়েছে। প্রথমত, এগুলি একেবারে প্রথাসিদ্ধ ধরনে বর্ণ, শব্দ এবং বাক্যের সংগঠন শেখার বই। দ্বিতীয়ত, প্রায় প্রতিটি বইতেই ভাষার আন্বয়িক সংস্থাপন পর্বটি শেখানোর পর সংযোজিত হয়েছে কিছু টেক্সট বা রিডার। প্রশ্ন জাগে, যে তাবড় শিক্ষাবিদ্‌রা বারবার মেয়েদের জন্য আলাদা প্রাইমার লেখার ওপরে জোর দিলেন, প্রকৃতিগত ভিন্নতার কথা বলে বারবার সওয়াল করলেন যে ছেলেদের জন্য লেখা প্রাইমার মেয়েদের পক্ষে 'শুভফলদায়ক' হবে না, তাঁরা যখন আদতেই মেয়েদের প্রাইমার লিখলেন, তখন সেই প্রাইমার আদৌ কতটা আলাদা হল?

প্রথমেই শুরু করা যাক, *শিশুশিক্ষা* প্রথম ভাগ দিয়ে। প্রথম ভাগে রয়েছে বাংলার বর্ণ পরিচয়, বর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন, স্বরমাত্রা পরিচয়, স্বরমাত্রা প্রয়োগ করে শব্দগঠন, প্রশ্নবাক্যের গঠন, নঞর্থক বাক্য গঠন, অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের ব্যবহার, বিভিন্ন ক্রিয়ার কাল ব্যবহার করে বাক্য গঠন। এর পরে রয়েছে ছয়টি ছোটো ছোটো রিডার অংশ এবং দুইটি ছোটো পদ্যাংশ।

কিন্তু, 'বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ' লেখা এই প্রাইমারে নতুন কী ছিল? মদনমোহন প্রথম স্বরধ্বনিকে নিয়ে এলেন ব্যঞ্জনধ্বনির শুরুতে। আলাদা করলেন ধ্বনি শেখা এবং বর্ণ লেখার পদ্ধতি। এর আগেও *শিশুসেবধি* এবং *বর্ণমালা*-র মতো বেশ কয়েকটি প্রাইমারে ধ্বনিশিক্ষা এবং বর্ণশিক্ষার বিষয়টি আলাদা করার চেষ্টা করা হলেও প্যাটার্ন রাইটিং-এর বিষয়টি সেখানে খুব স্পষ্ট করে আসেনি। মদনমোহনই প্রথম বাংলার ব্যুৎক্রম বর্ণ লেখার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিটি নিয়ে এলেন। এই পদ্ধতিতে, কোনো একটি বর্ণ লিখতে শেখানোর সময় সেই বর্ণের সঙ্গে আকৃতি সাদৃশ্য আছে, এমন বর্ণগুলি একসঙ্গে শেখানো হয় এবং শেখানোর ক্রম থাকে আকৃতির দিক থেকে তুলনামূলক সরল বর্ণ থেকে তুলনামূলক জটিল বর্ণের দিকে। মদনমোহন প্রথম এই ব্যুৎক্রম বর্ণ বা প্যাটার্ন রাইটিংকে এত স্পষ্ট করে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। বাংলা বর্ণমালায় যেসব যুক্তব্যঞ্জন অপ্রচলিত এবং সংস্কৃত ভাষাতেও বিরল ব্যবহৃত, *শিশুশিক্ষা* দ্বিতীয় ভাগ থেকে তিনি নির্দ্বিধায় সেগুলি বাদ দিয়ে দিলেন। গোটা প্রাইমার রচনার প্রকল্পেই মদনমোহন যে বারবার এই নানারকম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভাষা শেখার প্রক্রিয়াটিকে সরল করে আনতে চাইছেন, সেটা কি 'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের' বালিকাদের কথা মাথায় রেখে? সম্ভবত হ্যাঁ, কিন্তু একথাও পাশাপাশি সত্যি যে, *শিশুশিক্ষা*-র বিষয়ের মধ্যে কোথাও এমন কিছু নেই, যা বালক বিদ্যার্থীদের পক্ষে অনুপযুক্ত। ঠিক এই কারণেই, মদনমোহন প্রবর্তিত এই ছোটো ছোটো পরিমার্জনাগুলি কেবল *শিশুশিক্ষা*-র পাতায় ব্রাত্য হয়ে রইল না। ক্রমশ, মদনমোহনের পথ ধরেই লিঙ্গ নির্বিশেষে, সব প্রাইমারের ক্ষেত্রেই ব্যঞ্জনবর্ণের আগে স্বরবর্ণ শেখানোটাই দস্তুর হয়ে উঠল। এই দস্তুরটাই প্রমাণ করে যে, মেয়েদের জন্য আলাদা প্রাইমারের পক্ষে যাঁরা সওয়াল করছিলেন, ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে এই পৃথকীকরণের ধারণাটি কতটা অবান্তর। অন্তত, ভাষা শেখার পদ্ধতির হিসেবে 'প্রকৃতিগত ভিন্নতা' দিয়ে কোনো একটি ভাষার ব্যাকরণ পড়ার কাঠামো কখনোই বদলে যেতে পারে না।

কিন্তু এ তো গেল ভাষার প্রাথমিক কাঠামো শেখার পদ্ধতিগত আলোচনা। মেয়েদের পড়াশোনার পদ্ধতির পার্থক্য নিয়ে যাঁরা ভাবনাচিন্তা করছিলেন, তাঁরা কিন্তু মূলত জোর দিচ্ছিলেন ভাষাশিক্ষার উপাদানের চাইতেও ভাষা শিক্ষার মাধ্যম টেক্সট বা রিডারগুলির ওপরে। তাঁদের মূল দাবি ছিল, ভাষাশিক্ষার কনটেন্ট বা বিষয় নিয়ে। এই সন্ধানের তুলনামূলক স্পষ্ট রূপ মেলে *বামাবোধিনী* পত্রিকার ১০৫তম সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত এই অংশটি থেকে:

> কেবল ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতির আলোচনাতে স্ত্রীজাতির উন্নতি হয় একথা স্বীকার করিতে পারি না। স্ত্রীজাতিকে স্ত্রীজাতীয় সদ্‌গুণে উন্নত করিতে হইবে।... বিশুদ্ধ স্ত্রী, বিশুদ্ধ মাতা, বিশুদ্ধ কন্যা, বিশুদ্ধ ভগ্নী হওয়া স্ত্রীজাতির জ্ঞানলাভের এই লক্ষ্য।[৪]

'স্ত্রীজাতীয় সদ্‌গুণে উন্নত' করার এই অভিপ্রায় থেকেই উনিশ শতকে মেয়েদের জন্য আলাদা করে টেক্সট লেখার তাগিদ অনুভূত হল। এবার দেখা যাক, মেয়েদের উপযোগী 'টেক্সট' বলতে ঠিক কী বুঝছেন সেই যুগের রিডার লেখকরা? পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রথমেই আরও একবার মদনমোহন তর্কালঙ্কারের গদ্যের দিকে তাকানো যাক। আমি *শিশুশিক্ষা* প্রথম ভাগের ২১ সংখ্যক রিডারটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি:

> মেঘ হইতে জলধারা পড়িতেছে এখন ঘরের বাহিরে যাইব না। আমার গা ও পা ভিজিয়া যাইবে শীত করিবে এবং অবশেষে কফ কাশী হইয়া বড় পীড়া পাইব। মেঘের ভিতর হইতে আলো বাহির হইয়া আমার চক্ষে লাগিতেছে জানালার কপাট দিই। উঃ! মেঘের ডাকে কাণ ফাটিয়া যায়। আলো বাহির হইতেছে আবারও বুঝি মেঘ ডাকে, চক্ষু বুজিয়া থাকি কাণ ঢাকিয়া রাখি এবং মাঝের কুঠুরীতে যাইয়া বসি। রাম! জল ছাড়িল আপদ্ গেল মেঘের ডাকে এখনি মরিয়া গিয়াছিলাম।[৫]

এই যে জলঝড়ের প্রাবল্যে কাতর একটি শিশুর ভয়ার্ত অবস্থার কথা নানাভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে, একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, এই শিশুটির চরিত্র ভাবতে বসে মদনমোহন তার ওপরে সম্ভবত নারীধর্মই আরোপ করেছিলেন। নইলে, 'রাম', 'আপদ গেল', 'এখনি মরিয়া গিয়াছিলাম' জাতীয় বিশেষ বিশেষ এক্সপ্রেশন এত সহজে লিখতে পারতেন কি? আরও কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট করা যাক। কেন, একান্তভাবেই এই এক্সপ্রেশনটিকে আমি 'মেয়েলি' বলতে চাইছি, তা বোঝাতে আমি রবীন্দ্রনাথের *সহজ পাঠ*-এর দ্বিতীয় ভাগের কয়েকটি উদাহরণ টেনে আনব। জনমানসে তখন 'মেয়েলি' প্রকাশভঙ্গির ধরনটি বোঝানোর জন্যই *সহজ পাঠ* থেকে এই উদাহরণ দিতে প্রবৃত্ত হচ্ছি। দ্বিতীয় ভাগে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বর্ণনাগুলি খেয়াল করলেই পাঠক দেখবেন, ঘন নীল মেঘে যখন বাদল করে আসে, তখন সেই আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাসের মধ্যেও বংশু ছাতা মাথায় দিয়ে সংসারবাবুর বাসায় কংসবধের অভিনয় দেখতে যায়। কিংবা, কর্ণফুলি নদীতে বন্যা হলেও কর্তাবাবু আর্দালিকে সঙ্গে নিয়ে বর্ষাতি গায়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন। বজ্রের শব্দ শোনা যাচ্ছে, এমন একটি দুর্যোগপূর্ণ শ্রাবণের দিনে উস্রি নদীতে যখন বান আসে, তখনই ছেলেরা উস্রির ঝরনা দেখতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু সেই একই পাঠে, শান্তা সম্পর্কে বলা হয়, 'শান্তা কি যেতে পারবে। সে হয়তো শ্রান্ত হয়ে পড়বে।'

আসলে, ঘন আষাঢ়ের দিনে মাহেশের রথ থেকে ফেরার পথে পিছল রাস্তায় রাধারাণীও আছাড় খায়, রুক্মিণীকুমারও আছাড় খেয়ে তার ঘাড়ে এসে পড়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত রাধারাণীদেরকেই রুক্মিণীকুমারদের হাত ধরতে হয়। পুরুষ হয়ে ওঠে নারীর পরিত্রাতা। রুক্মিণীকুমাররাই চিরকাল বলেন, 'বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে!' বঙ্কিম থেকে শুরু করে মদনমোহনের রিডার পর্যন্ত সর্বত্রই এই একই সুরে বাঁধা।

উনিশ শতকের শিক্ষাবিদ্রা তাঁদের রিডার এবং টেক্সটের মধ্যে দিয়ে কি নারীকে ঠিক এই শরণাগতির, আশ্রিতের ভাবটিই শেখাতে চাননি? আজ একথা বলতে বাধা নেই যে, শিক্ষিত নারী নয়, শিক্ষিত পুরুষের যোগ্য সঙ্গিনী হিসেবে নারীকে গড়ে তোলাটাই সম্ভবত তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল। নারীশিক্ষার পক্ষে নিয়মিত সওয়াল করা *বামাবোধিনী* পত্রিকার পাতায় স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গল্পচ্ছলে বলতে বসে এইজন্যই লেখক গল্পের মাতৃচরিত্রকে দিয়ে নির্দ্বিধায় বলান, "আমার মেয়ের লেখাপড়ায় মন নেই, ও'কে কোন ভাল ছেলেয় বিয়ে করবে না।" স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর হিন্দু কলেজের ছাত্রজীবনে একটি প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক পুরস্কার পেয়েছিলেন। প্রবন্ধের শিরোনাম 'An Essay on the importance of educating Hindu Females, with reference to the improvement which it may be expected to produce on the education of children, in their early years, and the happiness it would generally confer on domestic life.' প্রবন্ধের ভেতরেও মধুসূদন স্পষ্ট করেই বলছেন, '...we ought to be more careful than in selecting nurses for our children; for there is scarcely anything that exerts a more pernicious influence over the early education of a child than the ignorance of its nurse.'[৬] অর্থাৎ, শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্তা সঙ্গিনীর প্রয়োজন পুরুষের, তার সন্তানের জন্য কেবল অজ্ঞ শুশ্রূষা ব্যতিরেকেও শিক্ষার প্রথম পরিমণ্ডল গঠনে সহায়ক হয়ে ওঠার কারণে। স্ত্রীশিক্ষার এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন নেই।

তাই, মেয়েদের জন্য লেখা প্রাইমারের রিডার অংশগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে সমাজের চোখে সার্থক নারী হয়ে-ওঠার ভাষ্য। আর যেসব রিডারে নারীসুলভ গুণগুলি শেখানোর মতো উপাদান নেই, ক্রমশই মেয়েদের উপযুক্ত নয় এই বোধে সেগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। খোদ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের *শিশুশিক্ষা*-র তৃতীয় ভাগের উদাহরণটির কথাই ধরা যাক। তৃতীয় ভাগের পঞ্চম রিডারটি উদ্ধৃত করছি:

সুশীল বালক বালিকা সকলকে সমান ভাল বাসে।

রাখাল! তুমি ঘোষালদের সামা বামাকে দেখিয়াছ? আমি তাহাদের গুণের কথা শুনিয়া দুই তিন দিন দেখিতে গিয়াছিলাম। আহা! তাহাদের যেমন রূপ তেমনি গুণ। দুটী বইনে কেমন ভাব। কেহ কাহাকে উচ্চ কথাটী কয় না। মুখে সদাই হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। দুজনে একত্রে শয়ন করে, একত্রে ভোজন করে, এক সঙ্গে বেড়ায়, এক সঙ্গে খেলা করে। কেহ কাহারো কাছ ছাড়া হয় না।

> আমি যতবার সামা বামাকে দেখিয়াছি, কখন তাহাদের মলিন বেশ দেখি নাই। চুল গুলি পরিষ্কার, শরীরে মলা (ময়লা) নাই, দাঁতগুলি পরিচ্ছন্ন। তাহাদের গুণের কথা কি কহিব, রাগ করিয়া দাস দাসীকেও কটু কথা কয় না। তুমি বই তুই বাক্য মুখে আনে না। সামাটী বয়সে বড় বটে কিন্তু বামাকে না বলিয়া কোন কাজ করে না। বামাও, দিদি যা বলেন, তাই করে। কখন কোন বিষয় লইয়া দুজনের ঝকড়া কলহ হয় না। তাহাদের দুটীকে দেখলে চক্ষু জুড়ায়।[৭]

পাঠক হয়তো অবাক হয়ে ভাবছেন, অবিকল বিদ্যাসাগরী গোপালের ছাঁচে-ফেলা এই বামা-সামার টেক্সটে আবার কোন নারীবিদ্বেষের সূক্ষ্ম গন্ধ পেয়ে প্রাবন্ধিক বিচারসভায় টেনে আনতে চাইছেন? মুশকিলটা এখানেই। এখানে প্রথাগত অর্থে নারীকে সার্থক স্ত্রী, কন্যা বা মা হয়ে-ওঠার মতো কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত করার উপাদান আলাদা করে গুঁজে দেওয়া হয়নি। তাই এই টেক্সট বালক বালিকা নির্বিশেষে পড়তে পারে যে-কেউ। আর এটাই এই টেক্সটের সবচাইতে বড়ো সমস্যার জায়গা। সেজন্যই, মদনমোহনের মৃত্যুর পর, ১৮৫৮ সালে *শিশুশিক্ষা*-র তৃতীয় ভাগের পনেরোশোতম সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয়, তখন সেখানে 'সামা' আর 'বামা' বদলে গিয়ে হয়ে যায় 'রাম ঘোষাল' আর 'শ্যাম ঘোষাল'! রিডারের শিরোনাম থেকে বাদ যায় 'বালিকা' শব্দটি।

একটা-দুটো স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দকে বদলে দিলেই যদি রিডারের শিশুপাঠ্য নীতি প্রণয়নে কোনো বাড়তি সমস্যার বোধ পাঠক-প্রকাশকের কারোর চোখেই ধরা না পড়ে, তাহলে এ বিষয়ে অন্তত কোনো সন্দেহ থাকে না যে, রিডারে যে নীতিবোধের বীজ শিশুমনে উপ্ত করে দেওয়ার উদ্দেশ্য সাধনের কাজ চলছিল, সেই নীতির বোধ কখনোই ছেলে-মেয়ে বিশেষে পৃথক নয়। কিন্তু একেবারেই কি ছিল না মেয়েদের একেবারে গৃহিণী করে তোলার জন্য বাছাই কিছু নীতি সংবলিত রিডার? অবশ্যই ছিল।

যেমন ধরা যাক উমাদেবী প্রণীত *বালিকা-জীবন* গ্রন্থটি। বাংলা ১৩৪১ সনে বইটির 'সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটির সূচিপত্রে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে, মেয়েদের সুশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রণীত বইটির মুখ্য লক্ষ্যটি ঠিক কী। 'পাপের ভাগী কেউ হয় না', 'দয়ার চেয়ে ধর্ম্ম নাই', 'বিপদে বুদ্ধি হারাইও না' বা 'সত্য পথে চলিবে'-এর মতো নির্বিশেষ নীতিশিক্ষার সঙ্গে সেখানে গুঁজে দেওয়া হয় 'মাতার সহিত পূজার কার্য্য শিক্ষা', 'গৃহকার্য্য শিক্ষা', 'শিল্পকর্ম্ম আলোচনা', 'মহাভারতের সাবিত্রী দ্রৌপদীর দৃষ্টান্ত', 'সতী চরিত্র' কিংবা 'দোক্তার অপকারিতা'-র মতো ছোটো ছোটো নীতিমূলক প্রবন্ধ। স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়, *বামাবোধিনী* পত্রিকা যে দাবি করেছিল, পাঠ্য বিষয়ের বাইরে গিয়েও মেয়েদের 'বিশুদ্ধ স্ত্রী', 'বিশুদ্ধ মাতা', 'বিশুদ্ধ কন্যা' বা 'বিশুদ্ধ ভগ্নী' হয়ে ওঠার উপযুক্ত শিক্ষা দান করতে হবে, সেই 'বিশুদ্ধ'তা অর্জনের উপায় বলতে সামাজিক নীতিনির্ধারকরা ঠিক কী বুঝেছিলেন। *বালিকা-জীবন* গ্রন্থের ভূমিকাতেও উমা দেবী লিখছেন:

> বাল্যকাল হইতে ভাল শিক্ষা না পাইলে, বড় হইয়া হাজার শিক্ষা দিলেও মনটী সহজে বদলায় না। কিন্তু এখনকার ভুল শিক্ষাতেই সব মাটী হইতেছে; এখন যত শিক্ষার ছড়াছড়ি ততই অধোগতি। কোন্ পথে চালিত

> করিলে যথার্থ কাজ হয়, সেটুকু কৈ দেখি না। সংসারে কিছুই নাই, আবার সংসারে সকলি পাই। এই সংসার নিয়েই যখন মানবকে থাকিতে হবে, তখন সেই সংসারের উন্নতি যাহাতে হয় সেই চেষ্টাই তো সকলের আগে করা উচিত। সংসার কাহাকে নিয়ে? এই দেবীরূপিণী নারীকে নিয়েই তো? কিন্তু কৈ আমাদের সেই লজ্জাভূষণে অঙ্গঢাকা, বঙ্গগৃহের বঙ্গবালা, সত্যনিষ্ঠা প্রেমেভরা; কর্ত্তব্যকর্ম্মপরায়ণা নারী কৈ? এখনকার এই যে শিক্ষা হইতেছে ইহা কি ঠিক? ইহাতে সংসারের কি উপকার হইতেছে, তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না। সেই জন্যই গল্পচ্ছলে "বালিকা জীবন" বই খানিতে, বালিকাদের কর্ত্তব্য কি, সংক্ষেপে তাহার আভাষ দিলাম। আমার মতে এই রকম শিক্ষায় শিক্ষিতা করিলে ভদ্রগৃহস্থ ঘরের বালিকাদের উপকার হবে। জীবনগঠনোপযোগী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। সেই জন্য বালিকারা যাহাতে বাল্যকাল থেকে সংযমী হয়, ধর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে, সেই সকল বিষয়ে চরিত্রগঠন করা মাতার সর্ব্বতোভাবে উচিত। সেইজন্যই লক্ষ্মী-পূজা থেকে আরম্ভ ক'রে সমুদয় বৃত্তান্ত বালিকাদের বুঝাইয়াছি। আমাদের সনাতন প্রথার উপযুক্ত ক'রে বালিকাদের গঠন করিতে মাতাকে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহার চিত্র দেখাইয়াছি। যাহাতে বাল্যকাল থেকে সন্নীতি শিক্ষা করে, সময়ে কন্যাগুলি কল্যাণময়ী সুমাতা, সুগৃহিণী হইয়া রমণী-জীবনের সার্থকতা করিতে পারে, সেই চেষ্টাতেই "বালিকা-জীবন" তৈয়ারী হইয়াছে।[৮]

অর্থাৎ, 'বালিকা' থেকে 'রমণী' হয়ে-ওঠার পথে যে বিশেষ কর্মনিপুণতা কিংবা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা পড়ে, ঠিক সেই চারিত্রগুণগুলিই অভ্যাস অথবা ক্ষেত্রবিশেষে অনুশীলনের মাধ্যমে মেয়েরা কীভাবে অঙ্গীভূত করতে পারে, তারই শিক্ষাসহায়ক হয়ে উঠতে চেয়েছিল *বালিকা-জীবন* বা *বালিকা-জীবন*-এর মতো মেয়েদের রিডার।

তবে, সমাজের চোখে ভালো 'মেয়ে' হিসেবে গড়ে-তোলার জন্য এই শিক্ষামূলক বইগুলি যে শিক্ষিত মেয়েদের সর্বগুণসম্পন্ন করে তুলে সংসারের চোখে শুধু একটু বেশি কেজো করে তুলতে চেয়েছিল, তা নয়, বরং মেয়েদের বই-পড়া শিক্ষার বিরুদ্ধে একটি প্রতিযুক্তি খাড়া করাই বহুক্ষেত্রে এ জাতীয় বইয়ের উদ্দেশ্য ছিল। উনিশ শতকীয় আলোকপ্রাপ্তি ও নারীজাগরণের যুগের প্রবল তরঙ্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে সরাসরি এই বিরোধিতা বহুলাংশেই এসেছে সম্পূর্ণ অবান্তর প্রসঙ্গ ধরে। আসলে, যে-কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রায়োগিক উপযোগিতার দিকটি ওতপ্রোত হয়ে থাকে। আর এই তাৎপর্যের সঙ্গেই জড়িত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের বিষয়টি, যা আবার সুগম করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথ এবং সেই সূত্রে প্রশস্ত হয় নারীর স্বাতন্ত্র্য লাভের পরিসর। আর এইখানেই আপত্তি ছিল সামাজিক নীতিপ্রণেতাদের। 'আপন ভাগ্য জয় করিবার' অধিকার দেওয়ার ফলে নিয়ন্ত্রণের রশি নিয়ন্তাদের হাতে আদৌ কতটা থাকবে, তা নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ার ফলেই সম্ভবত জন্ম নিয়েছিল এই নিরাপত্তাহীনতার বোধ, যা থেকে মেয়েদের পড়াশোনা শেখার প্রাথমিক বিরোধিতা জন্ম নিয়েছিল।

অধিকার বদলের প্রশ্নের পাশাপাশি পরবর্তীকালে এর সঙ্গে এসে যুক্ত হয় আরও কয়েকটি মাত্রা। তার অন্যতম দিক অবশ্যই সামাজিক শ্রমের বণ্টন এবং শ্রমের উচ্চ-নিম্ন ভেদের বিচার। বৌদ্ধিক শ্রম অপেক্ষা

কায়িক শ্রমকে একটু ইতরবিশেষে অবজ্ঞার বাঁকা চোখে দেখার এই ভেদবুদ্ধি সামাজিক অনুশাসনের মজ্জাগত। স্বাভাবিকভাবেই, কায়িক শ্রমের কাজ বরাদ্দ সমাজের নীচু তলার মানুষ এবং মেয়েদের জন্য। সংসারে অর্থ উপার্জন করে কর্তৃত্ববাচক পদটি অলংকৃত করে এসেছে পুরুষ আর সেই সংসার চালনার দায়িত্ব নারীকে পরিয়েছে ভৃত্যের শৃঙ্খল। তাই, নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের প্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যখন সেই শিক্ষার প্রয়োগের প্রসঙ্গ আসে, তখন সামাজিক শ্রমবণ্টনের এই ভিত্তিপ্রস্তরে ফাটল ধরে। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষারই বিশেষ একটি অভিমুখ থাকে, শেখানোর প্রক্রিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে সেই অভিমুখনের দিকটি, তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্যপূরণের ছাড়পত্র পেতে হলে শিক্ষার্থীকে যাচাই করার বিবিধ স্তর পেরিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়। আর এই উত্তীর্ণ হওয়ার অর্থ অবশ্যই সামাজিক কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা লাভের শংসাপত্র পাওয়া, যা আদতে সেই দক্ষতাকে মূলধন করে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের পথ সুগম করে দেবে। শিক্ষা আদর্শগতভাবে যতই আত্মোন্নতি বা চরিত্র গঠনের সহায়ক হোক না কেন, শিক্ষা সংক্রান্ত দার্শনিক মতগুলির প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান ও আস্থা রেখেও রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি ভোলা যায় না:

> ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।[৯]

স্বাভাবিকভাবেই, বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রতি মেয়েদের অধিকারের দাবি যখন ক্রমশ যুগের দাবিতে জোরদার হয়ে উঠছে, সেই সময়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিরকালীন সাংসারিক বন্দোবস্ত নিয়ে প্রশ্ন জেগে ওঠাটাই স্বাভাবিক। সমাজে তুলনামূলক উচ্চতর শ্রেণির শ্রম বলে যা চিরকাল চিহ্নিত হয়ে এসেছে, সমমানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে মেয়েরা যদি সেই শ্রমের পেটোয়া বাঁটোয়ারাতেও ভাগ বসায়, সেক্ষেত্রে সংসারের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের দায়িত্ব পালন থেকে কি শিক্ষিত মেয়েরা সরে আসতে চাইবে? এই ভূমিকাবদল-এর ফল যে কী হতে পারে, তা বিবেচনা না করেই সনাতন মূল্যবোধ আঁকড়ে-থাকার মানসিকতা নিয়ে-চলা মানুষগুলো এই ক্রমশ পরিবর্তনের পরিপন্থী মতাদর্শের বাহক হিসেবে নিজের নিজের ভূমিকা স্পষ্ট করতে শুরু করলেন। ঠিক এই মানসিকতারই প্রতিফলন পাওয়া যায় শিক্ষিত নারীর স্বাধীনচেতা সত্তাটির প্রতি কখনও ব্যঙ্গ করে, কখনও বা বিরক্তি প্রকাশ করে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা নানা প্রসঙ্গের মধ্যে। মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সাংসারিক দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব অস্বীকার করতে পারে, এই ভয় থেকেই এ জাতীয় প্রতিরোধের জন্ম। আর এই ভয় থেকেই শুরু হল আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি আদর্শ নারী হয়ে-ওঠার শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত, মেয়েরা যাতে সংসারের প্রতিও তাদের দায়বদ্ধতা বজায় রাখতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তোড়জোড় যতই শুরু হতে লাগল, এ জাতীয় সাংসারিক নীতি, নিয়ম, নিষ্ঠা ও কর্তব্য-অকর্তব্য সংক্রান্ত উপদেশ সংবলিত বইগুলির রমরমাও ততই বেড়ে উঠল। বহির্জগত থেকে মুক্তির সুর যুগের হাওয়ায় মেয়েদের

কানে যতই ভেসে আসতে লাগল, ঘরের দরজাও ততই এঁটে বন্ধ করার প্রস্তুতি শুরু হল। পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল *বালিকা-জীবন*-এর মতো রিডার একের পর এক প্রকাশিত হয়ে চলল। সরাসরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার বিরোধিতা না করলেও, শুধু প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাই যে মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তা নানান আকারে প্রকারে, ইঙ্গিতে প্রকাশ্যে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এই বইয়ের পাতায় পাতায়:

> ১) ... এ শিক্ষাটুকু মেয়েদের থাক্‌বে। এখন ছেলে মানুষ এই রকম লক্ষ্মী পূজা, ষষ্ঠী পূজা, সত্যনারায়ণের পূজার উদ্যোগ আমার সঙ্গে কর্‌তে কর্‌তে ক্রমে দোল দুর্গোৎসবের আয়োজনও শিখ্‌বে; এই রকম মেয়েই হিন্দুনারী নাম সার্থক করে। শুধু বিবি হয়ে পশমের কাজ কার্পেট বোনা সুতার খুঞ্চিবোস বুনিলেই হবে না। হিন্দুর সংসারের প্রধান কাজ পূজার আয়োজন, এটী শেখা একান্ত প্রয়োজন।[১০]

> ২) মাতার কর্ত্তব্য কন্যাকে খুব ভাল রকম সংসারের কর্ম্মে শিক্ষা দেওয়া। কারণ তিনি এখন গৃহিণী হয়ে বুঝেছেন এক সময়ে কি কি কর্ম্মের জন্য তাঁকে শাশুড়ি ননদের কাছে সুখ্যাতি অখ্যাতি সহ্য কর্‌তে হয়েছিল এবং সেই সকল কর্ম্ম না জানিবার দরুণ তাঁকে কতই অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হয়েছিল। শুধু সাজাইয়া স্কুলে পাঠাইলেই মাতার কর্ত্তব্য শেষ হয় না—স্কুলে খান কতক বই পড়িয়েই শিক্ষার চূড়ান্ত হইল মনে করা বোকামি।[১১]

একাধিক সমধর্মী উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, শিক্ষার্থীর ভাষিক উপাদানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার চাইতেও এই রিডারগুলির উদ্দেশ্য ছিল আদতে শিক্ষার্থীর মনে একটি বিশেষ আইডিয়ার প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ, প্রাইমারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য থেকেই কিন্তু রিডারগুলি বিচ্যুত। আমরা আগেই বলেছি, যে প্রাইমারগুলি গ্রন্থগুলি বর্ণ, যুক্তব্যঞ্জন, ফলা, মাত্রা, শব্দ, বা বাক্যের অন্বয় শেখানোর দায়িত্ব পালন করেছে, তাদের ভূমিকা খুবই কেজো ব্যাকরণের। সেখানে ব্যাকরণ কিংবা ভাষাবিধির ফাঁক গলে কোনো ভাষিক কনটেন্ট বা বিষয়ের উঁকি দেওয়ার মতো পরিসর নেই। তাই শুধু ভাষিক উপাদানের সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করাটাই যেখানে টেক্সটের উদ্দেশ্য, সেখানে ছেলে কিংবা মেয়ে নির্বিশেষে সব প্রাইমারেরই আদত চেহারাটাও এক, তার পাঠ্য বিষয়ের ক্রম, কিংবা শিক্ষণনীতির মধ্যে কোনো মূলগত তফাত নেই। কিন্তু যেখানেই, উচ্চতর ভাষা ব্যবহার শেখানোর লক্ষ্যে অনুচ্ছেদ, গল্প, উপদেশাবলি, বা সরল গদ্যে লেখা নির্দিষ্ট বিষয়ানুসারী কোনো কিছু পাঠ্য হয়ে উঠছে, সেখানেই ভাষার ভাব প্রকাশকে হাতিয়ার করে পাঠ্য বইয়ের মধ্যে সন্তর্পণে ঢুকে পড়েছে লিঙ্গভেদের রাজনীতি। ভাষাবিজ্ঞানের বিচার স্বাভাবিকভাবেই, এই বিভাজনকে মানে না, কিন্তু লিঙ্গের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণির বিভেদ এতদূর কার্যকর হতে পারে যে, গোটা উনিশ শতক জুড়ে এই আশ্চর্য একটি ট্যাবু জন্ম দিয়েছে বিশেষ একটি শ্রেণির প্রাইমার। তার পাঠসার্থকতা আজকের খাতিরে বিচার্য নয়, শিশুর প্রথম ভাষা অর্জনের বিচারেও এই লিঙ্গবিভাজনভিত্তিক পাঠ্য নির্বাচন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং শিশু মনস্তত্ত্বের বিচারেও যথেষ্ট নঞর্থক। তবু, প্রাইমারের ইতিহাসকে কীভাবে সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায়, কীভাবেই বা ভাষার বাহন হয়ে ঢুকে পড়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নীতি গুঁজে-দেওয়া বয়ান, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ চিহ্নিত করতে চেয়ে পড়া যেতে পারে এই রিডারগুলিকে। প্রাইমার হিসেবে নয়, সামাজিক দলিল হিসেবেই তার একমাত্র সার্থকতা।

৬.২. প্রাইমারের মনোভাষাবৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন

প্রাইমারের প্রধান কাজ, ভাষার মধ্যে ধ্বনি এবং বর্ণ চেনানো, ধ্বনি (বা বর্ণ) দিয়ে শব্দ তৈরির কৌশল শেখানো এবং একইভাবে শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরির কৌশল শেখানো। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, একটি প্রাইমার আসলে নির্দিষ্ট একটি ভাষার গাঠনিক উপাদান এবং বিন্যাসকেই ধরে থাকে এবং সেই ভাষা অন্য চেহারায় অঞ্চলভেদে ছড়িয়ে থাকলে, সেই প্রাইমার ব্যবহার করা মুশকিল হয়ে পড়ে। 'মান্য' ভাষার চেহারাকেই ধরার চেষ্টা করে প্রাইমার। এখন ধ্বনি যেহেতু সম্পূর্ণ অসীম এবং নিরাকার একটি বিষয়, তাই পরপর শুধু শ্বনির সজ্জা এবং বর্ণ চেনানোর ক্ষেত্রে অনেক সময়েই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়— এমনটাই মনে করেন আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকরা। আবার এই ধ্বনিগুলির মধ্যে আরও নিরাকার নিরবয়ব হল স্বরধ্বনিগুলি। ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে মুখবিবরের মধ্যে সম্পূর্ণ বাধা পাওয়ার কারণে ধ্বনির চেহারা, বিশেষ করে তার উৎপত্তি তুলনায় স্পষ্ট হয়। সুতরাং ধ্বনি (বা বর্ণ) চেনার ক্ষেত্রে স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোন্‌টা আগে শেখানো উচিত, সেই নিয়েও নানা তর্কের অবকাশ তৈরি হয়:

১। প্রথমেই ধ্বনি (বা বর্ণ) চেনানো উচিত কিনা, কিংবা আগে কোনো শব্দ নির্বাচন করে নিয়ে, তারপর সেই শব্দের মধ্যে থাকা ধ্বনি (বা বর্ণ)-কে চেনানো উচিত কিনা

২। স্বরধ্বনি (বা স্বরবর্ণ) দিয়েই ধ্বনি (বা বর্ণ) চেনা শুরু করা উচিত কিনা

৩। ব্যঞ্জনধ্বনি (বা ব্যঞ্জনবsর্ণ) দিয়েই ধ্বনি (বা বর্ণ) চেনা শুরু করা উচিত কিনা

ঐতিহাসিকভাবে, আমাদের নির্ধারিত প্রথম যুক্তিটি বাংলার এযাবৎকালে প্রচলিত কোনো প্রাইমারেই অনুসৃত হয়নি। শব্দ নয়, বরং একেবারে ধ্বনি (বা বর্ণ) দিয়েই শুরু হয় ভাষা শেখার প্রাতিষ্ঠানিক পথ। বাংলা প্রাইমারের ইতিহাস বিচার করলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হয় ১৮১৬ সালে। ১৮১৬ সালেই শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা প্রাইমার— *লিপিধারা*। আর বাঙালি কর্তৃক লেখা বাংলা প্রাইমারের হিসেব ধরলে আর-একটু এগিয়ে এসে আমাদের দাঁড়াতে হয় ১৮৩৫ সালে। সে-বছরেই ঈশ্বরচন্দ্র বসু লেখেন *শব্দসার*। দেশীয় লেখকের লেখা বর্ণশিক্ষার এই প্রথম বইটিকে ধরেও বলা যায়, বিপুল ও প্রভূত পরিমাণ প্রাইমার রচনার রমরমা কিন্তু শুরু হয় ১৮৪০ পরবর্তী কালে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা প্রাইমারের সংখ্যা তার আয়তন ও বৈচিত্র্যে বিশাল আকৃতি নিয়েছে। কিন্তু, আমরা আমাদের সুবিধার্থে, এইগুলির মধ্যে থেকে বেছে নেব শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় প্রাইমারকে। এর তালিকা নিম্নরূপ :

শিশুসেবধি - বর্ণমালা ১,২,৩ (১৮৪০-১৮৫৫)

বর্ণমালা – স্কুল বুক সোসাইটি, ১ম ও ২য় খণ্ড (১৮৫৩-১৮৫৪)

শিশুশিক্ষা – ১,২,৩ (১৮৪৯-১৮৫০)

বর্ণপরিচয় – ১,২ (১৮৫৮)

হাসিখুশি (১৮৯৭)

সহজ পাঠ (১৯৩০)

কিশলয় (১৯৮১)

আমার বই (২০১৩)

বরং, *শিশুসেবধি* এবং *বর্ণমালা*-য় ধ্বনি চেনানোর ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনকে এগিয়ে আনা হল। ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে এই পদক্ষেপটি ছিল প্রয়োজনীয়, কিন্তু সংস্কৃত কাঠামোর ধারাকে বজায় রেখে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার পিছিয়ে গেলেন এবং স্বরধ্বনিকে আগে নিয়ে এলেন তাঁর *শিশুশিক্ষা*-য়। পরবর্তীকালে যোগীন্দ্র সরকারের *হাসিখুশি*তে এই ট্র্যাডিশনের পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে।

শিশুসেবধি এবং *বর্ণমালা* সংস্কৃত প্রাইমারের থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সরে এলেও, স্বরবর্ণ বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনুসরণ করল সংস্কৃত কাঠামোকেই। হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদের পাশাপাশি রইল ৠ (দীর্ঘ ঋ), ঌ এবং ৡ (দীর্ঘ ঌ)। স্বরবর্ণের বিন্যাসের মধ্যে স্থান দেওয়া হল অনুস্বার এবং বিসর্গকে (অং, অঃ)। *শিশুশিক্ষা*-র ক্ষেত্রেও এই একই বিন্যাস অনুসৃত হল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর *বর্ণপরিচয়*-এ বাদ দিলেন ৠ এবং ৡ। কিন্তু রয়ে গেল ঌ। *বর্ণপরিচয়*-এ প্রতিটি ধ্বনি বা বর্ণের সঙ্গে একটি করে শব্দ উদাহরণ হিসেবে রইয়েছে। এক্ষেত্রে ‘ঌ’-এর সঙ্গে সংযুক্ত শব্দ হিসেবে বিদ্যাসাগর বেছেছিলেন ‘লিচু’ শব্দটিকে। তাঁর এই নির্বাচন থেকেই স্পষ্ট যে, বর্ণের সঙ্গে এক্ষেত্রে শব্দের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রইল না, শুধু ধ্বনিটির উচ্চারণ কেমন তা বোঝানো গেল। আসলে ‘ঌ’ দিয়ে কোনো শব্দই বাংলায় নেই। তবু ‘ঌ’ বাদ গেল না, থেকে গেল *বর্ণপরিচয়*-এ, থেকে গেল *হাসিখুশি*তেও। ‘ঌ’ প্রথম বাদ পড়ল রবীন্দ্রনাথের হাতে, *সহজ পাঠ*-এ এসে।

ব্যঞ্জন এবং যুক্তব্যঞ্জন বোঝানোর ক্ষেত্রে নানা ধরনের অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে। এই গণ্ডগোলের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত বর্ণমালার অনুসরণ। বাংলায় ‘নাসিক্য’ ধ্বনি বোঝাতে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার কিংবা ধ্বনির নিরিখে ড/ড়, ঢ/ঢ়, য/য়-এর তফাত ধরা পড়েনি *শিশুসেবধি*, *বর্ণমালা*-য়। অথচ এই দুই প্রাইমারের পাঠ (রিডার) অংশে জায়গা করে নিয়েছে ‘পাঁচ’, ‘ক্রীড়া’, ‘পায়’, ‘দয়া’, ‘পড়’ ইত্যাদি শব্দ।

একই সমস্যা রয়েছে *বর্ণমালা*-তেও। সেখানেও পাঠ অংশে ‘হয়’, ‘নয়’, ‘বড়’, ‘সৎ’, ‘ভবিষ্যৎ’, ‘তাবৎ’, ‘তাঁহাদিগের’ (চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার) –এর মতো প্রচুর প্রচুর শব্দ। ‘শিশুশিক্ষা’-য় আছে ‘পাড়’, ‘ছাড়’, ‘গাড়ী’, ‘গাঁথি’, ‘ফাঁদ’, ‘পাইয়াছ’, ‘হইয়াছে’, ‘ভিজিয়া’, ‘খোঁড়া’ ইত্যাদি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর *বর্ণপরিচয়*-এ নিয়ে এলেন ড়, ঢ়, য়, ৎ এবং ঁ। *হাসিখুশি*তেও এই একই ধারা অনুসরণ করে বর্ণগুলি রয়েছে। *সহজ পাঠ*-এর ক্ষেত্রে কিন্তু আবার অনুপস্থিত হয়ে রইল ড়, ঢ়, য়, ৎ, ং,ঃ, ঁ। এখানেও পাঠ অংশে 'ওড়ে' (পাখা মেলে ওড়ে), 'আষাঢ়ে' (আষাঢ়ে বাদল নামের, নদী ভর-ভর), 'যায়' (বেলা যায়), 'শরৎ' (এসেছে শরৎ, হিমের পরশ) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে অনুপস্থিত বর্ণগুলির বহুল অস্তিত্ব চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে একটা বিধিসম্মত সতর্কীকরণ অবশ্য গ্রন্থের শুরুতেই দিয়ে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, যার মাধ্যমে *সহজ পাঠ*কে অবশ্যই বেশ কিছুটা ছাড় দেওয়া চলে— "এই বই বর্ণপরিচয়ের পরে পঠনীয়"।

আর-একটি বিশেষ ক্ষেত্রেও অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে *শিশুসেবধি, বর্ণমালা, সহজ পাঠ* ইত্যাদি প্রাইমারগুলির ক্ষেত্রে। সেটি হল, 'ক্ষ'-এর অবস্থান। এই তিনটি বইতে 'ক্ষ'-এর স্থান হয়েছে অসংযুক্ত বর্ণমালার মধ্যে, অর্থাৎ 'ক্ষ'-কে একটি পৃথক ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ক্ষেত্রমোহন দত্ত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর *বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ*-এ, অর্থাৎ যেটি 'অসংযুক্ত বর্ণ', সেখানে 'ক্ষ'-কে স্থান দেননি। 'ক্ষ' আসলে সংযুক্ত ব্যঞ্জন, 'ক্' এবং 'ষ্' যোগে গঠিত, তাই স্বাভাবিক যুক্তিতেই *বর্ণপরিচয়*-এর প্রথম ভাগে তা আসেনি।

যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে *শিশুসেবধি*-তে প্রথমে –ফলা হিসেবে য, র (-ফলা), ল, ব, ন, ম, ঋ, র (রেফ) শেখানো হল। তারপর স্বরমাত্রা, অনুস্বার এবং বিসর্গও শেখানো হয়েছে। যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে নাসিক্য ব্যঞ্জনকে প্রথম ব্যঞ্জন করে বর্গ ধরে ধরে যুক্তব্যঞ্জনের রূপ দেখানো হয়েছে। এরপর নির্দিষ্ট ক্রম বর্জন করে নানা প্রকারের যুক্তব্যঞ্জন শেখানো হয়েছে।

বর্ণমালা-তে যুক্তব্যঞ্জনের গোড়ার দিকে নাসিক্য ব্যঞ্জনকে প্রথম ব্যঞ্জন হিসেবে রেখে শেখানো হচ্ছে। তারপর 'যুক্তাক্ষর' অংশে একে একে ক-হ পর্যন্ত প্রতিটি ব্যঞ্জনকে প্রথম ব্যঞ্জন হিসেবে রেখে যুক্তব্যঞ্জন সাজানো হয়েছে। লক্ষণীয় যে, যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যেই এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে স্বরমাত্রার ব্যবহার।

শিশুশিক্ষা-তেই প্রথম স্বরমাত্রাকে যুক্তব্যঞ্জনের থেকে আলাদা করা হল। তাই স্বাভাবিকভাবে, প্রথম ভাগে কোনো যুক্তব্যঞ্জনেরই ব্যবহার করা হল না। দ্বিতীয় ভাগে নিয়ে আসা হল যুক্তব্যঞ্জনকে। সেক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জন শুরু করা হল য-ফলা দিয়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর *বর্ণপরিচয়*-এও এই একই বিন্যাস রেখেছেন। য-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা, ব-ফলা দিয়ে প্রাথমিক সূত্রপাত। লক্ষণীয়, প্রতিটি –ফলা শেখানোর পর সেই –ফলা যুক্ত শব্দ দিয়ে তিনি তৈরি করেছেন পাঠ অংশ। *হাসিখুশি*-তে যুক্তব্যঞ্জনের শুরু য-ফলা দিয়েই। এখানেও যুক্তব্যঞ্জনগুলির জন্য আলাদা আলাদা ছবি, ছবির নীচে ছড়া, যুক্তব্যঞ্জনগুলির আকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে সংযোজিত হয়েছে ছবিগুলি। *সহজ পাঠ* দ্বিতীয় ভাগে আলাদা করে যুক্তব্যঞ্জনের উল্লেখ নেই। একেবারে পাঠ অংশের মাধ্যমে যুক্তব্যঞ্জন শেখানো হচ্ছে। এখানে শুরু অবশ্য হয়েছে অনুস্বার দিয়ে। তারপর য-ফলা এবং এরপর প্রথাগতভাবেই এগিয়ে গেছে *সহজ পাঠ*।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার *শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ*-এর ভূমিকায় বলেছেন, “যে সকল সংযুক্ত বর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় একেবারে অপ্রচলিত এবং সংস্কৃত ভাষাতেও বিরলপ্রচার তৎসমুদায় শিশুগণের অনাবশ্যক অভ্যাস পরিশ্রম পরিহারার্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেমন, ঙ্‌য, ছ্য, ঞ্য, চ্র, ঝ্র, খ্ল, ঙ্ব, ঞ্ব, খ্ন, ঝ্ণ, ঘ্ণ, ছ্ণ ইত্যাদি।” [১২]

এর আগে *শিশুসেবধি, বর্ণমালা* সর্বত্রই এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে এতখানি অগ্রসর হলেন, তিনি কিন্তু স্বরবর্ণমালা থেকে ঋ বা ঌ বাদ দেননি। এই বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

ধ্বনির পর শব্দের স্তরে এসে অসামঞ্জস্য চরম আকার ধারণ করল। শিশুর প্রথম ভাষার স্বাভাবিক অর্জনের ফলে যে শব্দভাণ্ডার (lexicon) তার মস্তিষ্কের মধ্যে তৈরি হল, তার সঙ্গে কোনোরকম সমীকরণ স্থাপনের কোনো চেষ্টাই প্রাইমারগুলির ক্ষেত্রে দেখা গেল না। *শিশুশিক্ষা*-র একেবারে শুরুর দিকে ‘ক্ষীণ’, ‘কসী’, ‘মসী’, ‘মীন’, ‘সুদ’ ইত্যাদি শব্দ কখনওই বালক শিক্ষার্থীর চেনা জগৎ থেকে উঠে আসা শব্দ হতে পারে না। *শিশুসেবধি* (বর্ণমালা, ২য় ভাগ)-এর একেবারে (১) নম্বর অংশেও যে ‘আখ্যা’, ‘ইন্দু’, ‘অংশু’, ‘ইক্ষু’, ‘ঈশ’, ‘উষ্ট্র’, ‘কর্জ্জ’ ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলিও শিশুদের পূর্বে চেনা নয়। একই সমস্যা দেখা যায় ‘বর্ণপরিচয়’ (১ম ভাগ)-এ, ‘অ’ ধ্বনির প্রয়োগ শেখাতে সেখানে দেখা যায় ‘অজ’ শব্দের ব্যবহার।

বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার, জটিল ও যৌগিক বাক্যের উদাহরণ মনোভাষাবিজ্ঞানবিরোধী। মাতৃভাষা বা ঘরের ভাষা এবং প্রথম ভাষা যদি একই হয়, তবুও শিশুর শোনা ও বলার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই সাধুভাষা তার অভিজ্ঞতার অংশ হতে পারে না। চেনা থেকে অচেনার দিকে যাওয়ার যে প্রারম্ভিক শর্ত (শিক্ষার ক্ষেত্রে) তা শব্দ ও বাক্যে ক্ষেত্রে রীতিমতো লঙ্ঘিত হয়। ‘শিশুসেবধি’ (বর্ণমালা, ২য় ভাগ)-এ ‘দ্ব্যক্ষর শব্দের পাঠ’ অংশের দিকে তাকানো যাক। দুই সিলেবলবিশিষ্ট সব্দ এবং সেই শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে পাঠের উপযোগী করা হয়েছে এখানে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ-স্বরমাত্রা ও যুক্তব্যঞ্জন শেখার ঠিক পরেই এই পাঠ অংশটি ব্যবহৃত হবে। সেখানে প্রথম বাক্যটি হল— “বিজ্ঞ জনে বহুগুণ বর্ত্তে, মূর্খ লোক প্রায় দোষী হয়, এই হেতু শত অজ্ঞ ব্যক্তি এক বিজ্ঞ তুল্য নহে।” [১৩] প্রথমত, এই বাক্যটির গঠন দীর্ঘ, উনিশটি শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, উনিশটি শব্দের মধ্যে ‘বিজ্ঞ’, ‘বর্ত্তে’, ‘হেতু’, ‘অজ্ঞ’, ‘তুল্য’, এমনকি ‘ব্যক্তি’ শব্দটিও শিশুর আয়ত্তাধীন শব্দভাণ্ডারের (lexicon size) মধ্যে আসে না। তৃতীয়ত, বাক্যের গঠনের দিক থেকে তিনটি বাক্যাংশ জুড়ে একটি জটিল বাক্যের চেহারা নিয়েছে।

এইরকম আর-একটি বাক্য হল— “হে বন্ধু বাটী দ্বারে এক জন অতি দীন অন্ধ বৃদ্ধ প্রতি দিন এক খানি বস্ত্র যাচ্ঞা করে আর শীত কালে সেই ব্যক্তি বস্ত্র বিনা হিম বায়ু সহ্য করে, কিন্তু এই পল্লী মধ্যে কোন লোক উক্ত দুঃখি জীব প্রতি স্নেহ করে নাই, অতএব তুমি যদি দয়া কর তবে দীন হীন ক্ষীণ ভিক্ষু রক্ষা

পায়।"[১৪] এই বাক্যটিতে শব্দসংখ্যা ৫৩। 'বাটী', 'যাচ্ঞা', 'হিম' এই রকম শব্দ ছাড়াও প্রথমে দুটি বাক্যাংশ মিলে যৌগিক এবং তারপর দুটি জটিল বাক্য মিলে একটি অতি দীর্ঘ মিশ্র বাক্য তৈরি করা হয়েছে।

শিশুশিক্ষা-তেও এই একই সমস্যা দেখা যায়— "গুরু লোকের উপদেশে অবহেলা করিও না, যাহারা তোমার একপাঠী তাহাদের সহিত কখন কলহ করিও না, কাহাকেও কটু কথা কহিও না।"[১৪]

বিদ্যাসাগর তাঁর *বর্ণপরিচয়* (প্রথম ভাগ)-এ এই সমস্যা থেকে কিছুটা বেরোনোর চেষ্টা করেছেন। "বড় গাছ। পথ ছাড়।"[১৫] থেকে শুরু করে তিনি ক্রমশ "আমি যাইব। কাক ডাকিতেছে।"[১৬]-র মতো ছোটো ছোটো দুই শব্দের বাক্য সাজিয়েছেন। তারপর এসেছে "আমি মুখ ধুইয়াছি।"[১৭]-র মতো একটু বড় বাক্য। ক্রমশ এগোতে এগোতে ১৩ নং পাঠে এসে দেখা যাচ্ছে "কাল জল হইয়াছিল, পথে কাদা হইয়েছে।"[১৮] বাক্যগুলি সাধুভাষায় লেখা ছাড়া অন্য কোনো সমস্যা নেই। এমনকি জটিল বাক্যও এসেছে ধীরে, ক্রমপারম্পর্য রক্ষা করেই।

তবে এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নিঃসন্দেহে *সহজ পাঠ*। প্রথম ভাগের চতুর্থ পাঠে এসে প্রথম প্রশ্নসূচক বাক্য দেখা গেল[১৯]— "ভাই, ঘড়ি আছে কি?" তারপর "এ কী পাখি?" প্রথম ভাগে কোনো জটিল বাক্য নেই বললেই চলে। দীর্ঘ বাক্য আট/নয় শব্দের— "ঝাঁকায় কাঁচা আম নিয়ে মধু গলিতে হেঁকে যায়।"[২০] "আশাদাদা আর তার ভাই কালা কাল ঢাকা ফিরে যাবে।"[২১] এই বাক্যের মধ্যে এমন কোনো শব্দ নেই, যে শব্দ শিশুর আয়ত্তাধীন শব্দভাণ্ডারের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

সহজ পাঠ (১৯৩০) প্রকাশিত হওয়ার পর পঞ্চাশ বছর পর প্রকাশিত হয় *কিশলয়* (১৯৮১) এবং তিরাশি বছর পর *আমার বই* (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি)। *সহজ পাঠ* থেকে *কিশলয়*— মধ্যবর্তী এই পঞ্চাশ বছরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রচুর প্রাইমার প্রকাশিত হলেও, পশ্চিমবঙ্গের সরকার ও সরকার-পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে ব্যবহৃত হয় *কিশলয়* এবং ২০১৩ সাল থেকে *আমার বই*।

কিশলয় বইটি থেকেই নির্দিষ্ট করে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির পরিবর্তে 'whole word method' গ্রহণ করে বর্ণ শেখানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। যদিও স্বরবর্ণ দিয়েই এর সূত্রপাত, কিন্তু 'অ'-এর বদলে এসেছে 'আ'। 'আম' শব্দ থেকে 'আ', 'ম্', পরে 'দই' শব্দ থেকে 'দ্', 'ই'— এইভাবে এগোতে থাকে। প্রথম শ্রেণিতে স্বরমাত্রার ব্যবহার শেখানো হলেও যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার এসেছে 'কিশলয়' দ্বিতীয় শ্রেণির বইয়ে। তবে, *সহজ পাঠ*-এর মতো, *কিশলয়*-এ প্রথমে অনুস্বার এবং বিসর্গ-এর প্রয়োগ দেখানোর পর 'ন্দ', 'স্ত', 'ন্ত' এসেছে। আসলে 'whole word method' যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেও অনুসৃত হওয়ায় নির্দিষ্ট কোনো প্যাটার্ন সেভাবে পাওয়া যায় না। পাঠ অংশের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিশুর আয়ত্তাধীন শব্দভাণ্ডার এবং বাক্তগঠনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শব্দ নির্বাচন এবং চলিত ভাষায় সরল বাক্য থেকে ধীরে ধীরে জটিল বাক্যের দিকে

এগিয়েছে। *কিশলয়*-কে মনোভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে অনেকটাই বিজ্ঞানসম্মত প্রাইমার বলে মনে করা যেতে পারে। তবে *কিশলয়* থেকেও এদিক থেকে আরও খানিক এগিয়েছে *আমার বই*।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরির ক্ষেত্রে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করে। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি এই রাজ্যের পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি খসড়া পাঠক্রম তৈরি করে রাজ্যের হাতে তুলে দেয় ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই প্রস্তাবিত পাঠক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে একটি সমন্বিত বইয়ের কথা বলা হয়। প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা, গণিত, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষাকে সমন্বিত করে এই *আমার বই* (প্রথম শ্রেণি; ২০১৩) প্রকাশিত হয়। ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয় *আমার বই* (দ্বিতীয় শ্রেণি)।

প্রথম ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে *আমার বই* এমন কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়, যা মনোভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথমেই আমি আসব ধ্বনি বা বর্ণ চেনানোর প্রসঙ্গে। এই বইয়েই দেখা গেল কোনো চেনা শব্দ থেকে ধ্বনিতে যাওয়ার চেষ্টা। স্বরধ্বনি দিয়ে নয়, ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে শুরু হল এই প্রচেষ্টা। আর সেখানেও প্রথম যে ধ্বনি (বর্ণ) দিয়ে শুরু করা হল, তা হল 'ব'। এই ক্ষেত্রে যে যুক্তিগুলিকে সামনে এনেছেন কমিটির সদস্যরা সেগুলি হল—

- ২০১৫-এর জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (National Curriculum Framework 2005) অনুযায়ী, শিশুর চেনা জগৎ থেকে শুরু করার ক্ষেত্রে 'অ' দিয়ে তৈরি এমন কোনো শব্দ পাওয়া যায় না, যা দিয়ে কোনো চেনা বস্তু বোঝানো হয় এবং 'contextualize' করার জন্য যার ছবি দেওয়া যেতে পারে।

- স্বরধ্বনি (বা বর্ণ)-র চেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি অনেক বেশি মূর্ত ও বোধগম্য। তাই শিশুর কাছে শেখার প্রথম ধাপ হিসেবে ব্যঞ্জনধ্বনি অধিকতর সহায়ক।

- ব্যনজনধ্বনির মধ্যে আবার সবচেয়ে সহজ ওষ্ঠ্যধ্বনি এবং ওষ্ঠ্যধ্বনির ক্ষেত্রে আবার 'ব'-ধ্বনি। মনে রাখতে হবে, শিশু যখন কলধ্বনির স্তরে থাকে, তখন প্রধান ধ্বনিই হল 'ব', যে কারণে ইংরেজিতে এই স্তরকে 'babbling' বলা হয়। অর্থাৎ, খুব সহজ, উচ্চারণযোগ্য ব্যঞ্জন হল 'ব্'।

- 'ব্' দিয়ে 'বই', 'বল' প্রভৃতি বেশ কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায় যা শিশুর অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত, যার ছবি দেওয়া সম্ভব।

- এমনকি লেখার ক্ষেত্রে 'ব'-এর গঠন শিশুদের পক্ষে শুরুর জন্যও আদর্শ। কোনো বক্ররেখা নেই, শুধু তিনটি সরলরেখা। উপরন্তু, 'ব'-ই একমাত্র বর্ন, যা লেখার সময় একবারও হাত না তুলে

লেখা সম্ভব। ‘ব’ থেকেই অনুক্রম লিপি অভ্যাসের পরম্পরায় অভ্যাস করা যায় ‘র’, ‘ক’, ‘ঝ’, ‘ঋ’ প্রভৃতি হরফ সহজেই অভ্যাস করা যায়।

শব্দভাণ্ডার তৈরির ক্ষেত্রে শিশুর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খুব ধীরে চেনা শব্দ থেকে অচেনার দিকে এগোনো হয়েছে। প্রতিটি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছোটো ছোটো পাঠ অংশ। চলিত ভাষায় লেখা, বিষয়ের দিক থেকে শিক্ষার্থীর চেনা জগৎ, সরল বাক্যে প্রস্তুত করা হয়েছে পাঠ অংশ। প্রথম শ্রেণির কাঙ্ক্ষিত শিখন সামর্থ্য (Expected Learning Outcome) পরিষ্কার করে চিহ্নিত। যুক্তব্যঞ্জনহীন শব্দ দিয়ে তৈরি আট/দশটা বাক্য পড়তে পারবে এবং কোনো বিষয় নিয়ে চার/পাঁচটি বাক্য লিখতে পারবে।

দ্বিতীয় শ্রেণির শুরুতেই রয়েছে যুক্তব্যঞ্জনের অভ্যাস। ব্যঞ্জন বর্ণমালার প্রথম ব্যঞ্জনকে সামনে রেখে পরবর্তী ব্যঞ্জনগুলিকে যুক্ত করা (যেখানে যেমন সম্ভব) এবং যুক্তব্যঞ্জনগুলি দিয়ে শব্দ তৈরি এবং সেই শব্দ ব্যবহার করে ছবি সহ ছোটো ছোটো পাঠ অংশ তৈরি করা হয়েছে। এভাবেই এগিয়ে চলেছে যুক্তব্যঞ্জনের শিক্ষা। দ্বিতীয় শ্রেণি প্রান্তিক কাঙ্ক্ষিত শিখন সামর্থ্য (End Expected Learning Outcome/ EELO) হল যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত শব্দ দিয়ে মোটামুটি একটি অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে এবং লিখতে পারবে। বিশেষজ্ঞ কমিটি মনে করেছে, অষ্টম শ্রেণির আগে সাধুভাষার প্রয়োগ শিক্ষার্থীর সামনে না রাখাই উচিত।

উৎসনির্দেশ

[১] *পরিচারিকা,* চৈত্র, ১২৮৬, ১১ সংখ্যা, পৃ. ২৪১

[২] *তত্ত্ববোধিনী,* চৈত্র, ১৮০২, ২য় ভাগ, পৃ. ২২৭

[৩] আশিস খাস্তগীর, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ,* প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬

[৫] মদনমোহন তর্কালঙ্কার, *শিশুশিক্ষা,* আশিস খাস্তগীর সম্পা. প্রথম আকাদেমি সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৬৫

[৬] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *মধুসূদন রচনাবলী,* ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পা. কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, নভেম্বর ১৯৫৭, পৃ.৫১৯

[৭] মদনমোহন তর্কালঙ্কার, *শিশুশিক্ষা,* আশিস খাস্তগীর সম্পা. প্রথম আকাদেমি সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৮৭

[৮] উমা দেবী, *বালিকা-জীবন,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ভূমিকার ৩য় পৃষ্ঠা

[৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শিক্ষাসমস্যা’, *শিক্ষা,* শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৮

[১০] উমা দেবী, *বালিকা-জীবন,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫

[১১] উমা দেবী, *বালিকা-জীবন,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১

[১২] আশিস খাস্তগীর, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ,* প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৭০

[১৩] আশিস খাস্তগীর, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ,* প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১১৫

[১৪] আশিস খাস্তগীর, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ,* প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৯৯

[১৪] মদনমোহন তর্কালঙ্কার, *শিশুশিক্ষা,* আশিস খাস্তগীর সম্পা. প্রথম আকাদেমি সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৬৪

[১৫] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর. *বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ.* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি. কলকাতা. ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড. ১১ জুন ২০১৯, পৃ. ৪০

[১৬] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর. *বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ.* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি. কলকাতা. ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড. ১১ জুন ২০১৯, পৃ. ৪১

[১৭] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর. *বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ.* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি. কলকাতা. ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড. ১১ জুন ২০১৯, পৃ. ৪১

[১৮] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর. *বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ.* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি. কলকাতা. ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড. ১১ জুন ২০১৯, পৃ. ৪৩

[১৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. *সহজ পাঠ প্রথম ভাগ.* শান্তিনিকেতন. বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ. বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ৩০

[২০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. *সহজ পাঠ প্রথম ভাগ.* শান্তিনিকেতন. বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ. বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ৫১

[২১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. *সহজ পাঠ প্রথম ভাগ.* শান্তিনিকেতন. বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ. বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ২৭

সিদ্ধান্ত

এই পূর্ণাঙ্গ গবেষণাকর্মটিকে অগ্রগতির নিরিখে মোট সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে। প্রত্যেকটি পর্যায়ের মুখ্য উদ্দিষ্টটিকে উল্লেখ করে সেই পর্যায়ের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা উপনীত হওয়া ফলাফলের কথা পর্যায়ভেদে লিপিবদ্ধ করা হল।

প্রথম পর্যায়:

গবেষণাকর্মের অগ্রগতির এই পর্যায়ের ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছিল। ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রাথমিক নির্ধারিত উদ্দেশ্য ছিল—

- দুই থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ভাষা অর্জন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও তার নির্দিষ্ট কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা
- শিশুর ভাষা অর্জনের অনুমাননির্ভর দিকটি রেকর্ড করা এবং কজ-এফেক্ট লার্নিং চিহ্নিত করা
- ভাষা অর্জন পদ্ধতির সঙ্গে পিকচার পাজল মেথডের সংগতি থাকার বিষয়টি মিলিয়ে দেখা
- ভাষা অর্জনের ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতিটি চিহ্নিত করার সম্ভাব্য কিছু প্রমাণ সংগ্রহ
- নির্দিষ্ট এক-একটি ভাষাপরিবেশে শিখনপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন সামাজিক ফ্যাক্টরগুলির প্রভাব যাচিয়ে দেখা
- ভাষা অর্জনের পদ্ধতি শিশুবিশেষে, পারিবারিক কাঠামো বিশেষে বা জন্মগত কোনো নির্ধারক বিশেষে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি না চিহ্নিত করা
- ভাষাশিক্ষার এনসাইক্লোপিডিক স্তরে কীভাবে তথ্য আত্তীকৃত হচ্ছে তার একটি সম্ভাব্য রূপরেখা নির্মাণ
- ধ্বনি থেকে শব্দ, শব্দ থেকে শব্দগুচ্ছে, শব্দগুচ্ছ থেকে বাক্যে কীভাবে ভাষিক এক্সপ্রেশন ক্রমোন্নতি লাভ করছে তার সময়রৈখিক গ্রাফ তৈরি করা
- প্রশ্নবাক্য নির্মাণের বিশেষত্ব চিহ্নিত করা
- নিষেধবাক্য নির্মাণের ক্ষেত্রে নিষেধাত্মক এক্সপ্রেশনের অবস্থান বাক্যের কোথায় হচ্ছে চিহ্নিত করা এবং বাক্যগঠনে তার প্রভাব নির্ণয়

ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফল:

ভাষা শেখার সময়, মানবশিশু কথা বলতে পারার আগেই কথা বুঝতে পারে। খুব ব্যতিক্রমী কোনো শব্দ বা বাক্যাংশের কথা বাদ দিলে, শিশু যতক্ষণ না তার চারপাশের বড়োদের বলা শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্যের অর্থ বুঝতে শেখে, ততক্ষণ সে অর্থপূর্ণভাবে শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার করতে পারে না। বাচ্চাদের প্রথমদিকের আধো বুলির মধ্যে তাই বিচ্ছিন্নভাবে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ উঠে এলেও, তারা যে আসলে গোটা একটি ভাবকেই প্রকাশ করতে চাইছে, তা বোঝা যায়। যেমন— 'খাওয়া না', 'খেলা দাও', 'ধরব' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ আসলে 'আমি এখন খাব না', 'এখন আমায় খেলনাটা দাও' কিংবা 'আমি পাখিটা ধরতে চাই' ইত্যাদি বাক্যের পরিপূরক হিসেবেই সে ব্যবহার

করতে থাকে। অর্থাৎ, বড়োদের কথা বলার ধরন থেকে সে ততক্ষণে আস্ত এক-একটি ভাবকে কীভাবে প্রকাশ করতে হয়, সেই ধারণা পেয়েছে, তবেই সে অসম্পূর্ণ শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশ প্রয়োগ করে সেই ধারণাটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। যে ভাষা শিশুটি শিখবে, সেই ভাষা পরিবেশের সংস্পর্শে আসাটা তার শেখার প্রথম শর্ত। আর সেইসঙ্গে, অতি অবশ্যই, ভাষা পরিবেশ থেকে সে যেসব বস্তু, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে শুনছে, সেগুলি তার অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা পড়াটাও জরুরি। কোনো বস্তু বা বিষয় তার দেখাশোনার জগতে যদি ধরা না পড়ে, তাহলে সেই বস্তু বা বিষয় সম্পর্কিত কথা তার সামনে যতবারই উচ্চারণ করা হোক না কেন, শিশুটি কখনওই সেই বস্তু বা বিষয়কে সার্থকভাবে নিজের বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে না। কারণ সেই সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই তৈরি হয়নি। যেমন, একটি বাচ্চার সামনে ‘গাড়ি’ শব্দটি যতবারই উচ্চারণ করা হোক না কেন, যতক্ষণ না কোনো একটি খেলনা গাড়ির মাধ্যমে হোক, কিংবা তার চারপাশের বড়োদের অঙ্গভঙ্গি, অথবা একেবারে সত্যি গাড়ি দেখিয়ে তার সামনে ‘গাড়ি’ শব্দটি উচ্চারণ করা হচ্ছে, ততক্ষণ কিন্তু সে ‘গাড়ি’ শব্দটি শুনেও, শব্দটির প্রয়োগ ঘটাতে পারবে না। আসলে যে-কোনো শব্দের যে ধ্বনিগত রূপ, তা যতক্ষণ না তার কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গ বহন করে আনতে না পারছে, ততক্ষণ সেই ধ্বনিগত রূপ তার কাছে এতটাই বিমূর্ত যে, শিশু সেই ধ্বনিগুচ্ছের অর্থ অনুধাবন করতে পারে না, তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ করতেও অক্ষম হয়। অর্থাৎ, শব্দের অর্থ তার কাছে অনুষঙ্গবাহী হতে হবে।

একথা ঠিক যে, পরিস্থিতি বুঝে যথাস্থানে যথার্থ ধ্বনিগুচ্ছ বা শব্দগুচ্ছ ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারাটা শিশুর ভাষাজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট বড়ো প্রমাণ। কিন্তু, মজার কথা হল, এর উলটোটা সত্যি নয়। অর্থাৎ, শিশুটি যদি কথা বলে উঠতে না পারে, তার মানেই ধরে নেওয়া যায় না যে, শিশুটির ভাষাজ্ঞান হয়নি। কথা বলার ক্ষেত্রে শারীরিক কোনো সমস্যা জন্মাবধি থাকলে, বা বাক্‌বিকারের শিকার হলে বহুক্ষেত্রেই শিশুর কথা বলার ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু শ্রবণশক্তি অব্যাহত থাকলে সেই শিশু তার চারপাশের সব ভাষিক প্রকাশভঙ্গিকেই একটু একটু করে চিনে নিতে পারে, বুঝতে পারে, অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সাড়াও দেয়। তবে, সেই বাগ্‌ভঙ্গি শুনে শিখে নিলেও তা নিজে প্রকাশ করে উঠতে পারে না। সেরিব্রাল পলসি বা অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে বাক্‌প্রয়াসে এই ধরনের সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, নিজে কথা বলতে পারা বা বাক্‌প্রয়াস ছাড়াও ভাষাশিক্ষা সম্ভব, কিন্তু কথা বুঝতে না পারলে, ভাষাশিক্ষা সম্ভব নয়। শব্দ বা বাক্যের অর্থ বোঝার মাধ্যমে যদি শিশুর ভাষাশিক্ষার অবকাশ তৈরি হয়, তাহলে সেইসব শিশু খুব অল্প ক্ষেত্রেই ক্বচিৎ কদাচিৎ বাক্‌প্রয়াসে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও, কথা বলার অনেক আগেই যে শিশুর ভাষাজ্ঞান তৈরি হতে থাকে, তার কার্যকর প্রমাণও পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রেই অভিভাবকরা লক্ষ করেছেন যে, শিশুরা নিজে যে বাক্যগুচ্ছ, ধ্বনিগুচ্ছ বা শব্দগুচ্ছ বলছে, তার চেয়ে অনেক জটিল বাক্যের উত্তরে তারা সাড়া দিতে পারছে। এমনকি, শুধু অভিভাবকদের স্মৃতিনির্ভর মতামতের ওপরে ভিত্তি না করে, শিশুদের কথা বলা এবং কথা বোঝার পরস্পর তুলনা প্রতিষ্ঠার নিরিখে হওয়া গবেষণালব্ধ ফলাফলভিত্তিক প্রমাণও এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। এই গবেষণাগুলির পর্যবেক্ষণজাত সিদ্ধান্ত এই মতকেই প্রতিষ্ঠা করে যে, কথা বলার স্তরের তুলনায় কথা বোঝার স্তর আগে আসে।

দ্বিতীয় পর্যায়:

গবেষণাকর্মের অগ্রগতির এই পর্যায়টি এগিয়েছে শিশুর প্রথম ভাষা অর্জনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সমান্তরালে চলতে-থাকা প্রাতিষ্ঠানিক ভাষাশিক্ষার পদ্ধতিটির সমীক্ষার মাধ্যমে। গবেষণার পূর্ববর্তী পর্যায়ে দেখিয়েছিলাম কীভাবে শিশুর ভাষাশিক্ষার জন্য নির্ধারিত প্রাইমারগুলি শিশুর প্রাক্-প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা অর্জনের কজ-এফেক্ট লার্নিং চিহ্নিত করে এবং সেই সঙ্গে কিছু স্কিল বা দক্ষতা বুনে দিতে চায় শিক্ষার্থীর মধ্যে। এই পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় ইভ্যালুয়েশন। এই পর্যায়ে আমাদের গবেষণার পদ্ধতি ও ফলাফল ছিল নিম্নরূপ—

- কারিকুলাম থেকে সিলেবাস হয়ে পাঠ্যবইতে যেভাবে একটি ভাষাশিক্ষার কোর্স ডিজাইন করা হয়, তার কিছু নির্দিষ্ট এক্সপেক্টেড লার্নিং আউটকাম থাকে। শিক্ষার্থীর এই লার্নিং আউটকাম মাপার পদ্ধতিই হল ইভ্যালুয়েশন। আমরা যাচিয়ে দেখেছি, ইভ্যালুয়েশনের মধ্যে রয়েছে আদতে অ্যাপ্লিকেশন বা প্রয়োগ। কারণ, শিক্ষার্থী যা শিখল, কিছু বিশেষ অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে সেই শেখা (যার কিছুটা অ্যাকুইজিশন, কিছুটা লার্নিং) বিষয়গুলি প্রয়োগ করে দেখাতে বলা হয়। যার মাধ্যমে গবেষক কিছু নির্দিষ্ট ইন্ডিকেটর বা সূচক চিহ্নিত করে বুঝেছেন, তিনি যে স্কিল বা দক্ষতাগুলি যাচিয়ে নিতে চাইছিলেন, শিক্ষার্থীর লার্নিং আউটকাম তার নিরিখে ঠিক কোথায় অবস্থান করছে।

- প্রাতিষ্ঠানিক ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটি রি-ইনফোর্সমেন্টের দিক সবসময়েই রাখা জরুরি হয়। এক্ষেত্রে গবেষকের নির্ধারিত সূচক বা ইন্ডিকেটরে যেখানে দেখা গেছে, কোনো শিক্ষার্থী এক্সপেক্টেড লার্নিং আউটকাম-এ পৌঁছোতে পারেনি, সেক্ষেত্রে আরও একবার তাকে সেই ইনপুট দেওয়া হয়েছে।

- এই কথা মাথায় রেখে বর্তমানে এ-রাজ্যের ভাষাশিক্ষায় চালু করা হয়েছে সিসিই বা কনটিনিউয়াস কমপ্রিহেনসিভ ইভ্যালুয়েশন পদ্ধতি। 'কনটিনিউয়াস' কারণ এখানে প্রতিমুহূর্তে মেপে চলা হচ্ছে তার ভাষা অর্জনে ঠিক কী কী দক্ষতাগত পরিবর্তন ধরা পড়ছে। গবেষক এখানে দেখেছেনএকটি নির্দিষ্ট ভাষাশিক্ষার ক্লাসের আগে এবং পরে ক্লাসে প্রদত্ত ইনপুটের ওপরে ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর ভাষিক দক্ষতার কোনো পরিবর্তন হল কি না।

- এই পদ্ধতিএকই সঙ্গে ছিল 'কমপ্রিহেনসিভ'। কারণ, ভাষাশিক্ষা একটি বহুমাত্রিক জটিল পদ্ধতি। এখানে একসঙ্গে শব্দভাণ্ডার, বাক্যের গঠন, হ্যাঁ-না-প্রশ্ন-বিস্ময় প্রভৃতি অভিব্যক্তির ভাষাগত প্রয়োগ, একটি বিষয় বা ভাবকে গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারার ক্ষমতা বিভিন্ন বিষয়কে শিখতে হয়। ফলে, গবেষক প্রতিমুহূর্তে খেয়াল রেখেছেন, কোনো একটি ইনপুট শিক্ষার্থীকে ভাষাশিক্ষার সার্বিক দিকটিকে ধরতে পারছে কি না এবং সেই ইনপুট শিক্ষার্থীকে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতায় উন্নীত করতে পারছে কি না।

- নীচু ক্লাসের ক্ষেত্রে এই সিসিই করার সময়ে গবেষক লক্ষ রেখেছেন, ভাষার ফর্মেশন-এর দিকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়, সিসিই-র দুটি অভিমুখ রয়েছে। একটি ফর্মেটিভ, একটি সামেটিভ। অর্থাৎ, কিছুদূর

পর্যন্ত প্রদত্ত ইনপুটের মাধ্যমে ভাষার একটি নির্দিষ্ট ফর্মেশন তৈরি করার চেষ্টা থাকবে এবং পরবর্তী ধাপে গোটা ফর্মেশনটিকে যাচাই করে নিতে হবে একটি সামেটিভ পদ্ধতির মাধ্যমে। গবেষক সমীক্ষার অন্তর্নিহিত এই ফলাফলটি প্রাতিষ্ঠানিক সিসিসি-এর সঙ্গে যাচাই করে দেখেছেন।

- বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর ভাষা অর্জনের স্বাভাবিক পদ্ধতি ক্রমশ ফিকে হয়ে এসেছে, চলে গেছে তার 'ইনেটনেস'। ফলে প্রথম ভাষাও একটা সময়ে আর শিক্ষার্থীর অর্জনের বিষয় হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে তার শিখনের বিষয়। সেজন্যই, যে-কোনো প্রাইমার আর শিশুর ভাষা অর্জনের সঙ্গে শুধু সংগতিপূর্ণ হলেই চলবে না, কাঙ্ক্ষিত দক্ষতার কথা মাথায় রেখে প্রাইমারকে সুগঠিত হতে হবে। গবেষক এখানেই প্রাইমারগুলির একটি 'ভ্যালিডিটি চেক'-ও করেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ হয়েছে গবেষণার ষষ্ঠ অধ্যায়ে।
- এই গঠনের পথে প্রথমে এসেছে কারিকুলাম, তাকে নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া হয়েছে সিলেবাসের মাধ্যমে, সিলেবাসের একটি নির্দিষ্ট পরিমাপযোগ্য লার্নিং আউটকাম আছে এবং সেই আউটকামের কথা মাথায় রেখে কিছু ভাষিক দক্ষতার সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে টেক্সটবই। অবশ্যই সেখানে টেক্সট-এর পাশাপাশি ছিল কিছু অ্যাক্টিভিটি, যার মাধ্যমে গবেষক লার্নিং আউটকাম পরিমাপ।

আমরা লার্নিং আউটকাম মাপার পদ্ধতি বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখেছি, এই পদ্ধতিগুলি কাঙ্ক্ষিত আউটকামের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারছে কি না এবং সেক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষক ঠিক বয়সভেদে শিক্ষার্থীদের লার্নিং আউটকাম পরিমাপের কোন্ কোন্ সূচকের দিকে জোর দিচ্ছেন।

তৃতীয় পর্যায়:

গবেষণাকর্মের অগ্রগতির এই পর্যায়ে আমি কাজ করেছি ভাষা অর্জনের 'টেলিগ্রাফিক স্তর' এবং তার দ্বিশাব্দিক ও ত্রিশাব্দিক উচ্চারণ নিয়ে। শিশু যাঁর বা যাঁদের সঙ্গে ভাষিক সংযোগ স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠছে, তিনি বা তাঁরা শিশুটির কথা বুঝতে না পারলে সে ক্রমশ আগের যোগাযোগ পদ্ধতিকে বাতিল করে তুলনামূলক জটিল যোগাযোগ পদ্ধতি রপ্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু, এই স্তর পরিবর্তন খুব একটা দ্রুত হয় না। একশাব্দিক স্তর থেকে দ্বিশাব্দিক স্তরে যেতে শিশুর বেশ খানিকটা সময় লাগে। তার একটা বড়ো কারণ, একশাব্দিক প্রয়োগের মাধ্যমে শিশু যখন নানান বিষয় বুঝিয়ে ওঠার চেষ্টা করে, তখন তার সেই পারঙ্গমতার সঙ্গে বোধগম্যতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু সে যখন দ্বিশাব্দিক স্তরে যাবে, তখন তার বোধগম্যতার একটা সাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে সে পরবর্তী এই স্তরটিতে পা রাখতে পারে না। এই পর্যায়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ যেভাবে এগিয়েছে—

- কোনো একটি বিষয়, ভাব বা বস্তুকে শিশুরা যখন একটি ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ দিয়ে চিহ্নিত করে, তখন সেই উচ্চারণের প্রক্রিয়াটি সে শেখে মূলত অনুকরণের মাধ্যমে। তার চারপাশের পরিণতবয়স্ক ভাষীরা

ওই পরিস্থিতিতে ওই বিষয়, ভাব বা বস্তুকে যেভাবে প্রকাশ করছেন, সেই প্রকাশভঙ্গিটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- চারপাশে শোনা বিভিন্ন ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের মধ্যে থেকে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছগুলি শিশুর কাছে মুখ্য হয়ে ধরা পড়ে, কিংবা সবচেয়ে বেশিবার যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছগুলি সে শুনতে পায়, সেই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছগুলিকেই সে তার হলোফ্রাস্টিক এক্সপ্রেশনের মূল উপাদান হিসেবে বেছে নেয়।

- এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে তার বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ নেই, বরং রয়েছে তার চারপাশের পরিবেশ এবং অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। কিন্তু যে মুহূর্তে শিশু এই একশাব্দিক প্রকাশগত কৌশলটির সীমাবদ্ধতার জায়গাগুলি ধরতে পারে, যখন তার মনের ভাব বোঝানোর জন্য আর এই হলোফ্রাস্টিক এক্সপ্রেশনগুলি যথেষ্ট হয়ে উঠতে পারে না, তখনই তার মধ্যে একটা অভাববোধ তৈরি হয়।

- নিজেকে স্পষ্ট করে বোঝানোর এই তাড়নার সঙ্গে শিশুর বোধ ও জ্ঞানমূলক বিকাশের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। শিশুর দাবিদাওয়া তার চারপাশের মানুষ বুঝতে না পারলে প্রাথমিকভাবে সে মরিয়া হয়ে উঠবে, তারপর একসময় বিরক্ত হবে। কিন্তু আরও পরে, যখন তার ভাষাগত বোধের আর-একটু পরিণতির পর্যায় এসেছে, একমাত্র তখনই সে এই ধরনের একশাব্দিক এক্সপ্রেশনের বিকল্প রাস্তা খুঁজে পাবে।

- শিশুর ভাষাগত অভাববোধ তৈরি হওয়া আর এই অভাববোধ থেকে তার বিকল্প পথ বেছে নেওয়ার মধ্যে সময়ের বেশ কিছুটা তফাত থাকেই। সাধারণভাবে দেখা গেছে, অন্তত দু-বছর বয়স না হলে শিশুরা দ্বিশাব্দিক এবং ত্রিশাব্দিক এক্সপ্রেশনের স্তরে যেতে পারে না।

- শিশুদের কয়েকটি দ্বিশাব্দিক প্রকাশভঙ্গিকে তুলে ধরার জন্য রেকর্ডিং-এ প্রাপ্ত নমুনা ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে দেখানো হয়েছে ওই একই কথা পরিণতবয়স্ক ভাষীরা বললে কীভাবে বলতেন। শিশুদের বলা শব্দগুলির মধ্যে যে শব্দার্থগত সম্পর্ক নিহিত রয়েছে, তা শনাক্ত করা গেলেই তাদের কথার সম্ভাব্য আদর্শ প্রকাশ (পরিণতবয়স্ক ভাষীর ক্ষেত্রে) কী হতে পারত, তা দেখানো সম্ভব হয়।

চতুর্থ পর্যায়:

গবেষণাকর্মের অগ্রগতির এই পর্যায়ে আমি কাজ করেছি ভাষা অর্জনের ঠিক পূর্ববর্তী পর্যায়ে শিশুর ব্যবহৃত 'সিগন্যালিং' ক্ষেত্রটি নিয়ে। এই 'সিগন্যালিং' পদ্ধতির মধ্যে শিশুর যাবতীয় প্রতিক্রিয়া, যা কোনো না কোনোভাবে তার শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ও আবেগের 'বার্তা' হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে, সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে আমাদের গবেষণা যেভাবে এগিয়েছে—

- জন্ম থেকে সাত মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে কান্না বিষয়টিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল হিসেবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এখানে শিশুদের কান্না সংক্রান্ত যে তথ্যগুলি গৃহীত হয়েছে, তা মূলত কলকাতার রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের মনস্তত্ত্ব বিভাগের ক্লিনিকাল সাইকোলজির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ও সংরক্ষিত

তথ্য। কিছু ক্ষেত্রে গবেষক সেই তথ্য পুনর্বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষ গবেষণাধর্মী জার্নালে প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে সেগুলি মিলিয়ে নিয়েছেন। তথ্যের যান্ত্রিক বিশ্লেষণের সময় প্রতি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষজ্ঞের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য যন্ত্রস্থ করা হয়েছে। যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ গবেষকের নিজের নয়।

- সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে, বাচ্চাদের কান্না সাধারণত কতক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে, সেই সময়ের বিচারে পরস্পরের তুলনায় অনেকটাই পৃথক। কখনও তাদের কান্না খুব অল্পসময় থাকে, যাকে 'ক্ষণস্থায়ী ক্রন্দন' (short cries) বলা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কান্নার (এখানে 'কান্না' বলতে কাঁদার গোটা প্রক্রিয়াটিকে বোঝানো হচ্ছে না, বরং এক-একবার কান্নাসূচক এক-একটি চিৎকারকেই 'কান্না' বলে বোঝানো হচ্ছে) স্থায়িত্ব প্রায় ১০০ মিলিসেকেন্ড। যদিও, বেশিরভাগ সংগৃহীত তথ্যের সাধারণীকরণ করলে দেখা যাবে, শিশুর কান্না গড়ে ৩০০-৬০০ মিলিসেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বেশ বেশিক্ষণ ধরে কাঁদলে, তার সময়কাল হতে পারে ২ সেকেন্ড, এমনকি কখনো-কখনো ৫.৫ সেকেন্ড (গবেষক কর্তৃক পর্যবেক্ষণের অধীন সর্বাধিক সময় পর্যন্ত কান্না) পর্যন্তও! ভাষার অধীন ধ্বনিসমূহের মধ্যে যে তাৎপর্য নিহিত থাকে, কান্নার মধ্যে থেকেও তেমন তাৎপর্য বিচার করার উদ্দেশ্যে যেভাবে কান্নার ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে, তাতে কিন্তু কান্নার সময়কাল মাপা বা কোন্ কান্নার সময় শিশুর শ্বাসতন্ত্রের ওপরে তার কী কী লক্ষণ ফুটে উঠছে, তা বিচার্য নয়। বরং একই কান্নার পরম্পরার (অর্থাৎ গোটা একটি ক্রন্দন প্রক্রিয়ার) মধ্যে সংঘটিত কান্নাগুলি কীভাবে পরস্পর সম্পর্কিত হতে পারে, সেটিই অন্বিষ্ট।
- এক-একটি ক্রন্দন প্রক্রিয়াকে আমরা অনেকগুলি কান্নার সমন্বয় বা পরম্পরা হিসেবে দেখতে চাইলে, প্রথমেই এই গোটা প্রক্রিয়াটিকে একাধিক ছন্দোময় বিন্যাস (rhythmic patterns) বা ক্রন্দনবৃত্তের (cry cycle) সমষ্টি হিসেবে দেখতে হবে। এক-একটি ক্রন্দনবৃত্তে যে-কটি কান্নার সমন্বয় পাওয়া যাচ্ছে, তার ধরন এবং বিন্যাস দিয়ে কান্নার সঙ্গে জড়িত শিশুর এক-একটি আবেগ কীভাবে পৃথক হয়ে যাচ্ছে, তা নির্দেশ করা হয়েছে।

পঞ্চম পর্যায়:

গবেষণাকর্মের অগ্রগতির এই পর্যায়ে আমি কাজ করেছি বিদ্যালয় স্তরে প্রথম ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষার উপস্থিতি ও তার প্রভাব নিয়ে। বহু ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার সময় প্রথম ভাষা নিজেই বেশ কিছু বাধা তৈরি করতে পারে, সেই পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষার এক্সপোজার শিক্ষার্থীকে প্রথম ভাষার ক্ষেত্রে ঠিক কীরকম ভাষিক পরিস্থিতিতে ফেলে, সেই বিষয়টিও দেখা হয়েছে। এই পর্যায়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ যেভাবে এগিয়েছে—

- ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে লার্নিং আউটকাম বা শিখন সামর্থ্য নির্ধারণের পদ্ধতি এবং শিক্ষণের 'রুফ অ্যান্ড ফ্লোর' থিওরিকে প্রথম ভাষা শিক্ষা ও দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার নিরিখে নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে।

- গ্রামার-ট্রান্সলেশন মেথডে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কী কী অসুবিধা হতে পারে, সেগুলি দেখানো হয়েছে।
- এই মডেলের বদলে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে এককালে চালু হওয়া 'ইমারশন মডেল'টি কী, গ্রামার-ট্রান্সলেশন মডেলের চাইতে কেন সেটি তুলনামূলক বেশি গ্রহণযোগ্য এবং তার পরেও কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে খামতি রয়ে যাওয়ায় এই মডেলটিও ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হচ্ছে, সেই বিষয়গুলি দেখানো হয়েছে।
- ১৯৯৩ সালের যশপাল কমিটি রিপোর্টের তথ্য পেশ করে দেখানো হয়েছে, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কীভাবে ক্রমশ স্বশিক্ষণ এবং তার মাধ্যমে তৈরি হওয়া দক্ষতাগুলি বাড়ানোর দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে ('improving the quality of learning including the capability for life-long self-learning and skill formulation')।
- ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে কমিউনিকেটিভ পদ্ধতিটি কেন সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল, সেই দিকগুলি দেখানো হয়েছে।
- গতানুগতিক পদ্ধতিতে ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা এবং কমিউনিকেটিভ পদ্ধতিতে ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষার মধ্যে কী কী প্রয়োগগত এবং প্রভাবগত তফাত তৈরি হয়, দুটি ক্ষেত্রেই উদাহরণ দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- বিদ্যালয় স্তরে চালু থাকা প্রাইমার বইগুলিকে কীভাবে কমিউনিকেটিভ পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষার সহায়ক বা 'tool' হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তার নমুনা দেখানো হয়েছে প্রাইমার গ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করে এবং শ্রেণিকক্ষে তার সম্ভাব্য প্রয়োগ দেখানো হয়েছে।

ষষ্ঠ পর্যায়:

গবেষণাকর্মের অগ্রগতির এই পর্যায়ে আমি কাজ করেছি বিদ্যালয় স্তরে ব্যবহৃত প্রাইমারগুলির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও সেই সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষণ নিয়ে। বাংলায় উনিশ শতক থেকেই প্রাইমার রচনার ইতিহাস রয়েছে, কিন্তু সেই প্রাইমারের বিষয় এবং বিন্যাসে গোড়া থেকেই প্রচুর পরীক্ষানিরীক্ষা ও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে লেখা বিভিন্ন রকমের প্রাইমার নিয়ে এই পর্যায়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ যেভাবে এগিয়েছে—

- প্রাইমারগুলিতে বর্ণবিন্যাসের ধরন ও ক্রম কীভাবে এগোচ্ছে, তা তুলনামূলক আলোচনা করে দেখানো হয়েছে।
- মেয়েদের জন্য লেখা প্রাইমারের ওপরে আলাদা করে জোর দেওয়া হয়েছে, যেহেতু এইক্ষেত্রে প্রাইমারে বিশেষ কিছু বদল লক্ষ করা যায়।

- প্রাইমারের যে রিডার অংশ, সেই অংশে বিভিন্ন টেক্সট নির্বাচনের উদ্দেশ্যগুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং সেই অনুসারে টেক্সটগুলিকে নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে।
- মেয়েদের জন্য আলাদা করে লেখা প্রাইমারের ক্ষেত্রে রিডারের ধরন কীভাবে বদলাচ্ছে, তা আলাদা করে দেখিয়ে তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা সামাজিক প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- প্রাইমার ছাড়াও, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি ও বাংলা বর্ণবিন্যাস নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলিকে আলাদা করে মূল প্রাইমারগুলির পাশাপাশি রেখে বিচার করা হয়েছে, দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে উভয়ের মধ্যে কী কী যোগসূত্র বা সামঞ্জস্যের সূত্র রয়ে গেছে।

সপ্তম পর্যায়:

গবেষণাকর্মের অগ্রগতির এই পর্যায়ে আমার অন্বিষ্ট বিষয় হল মানব মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্নায়বিক রেসপন্স, যা ভাষার সঙ্গে জড়িত, তার রাসায়নিক পদ্ধতিটির সাপেক্ষে শিশুর ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক কাঠামো তৈরির প্রক্রিয়াটিকে বিচার করে দেখা। এই স্তরে আমার পর্যবেক্ষণ যেভাবে এগিয়েছে—

- মানবমস্তিষ্কের যে যে অংশগুলি ভাষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পারঙ্গমতার সঙ্গে জড়িত, সেগুলির গঠন, ক্রিয়াপদ্ধতি ও কার্যকারিতা ব্যাখ্যা।
- মানবমস্তিষ্কের যে অঞ্চলগুলি ভাষা অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেগুলির অবস্থান এবং ভাষা বলার ক্ষেত্রে ও ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে সেই ভাষা অঞ্চলগুলির ভূমিকা নির্দেশ করা।
- শিশুর জন্ম থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত সময়কাল ধরে মস্তিষ্কের ভাষিক সংযোগ অঞ্চলগুলি কীভাবে ক্রমশ পরিণত ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, তার প্রক্রিয়াটি চিহ্নিত করা।
- ভাষা বলার ক্ষেত্রে এবং বোঝার ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যা তৈরি হয়, যাকে অ্যাফেজিয়া বা বাক্‌বিকার বলা হয়, সেগুলির জন্য মস্তিষ্কের কোন্ অঞ্চল দায়ী তা চিহ্নিত করা।

গবেষণাকর্মটির একটি সামগ্রিক রূপরেখা ও তার প্রাপ্ত ফলাফলের একটি কাঠামো এখানে তুলে ধরা হল। বাংলাভাষী শিশুর ভাষা অর্জনের যে প্রক্রিয়াটিকে তুলে ধরা এবং তার সাপেক্ষে, প্রচলিত প্রাইমারগুলির পুনর্মূল্যায়ন করা আমার গবেষণার মুখ্য বিষয় ছিল, সেই বিষয়ে সরাসরি কোনো সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা বরং অত্যন্ত সরলরৈখিক হয়ে দাঁড়াবে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিসরলীকরণের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বরং বলা চলে, এই গবেষণা ভবিষ্যতে এই সংক্রান্ত একটি তথ্যভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। একটি সমীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ডকুমেন্টেশন বা নথিবদ্ধকরণ। বাংলা ভাষার মনোভাষাবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রটি কীভাবে চালিত হয়, তার কার্যপ্রণালীগত পরম্পরা ও বিন্যাসটি কেমন, সেই সন্ধানই রইল এই গবেষণার পাতায়।

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

আমার বই (দ্বিতীয় শ্রেণি). দ্বিতীয় সংস্করণ. কলকাতা. বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর. পশ্চিমবঙ্গ সরকার. ডিসেম্বর ২০১৪

আমার বই (প্রথম শ্রেণি). প্রথম সংস্করণ. কলকাতা. বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর. পশ্চিমবঙ্গ সরকার. ডিসেম্বর ২০১২

আশিস খাস্তগীর. *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ.* প্রথম সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. জানুয়ারি ২০০৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর. *বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ.* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি. কলকাতা. ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড. ১১ জুন ২০১৯

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর. *বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ.* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি. কলকাতা. ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড. ১১ জুন ২০১৯

কিশলয় (দ্বিতীয় শ্রেণি). নবপর্যায় পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ. পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১১

কিশলয় (দ্বিতীয় শ্রেণি). নবপর্যায় প্রথম সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ. মার্চ ২০০১

কিশলয় (প্রথম শ্রেণি). নবপর্যায় সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ. পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৩

কিশলয় (প্রথম শ্রেণি). সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ. ডিসেম্বর ২০০৯

মদনমোহন তর্কালঙ্কার. *শিশুশিক্ষা.* আশিস খাস্তগীর সম্পা. প্রথম আকাদেমি সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. জানুয়ারি ২০০৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. *সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগ.* শান্তিনিকেতন. বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ. মাঘ ১৪২৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. *সহজ পাঠ প্রথম ভাগ.* শান্তিনিকেতন. বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ. বৈশাখ ১৪২৪

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি)

Akmajian, Adrian & Deners, Richard A & Farmer, Ann K & Harnish Robert M. *Linguistics An Introduction to Language and Communication.* Cambridge. The MIT Press. Fifth Edition. 2001

Arbib, M & Conklin, E & Hill, J. *From Schema Theory to Language.* First Edition. New York. Oxford University Press. 1987

Bloom, L.M. 'Imitations in Language Development: If, When, and Why'. *Cognitive Psychology.* New York. Cambridge University Press. 1974.

Brooks, Nelson. *Language and Language Learning.* New York. Harcourt. 1960

Clark, Herbert and Eve Clark. *Language and Psychology: An Introduction to Psycholinguistics.* New York. Harcourt. 1977

Cooter, Robert B. & Reutzel, D. Ray. *Teaching Children to Read: The Teacher Makes the Difference.* Eighth Edition. New York. Pearson. 2019

Cowan, W M & Sudhof, T C & Stevens, C F & Davies, K (Ed.). *Synapses.* Baltimore. John Hopkins University Press. 2002

Cruttenden, Alan. *Language in Infancy & Childhood.* First Edition. Manchester. Manchester University University Press. 1979

de Villiers, J G. & de Villiers P A. *Language Acquisition.* Cambridge. Harvard University Press. Blackwell Publishing. 1978

Descartes, Rene´. Translated by Veitch, John. *Discourse on the Method of Rightly Conducting the Reason, and Seeking Truth in the Sciences.* First Edition, Chicago. The Open Court Publishing Company. 1903

Fried, Vilem. *Prague School of Linguistics and Language Teaching.* United Kingdom. Oxford University Press. 1972

Goodman, J C & Nusbaum, H C (Ed.). *The development of Speech Perception: Transitions from Speech Sounds to spoken words.* Cambridge. MIT Press. 1994

Gottieb, G. *Individual Development and evolution: The genesis of Novel Behaviour.* United Kingdom. Oxford university Press. 1992

Greenfield, P M. & Smith, J H. *The Structure of Communication in early Language & Development.* New York. Academic Press. 1976

Hawkes, Terence. *Structuralism & Semiotics.* California. University of California Press. January 1977

Henderson, Eugénie J A (ed.). *The indispensable foundation: a selection from the writings of Henry Sweet.* United Kingdom. Oxford University Press. 1971

Hubbard, Peter & Jones, Hywel & Wheeler, Rod & Thornton, Barbara. *A Training Course for Tefl.* First Edition. New York. Oxford University Press. 1983

Jakobson, Roman. *My Futurist Years* New York. Marsilio Publishers. 1997

Jones & Hubbard & Wheeler. *A Training Course for TEFL.* UNITED KINGDOM. Oxford University Press. 1983

Lenneberg, Eric H. & Rebelsky, Freda G. & Nichols, Irene A. 'The Vocalizations of Infants Born to Deaf and to Hearing Process'. *Human Development.* Vol. 8. No. 1. 1965

Lenneberg, Eric H. *Biologial Foundation of Language.* First Corrected Printing. USA. John Wiley & Sons. 1967

Lieberman, Alicia F. & Horn, Patricia V. *Repairing the Effects of Stress and Trauma on early Attachment.* New York. Guilford Press. 2011

Lindberg, David C. *The Beginnings of Western Science.* United States. Chicago University Press. 1993

Malcom Macmillan. *An Odd Kind of Fame: Stories of Phineas Gage*. Unites States. MIT Press. 2000

Mix, Kelly S & Huttenlocher, Janellen & Levine, Susan Cohen. *Development in Infancy and Early Childhood.* New York. Oxford University Press. 2002

Nekula, M. *Prague Structuralism: Methodological Fundamentals*. Heidelberg. Winter Publications. 2003

O' Grady, W. *Principles of Grammar Learning.* Chicago. University of Chicago Press. 1987

Ott, Walter. *Locke's Philosophy of Language*. First Edition. United Kingdom. Cambridge University Press. 2004

Palermo, David S. *Psychology of Language*. USA. Pearson Scott Foresman and Co. 1978

Piaget, Jean & Inhelder, Barbel. *The Psychology of the Child.* First Print. New York. Basic Books. 1966

Putnam, Hilary. *Mind Language & Reality*: *Philosophical Papers Volume 2.* United Kingdom. Cambridge University Press. 1975

Rivers, M Wilga. *Teaching Foreign Language Skills*. Chicago. Chicago University Press. 1968

Rivers, Wilga M. *The Psychologist and the Foreign Language Teacher.* Eighth Edition Reprint. USA. University of Chicago Press. 1964

Robins, R H. *A Short History of Linguistics*. Fourth Edition. London & New York. Longman. 1997

Saussure, Ferdinand De. 'General Principles: Nature of the Linguistic Sign'. *Course in General Linguistics*, Ed. by Charles Bally & Albert Sechehaye, Tr. by Wade Baskin, New York, Philosophical Library. 2011

Steiner, Peter (ed.). *The Prague School: Selected Writings, 1929-1946*. USA. University of Texas Press. 1982

Stern, H H. *Fundamental Concepts of Language Teaching*. UNITED KINGDOM. Oxford University Press. 1983

Toman, Jindrich. *The Magic of a Common Language: Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy, and the Prague Linguistic Circle*. Cambridge. The MIT Press. 1995

Watkins, Alan. *Coherence: The Secret Science of Brilliant Leadership.* United Kingdom. KoganPage. 2014

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা)

আশিস খাস্তগীর. *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ.* প্রথম সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. জানুয়ারি ২০০৬

উমা দেবী. *বালিকা-জীবন.* দ্বিতীয় সংস্করণ. কলকাতা. শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস. ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

তপোধীর ভট্টাচার্য. *সময়ের প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য.* আগরতলা. জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী. জানুয়ারি ২০০৫

মদনমোহন তর্কালঙ্কার. *শিশুশিক্ষা.* আশিস খাস্তগীর সম্পা. প্রথম আকাদেমি সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. জানুয়ারি ২০০৯

মাইকেল মধুসূদন দত্ত. *মধুসূদন রচনাবলী.* ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পা. কলকাতা. সাহিত্য সংসদ. নভেম্বর ১৯৫৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. *শিক্ষা.* শান্তিনিকেতন. বিশ্বভারতী. ভাদ্র ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

রামেশ্বর শ. *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা.* তৃতীয় অখণ্ড সংস্করণ. কলকাতা. পুস্তক বিপণি. ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

শিশিরকুমার দাশ. *ভাষা জিজ্ঞাসা.* তৃতীয় সংস্করণ. কলকাতা. প্যাপিরাস. ১লা বৈশাখ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ

সহায়ক প্রবন্ধপঞ্জি

প্রবন্ধ (বইয়ে প্রকাশিত)

Cowan, W M & Kandel, E R. 'A Brief History of Synapses and Synaptic Transmission'. In: Cowan, W M & Sudhof, T C & Stevens, C F & Davies, K (Ed.). *Synapses.* Baltimore. John Hopkins University Press. 2002

Durand, Jacques. & Prince, Typhanie. 'Phonological Markedness, acquisition and Language Pathology: What is Left of The Jakobsonioan Legacy?'. *Neuropsycholinguistic Perspectives on Language Cognition.* CRC Press. 2015

Kuhl, P K. Perception, 'Cognition and the Ontogenetic and Phylogenic Emergence of Human Speech'. In: S, Brauth & W, hall & R, dooling (Ed.). *Plasticity of Development.* Cambridge. Bradford Books. 1991

Lieberman, Alicia F. & Horn, Patricia V. 'Psychotherapy with Infants and Young Children'. *Repairing the Effects of Stress and Trauma on early Attachment.* New York. Guilford Press. 2008

Meichenbaum, Donald & Goodman, Sheryl. 'Clinical Use of Private Speech and Critical Questions About Its Study in Natural Settings'. *The Development of Self-Regulation Through Private Speech.* First Edition. New York. John Wiley & Sons. 1979

Newsome, M & Jusczyk, P W. 'Do Infants use Stress as a Cue?'. In: MacLaughlin, D & Mcewen, S (Ed.). *Proceedings of the 19th Annual boston University Conference on Language Development.* Vol. 2. Somerville. Cascadilla Press. 1995

Swanson, N & Swanson, L W. Preface. In: Cajal, S R Y (Ed.). *Histology of the Nervous System of Man and Vertebrates. Vol. 1.* UNITED KINGDOM. Oxford University Press. 1995

Yampol'skaya, Tonkova. 'Development of Speech Intonation in Infants During the First Two Years of Life'. *Studies on Language Development of Children.* Ferguson, C.A. & Slobin, D. I. (Eds.) 1973

প্রবন্ধ (পত্রিকায় প্রকাশিত)

Ambros, V. 'Prague Linguistic Circle in English: Semantic Shifts in Selected Texts and Their Consequences'. *Theatralia.* Czechia. Masaryk University Press. 2014

Bellugi, Ursula & Brown, Roger. 'The Acquisition of Language: Report of the Fourth Conference Sponsored by the Committee on Intellective Process Research of the Social

Benedict, H. 'Early Lexical Development: Comprehension & Production'. *Journal of Child language, 6.* Cambridge University Press. 1979

Bloom, L. 'Structure and Variation in Child Language'. *Monographs of the Society for Research in Child Development.* Vol. 40. No. 2. United States. Blackwell Publishing. 1973

Clark, H H. 'The Language as Fixed Effect Fallacy: A Critique of Language Statistics in Psychological Research'. *Jouranal of Verbal Learning & Verbal Behaviour.* Vol. 12. Academic Press. 1973

Cowie, Fiona. 'Innateness & Language'. *The Stanford Encyclopaedia of Philosophy.* Fall 2017 Edition. USA. Stanford University Press

Gertrude, Moskowitz. 'Interaction Analysis: A New Modern Language for Supervisors'. *Foreign Language Annals.* Vol. 5. Issue 2. American Council on the Teaching of Foreign Languages. 1971

Lenneberg, Eric H. & Rebelsky, Freda G. & Nichols, Irene A. 'The Vocalizations of Infants Born to Deaf and to Hearing Process'. *Human Development*. Vol. 8. No. 1. 1965

Moskowitz, B A. 'The Acquisition of Language'. *Scientific American.* Vol. 239, No. 5. Scientific American: A Division of Nature America. 1978

Raichle, M E. 'Visualizing the Mind'. *Scientific American*. USA. Vol 270. Issue 4. 1994

Sachs, Jacqueline & Truswell, Lynn. 'Comprehension of Two-word Instructions by Children in the One-word Stage'. *Journal of Child Language*. United Kingdom. Cambridge University Press. 1978

'Science Research Council'. *Monographs of the Society for Research in Child Development*. 92, Vol 29, No. 1. Indiana. Child Development Publication. 1964

Stark, Rachel E. & Rose, Susan N. & McLagen Margaret. 'Features of Infant Sounds: The First Eight weeks of Life'. *Journal Of Child Language*. Vol. 2. Issue 2. United Kingdom. Cambridge University Press. 1975

Swanson, N & Swanson, L W. Preface. In: Cajal, S R Y (Ed.). *Histology of the Nervous System of Man and Vertebrates. Vol. 1.* United Kingdom. Oxford University Press. 1995

Velten, H V. 'The Growth of Phonemic and Lexical Patterns in Infant Language'. *Language.* Vol. 19, No. 4. Linguistic Society of America. 1943

অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম

Ernst Frideryk Konrad Koerner. ***Ferdinand De Saussure*** *origin and development of His Linguistic Theory in Western Studies of Language : A Critical Evaluation of The Evolution of Saussurean Principles and Their Relevance to Contemporary Linguistic Theories* (A Dissertation Submitted in Partial Fulfilment of the

Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy in General Linguistics in the Department of Modern Languages). December 1971. Simon Fraser University

সেমিনার প্রকাশনা

Newsome, M & Jusczyk, P W. 'Do Infants use Stress as a Cue?'. In: MacLaughlin, D & Mcewen, S (Ed.). *Proceedings of the 19th Annual boston University Conference on Language Development*. Vol. 2. Somerville. Cascadilla Press. 1995

বাংলা পত্রিকা

তত্ত্ববোধিনী, চৈত্র, ১৮০২, ২য় ভাগ

পরিচারিকা, চৈত্র, ১২৮৬, ১১ সংখ্যা

শব্দসংক্ষেপ ও মুণ্ডমাল পরিভাষার সারণি

1, 2, 3

first, second, third person

2so

second person singular object agreement

2ss

second person singular subject agreement

3so

third person singular object agreement

3ss

third person singular subject agreement

A

agent; adjective

ABIL

ability

ABL

ablative

ABS

absolute, absolutive

ACC, Acc

accusative, operator of acceptability

ADJ

adjective; adjunct

ADV, Adv

adverb

Agr

agreement

AgrS

subject–verb agreement

AmE

American English

ANIM

animate

ANTIPASS

antipassive

AP

adverbial phrase

ASL

American Sign Language

ASP

aspect

AUH

actor–undergoer hierarchy

AUX

auxiliary

AVM

attribute-value matrix

BA

bare argument

BAE

bare argument ellipsis

BEN

Beneficiary

BNC

British National Corpus

BrE

British English

BSL

British Sign Language

C

consonant; complementizer

C1, C2, etc.

noun class 1, 2, etc.

CAT

syntactic category

CCM

Constituent-Context Model

CD

cognitive default

CG

Cognitive Grammar

CL

class, Cognitive Linguistics

CN

count noun

CNJ

conjunction

COMP

Complement

COMPL

completive

Con

component that defines the set of universal violable constraints

COND

conditional

Conj

conjunction

CONN

connective

CONTR

contrastive

COP

copula

COREF

coreference

CORR

correlative

CP

complementizer phrase

CPI

effortful processing

CS

conceptual structure

CSLI

Center for the Study of Language and Information

D

determiner; dependency

DAT, Dat

dative

DECL

declarative

DEF

definite

DEM, Dem

demonstrative

DET

determiner

DG

dependency grammar

DI

degree of intention

DO

direct object

DOP

Data-Oriented Parsing

DS

Default Semantics

DU

Derivational Uniformity

DUP

Duplicative

ECG

Embodied Construction Grammar

epf

epistemic possibility future

ERG

ergative

Eval

component that selects an optimal output from the set of alternative candidates

F

feminine; Finite

f

form pole of a construction

FACT

factual mood

FAM

familiar

FDEF

type of faithfulness constraint

FDG

Functional Discourse Grammar

FDR

type of faithfulness constraint

FE

frame element

FEM

Feminine

FG

Functional Grammar

FGT

Formal Generative Typology

fif

fully inflected form

FL

faculty of language

FN

FrameNet

FocP

Focus projection

fp

futurative progressive

FPL

type of faithfulness constraint

fr

frame

***FUNCTN**

a core markedness constraint

FUT

future

GAPP

Golden Age of Pure Pragmatics

GB

Government-Binding Theory

GCat

morphological constituents

GCI

generalized conversational implicature

GEN, Gen

genitive

Gen

component where output candidate parses are generated

GF

grammatical function

GPSG

Generalized Phrase Structure Grammar

H

high tone

HAB

habitual

HPSG

Head-Driven Phrase Structure Grammar

I

inflection

IF

illocutionary force

IFG

Incremental Functional Grammar

IL

interpersonal level

IMP

imperative

IMPF

imperfective aspect

IND

indicative mood

INDEF

indefinite

INDIC

indicative mood

INF

infinitive

INFER

inferential

Infl

inflection

INSTR

instrument(al)

IO

indirect object

IP

inflectional phrase

IRR

irrealis

IS

information structure, inferential system

isa

basic relation of classification

IU

Interface Uniformity

JSL

Japanese Sign Language

K

case

L

low tone; loser

LAD

language acquisition device

LDP

left-detached position

LF

logical form

LFG

Lexical Functional Grammar

LIS

Italian Sign Language

LOC

locative

LS

logical structure

LSC

Catalan Sign Language

LSF

French Sign Language

LU

lexical unit

M

masculine; semantic molecule

MASC

masculine

MAX

constraint requiring every segment in the input to have a correspondent in the output

MD

Multi-Dimensional analysis

MDP

Minimal Distance Principle

MGG

Mainstream Generative Grammar

MP

Minimalist Program

N

noun; neuter

NAND

“and not”

NEG

negation

NMR

non-macrorole

NOGEM

constraint against geminates

NOM, Nom

nominative

NONPST

nonpast

NP

noun phrase

NSM

Natural Semantic Metalanguage

NTL

Neural Theory of Language

NUC

nucleus

NUM, Num

numeral

O, OBJ

object

OBL

oblique

orth

orthography

OT

Optimality Theory

OT-LFG

Optimality-Theoretic Lexical Functional Grammar

P

patient; Predicator

PA

Parallel Architecture

P&P

Principles-and-Parameters

ParGram

Parallel Grammar

ParSem

Parallel Semantics

PART

participle

PASS

passive

PCat

levels in the Prosodic Hierarchy

PCFG

Probabilistic Context-Free Grammar

PCI

particularized conversational implicature

PERF

perfect

pers

person

PF

Perfective

PI

primary intention

PL, pl

plural

pm

primary meaning

POSS

possessive

PP

prepositional phrase

PrCS

pre-core slot

PRED

predicate

PRES

present

PRO

pronoun

PROG

progressive

PRON, Pron

pronoun

PROX

proximative aspect

PRS

Present

PRT

particle

PSA

privileged syntactic argument

PST

past

PTCP

participle

PUNC

punctual aspect

PW

phonological word

R

form—government relation

REAL

realis

REC

reciprocal

REF

reflexive

REF-REC

reflexive-reciprocal category

REL

relative clause marker

REM

Remote

REP

reportative

RG

Relational Grammar

RL

representational level

RP

reference phrase

RRG

Role and Reference Grammar

RT

relevance theory

S

sentence; subject

SAI

subject—auxiliary inversion

S&W

Sperber and Wilson

SBCG

Sign-Based Construction Grammar

SBJV

subjunctive mood

SC

society and culture

SCWD

automatic utilization of knowledge of culture and society

SD

situation of discourse

SEM

meaning of a sign

SFG

Systemic Functional Grammar

SFL

Systemic Functional Linguistics

SG, sg

singular

sm

secondary meaning

SOV

subject—object—verb

SP

subject pronoun

SPE

The Sound Pattern of English

SPEC

specifier

SS

Simpler Syntax

SSH

Simpler Syntax Hypothesis

STAT

stative aspect

SU

Structural Uniformity

SUBJ

subject

SUBS

subsequent tense

SVO

subject—verb—object

T

tense; word-token

TAG

Tree-Adjoining Grammar

TAM

tense—aspect—modality

TL

trajectory-landmark

TMA

tense—modality—aspect

TNS

tense

TOP

topic

TR

transitive

TSG

Tree-Substitution Grammar

UG

Universal Grammar

UTAH

Uniformity of Theta Assignment Hypothesis

V

verb; vowel

VAL

valence

VIS

visual

VOC

Verb–Object Constraint

VP

verb phrase

VSO

verb–subject–object

VT

valency theory

W

winner

WALS

World Atlas of Language Structures

W&S

Wilson and Sperber

WG

Word Grammar

WH

question word

WK

world knowledge

WS

word meaning and sentence structure

XADJ

open predicate adjunct

XCOMP

open predicate complement

XLE

Xerox Linguistic Environment

XOR

a set-theoretic operator inspired by exclusive disjunction

XP

predicate phrase (VP, NP, AP, or PP)